পায়ে পায়ে পথ

১৯৪৫-'৪৮-এর বাংলার সংগ্রামী কৃষকদের
তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস।

মহীতোষ বিশ্বাস

পরিবেশক :
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

PAYE PAYE PATH.

—A Bengali Novel based on 'Te-vaga Movement'

by Mahitosh Biswas.

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর | ১৯৬১

প্রকাশক ঃ
রেখা বিশ্বাস
'মাঙ্গলিক'
উত্তরায়ণ | মধ্যমগ্রাম
উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
দীননাথ সেন।

মুদ্রক ঃ
পৃথ্বীশ সাহা
অমি প্রেস
৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলিকাতা-৯।

বাঁধাই ঃ ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০০ বৈঠকখানা রোড।
কলিকাতা-৯

শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে

চিরকালের সংগ্রামী মানুষদের

উদ্দেশে

এই লেখকের অন্য বই :

* মাটি এক মায়া জানে। (উপন্যাস)
* বাংলা উপন্যাস—প্রসঙ্গ : আঞ্চলিকতা।
 (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত পি-এইচ্‌ ডি. গবেষণা-গ্রন্থ।

॥ এক ॥

বিলভাসানের চাষীদের গ্রামগুলোতে এখন আর আগের দিন নেই। এখন দিনকাল পালটেছে। কয়েকটা গ্রাম মিলে হাইস্কুল হয়েছে। পোষ্টাফিস বসেছে। গাঁয়ের স্কুল থেকে পাস ক'রে ছেলেরা মেয়েরা দূরের শহরে কলেজে পড়তে যায়। চাষের কাজে লাভ নেই ভেবে কোনো কোনো গাঁয়ের জোয়ান ছেলে শহরে ছোটে। সেখানে কল-কারখানার চাকরীতে কাঁচা পয়সার হাতছানি। বিশ-বাইশ বছরের অবিবাহিতা শিক্ষিতা তরুণী মেয়ে দিব্যি স্বচ্ছন্দে গাঁয়ের রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। কোনো চাষীর সৌখীন ছেলে ধানক্ষেতের আলে ব'সে ট্রানজিস্টারে গান শোনে। যে মেয়েরা নানাকারণে লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি, তারাও শহুরে প্রসাধনের নানা-রকম কলাকৌশল আয়ত্ত করে। ঠাট-ঠমক শেখে। বিলভাসানের কোনো চাষী এখন আর হাঁটু পর্যন্ত কাপড় প'রে খালি গায়ে পাশের গাঁয়ে কুটুম-বাড়ী যেতে উৎসাহ পায়না। একটি জামা অন্ততঃ গায়ে থাকা চাই। নিদেন-পক্ষে একটা চাঁদ-গলার গেঞ্জী। আর পায়ে একজোড়া চটি থাকলে তো কথাই নেই। লেখাপড়ার প্রচলন ঘ'টে আস্তে আস্তে গ্রামের ছেলেমেয়েগুলি শিক্ষিত হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে বিলভাসানের গ্রামগুলির বহুদিনের জমে থাকা অজ্ঞতার অন্ধকার ধীরেধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন—এসব চাষীদের জীবনে এখনো আছে। জীবন-চর্যার সামগ্রিক রূপটাতেও তেমন কোনো ব্যাপক পরিবর্তন হয়নি। তবু শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার, সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ—এসবের মধ্যে দিয়ে বিলভাসানের চাষীদের জীবনে এখন বেশ কিছুটা অদল-বদল ঘটেছে বইকি!

কিন্তু এ কাহিনীর শুরু যখন, তখন বিল-ভাসানের চেহারা ছিল অন্যরকম। আদিগন্ত নীচু জলা জমি। গোটা বর্ষা আর শরৎকাল জলে জলে ভাসমান। তাই বুঝি নাম হয়েছে বিলভাসান। আর এই বিলভাসানের বিল অঞ্চল জুড়ে পাশাপাশি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বিলভাসানের গ্রামগুলো। বর্ষায় শরতে জলে থই থই। খরা-শুকনোর দিনে ধুলোভরা মাটির পথ আর ঠাঠা-করা মাঠ-ঘাট। জীবনে এখানে বৈচিত্র্য বড্ডো বেশী নয়। 'চাষবাস—বারোমাস'—আর এই চাষবাসকে কেন্দ্র করেই এখানে জীবনের সুখ-দুঃখের ওঠা-নামা ঘটে। মাঠের ফসল যদি ভালো ফলে, আর জোতদার-জমিদারের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে কিছু শস্যের দানা যদি গোলায় তোলা যায়, তবেই চিত্তে সুখ। আর বন্যায়-খরায় যদি মাঠের ফসল মাঠেই শেষ হয়ে যায়, তবে নিজেদের পেটেই বা কী পড়বে, আর পাওনাদারের পাওনাই বা মিটবে কি

দিয়ে। তাই পাল-পার্বণই হোক, আর বিয়ে-সাদী শ্রাদ্ধের ভোজই হোক, ফসলের দেবতার প্রসন্নতাটুকু আগে দরকার। সব মিলিয়ে জীবনের গতি এখানে বড়ো নিস্তরঙ্গ, মন্থর। পূজা-পার্বণ, সমাজ-সামাজিকতার উৎসব, বর্ষাকালে বিলভাসানের ভাসান জলে নৌকা-বাইচ, শুকনোর দিনে গরুর দৌড়—সবই আছে। কিন্তু এগুলো বিল-ভাসানের চাষীদের পক্ষে কোনোটাই কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। ব্যাপারগুলো সহজ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মের মতো একটার পর একটা ওদের জীবনে আসে। হৈচৈ ক'রে ওরা সে উৎসবে মাতে। সাড়া দেয়। দুঃখ-শোকের দিন এলে কয়েক-দিন মুহ্যমান হয়ে থাকে। আবার যে কে সেই। বিলভাসানের শান্ত নিস্তরঙ্গ দিনগুলো বয়ে চলে। কিছু আদিম বিশ্বাস, কিছু সঙ্কীর্ণতা, দলাদলি, দিন-চর্যার গতানুগতিক প্রবহমানতা, আর অনটন-স্বাচ্ছন্দ্যে, শোষণে বঞ্চনায়—সব ক্ষেত্রেই সরলতা অজ্ঞতায় মেশানো প্রচণ্ড ভাগ্য-নির্ভরতা—এই নিয়েই বিলভাসানের চাষীদের জীবন। বিদ্যাচর্চার সময় বা সুযোগ—কোনোটাই বড়ো একটা এখানে ছিলনা। একটু বয়স বেড়ে গায়ে হাত পায়ে তাগদ দেখা দিলেই চাষীর ছেলেকে বাপ-কাকার সঙ্গে ক্ষেতের কাজে 'যোগাল' দিতে হয়। গোরু-বাছুর গুলোকে চরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়। এসব কাজের ফাঁকেও হয়ত লেখা-পড়ার কাজের জন্য একটু-খানি সময়ের সঙ্কুলান করা অসম্ভব নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো মুশকিল—সুযোগ কোথায়! এ-তল্লাটে স্কুল ব'লে কোথাও কিছু ছিলনা। সুতরাং কে-ই বা শিখবে, আর কে-ই বা শেখাবে! তাছাড়া লেখাপড়া শেখবার দরকারটাই বা কি! চাষীর ছেলে—বাপ ঠাকুর্দার হাতের কাজ, চাষবাস শেখো। হিসেব-পাতির জন্যে এক কুড়ি পর্যন্ত গুনতে শেখো। আর তাহলে পায় কে! এইটুকু ভাঙিয়ে খেতে পারলেই ভাতের অভাব হবেনা। তবে মুশকিল হয় দলিল-পরচা দেখা, আর খাজনা পত্রের কাগজ পড়ার সময়। তখন একটু 'চোখ' না থাকলে তো চলেনা। তবে মোটামুটি সব গাঁয়েই এ-রকম এক-আধজন 'চোখ-ওয়ালা'—অর্থাৎ একটু-আধটু পড়তে জানা লোক দুর্লভ নয়। অবশ্য বকেয়া খাজনার হিসেব-পত্রের কাগজ পড়তে পারলেই বা কি, আর না পারলেই বা কি। নায়েবমশাই যেটা বলবেন, সেটাই বেদ-বাক্য। পাঁচ আনা খাজনার বদলে দশ আনা দেবার হুকুম-নামা এলে যদি কেউ হাত-জোড় ক'রে বলে—'এ'জ্ঞে বাবুমশায়, ওটা তো মনে কয়, দশ আনা হবেন না, পাঁচ আনা হবেন।'—বাবুমশায় তৎক্ষণাৎ ধমক লাগাবেন—'আরে হেই ব্যাটা, চাষীর ঘরে এয়েছেন বিদ্যেসাগর—থাম তুই।'—অগত্যা থামতেই হয়। এবং পাঁচ আনার বদলে দশ আনাই খাজনা দিতে হয়। আর নাহলে পাইক এসে গলায় গামছা দিয়ে কাছারীবাড়ীতে টেনে নিয়ে যাবে। তারপর উত্তম-রূপ 'নাদান' দেবার ব্যবস্থা করবে। মোটামুটি এই হলো বিলভাসানের চাষীদের নির্দিষ্ট ছকে-বাঁধা জীবন। আর এতেই এরা অভ্যস্ত। এখানে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত কোনো কিছু বড়ো একটা ঘটেনা। সে রকম কিছু হঠাৎ ঘটলে এদের বিস্ময়ের বোধটাও মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

বিলভাসানের সেই আমলের চাষীদের পক্ষে তাই এ-রকম একটা রীতিমতো বিস্ময়ের।

অবশ্য এর আগেও আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেটাও এই মাস কয়েক আগের কথা।

নিবারণ দাস আর ভরত বিশ্বাস ভিন্-গাঁয়ের কুটুম-বাড়ী থেকে বাড়ী ফিরছিল। শীতের দুপুর। ধান-কাটা শূন্য ক্ষেতগুলো শীতের রোদ্দুরে ঝিম্ মেরে পড়েছিল। নিবারণ আর ভরত কুটুম বাড়ীর নানারকম গল্প-গুজবে মশগুল হয়ে পথ চলছিল। হঠাৎ মাথার উপরে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ হতেই থমকে দাঁড়াল দুজনে। উড়োজাহাজ। আগে হলে ভয় পেতো। এখন আর ভয় পায়না। খানিকটে অভ্যেস হয়ে গেছে। বছর কয়েক হলো, বিলভাসানের মাথার উপর দিয়ে প্রায় রোজই দু'চারখানা উড়ো জাহাজ যায়। প্রথম প্রথম গোটা তল্লাটের লোক কী ভয়টাই না পেয়ে গিয়েছিল। উড়োজাহাজ নিয়ে কত রকমের গল্পই যে চালু হয়েছিল। রাখাল ছেলেরা গান বেঁধেছিল। এখন আর উড়োজাহাজ নিয়ে বড়ো একটা কেউ মাথা ঘামায় না। তাছাড়া, আরো নানা-রকমের অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। কোথায় নাকি বিরাট এক লড়াই বেধেছে। বিলেত, জার্মানী সব বড়ো বড়ো শহর। সেখানে নাকি রাতদিন দুম্দাম্ বোমা পড়ছে। ইংরাজ, আমেরিকা, জাপান, সুভাষ বোস, গান্ধী, জিন্না—নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত দেশ আর লোকের নাম শোনে। বাসুন্দের হাটের ওদিকে চাকুরে-বাকুরে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকদের বাস। ওখানে খবরের কাগজ আসে। তাতে নাকি এসব কথা লেখা থাকে। হাটের দিন হাট-ফেরৎ বিলভাসানের অধিবাসীরা এসব খবর জোগাড় করে। খবরের চেয়ে গুজবই বেশী। আর চোখেও কিছু কিছু দেখে বইকি! মাথার উপর দিয়ে উড়োজাহাজের যাতায়াত তো রোজই দেখছে। বাসুন্দের হাটে যাতায়াতের পথে আরো কত কি চোখে পড়ে। বাসুন্দের হাটের পাশ দিয়ে একটা পাকা ইঁটের রাস্তা চলে গেছে। ঐ রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যায় রাঙামুলোর মতো সাহেবরা চলেছে। সঙ্গে তাদের কত জিনিস। উটের না হয় ঘোড়ার পিঠে সেগুলো চাপিয়ে রাস্তার ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে চলে। সব মিলিটারীর লোক। ভয়ে ওরা কেউ সামনে যেতে সাহস পায়না। রাস্তা ছেড়ে দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখে। আর এমনি ক'রেই একটু একটু ক'রে বাইরের জগতের অভিজ্ঞতার সীমাটা বাড়ছিল। তাই মাথার উপর দিয়ে এরোপ্লেন দুটোকে গোঁ গোঁ ক'রে চলে যেতে দেখেও নিবারণ আর ভরত তেমন আমল দিলো না। নিজেদের আলোচনায় মগ্ন থেকে পথ চলতে লাগল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ভরত। অগ্রবর্তী নিবারণ কিঞ্চিৎ বয়স্ক। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটছিল। ভরত হাউমাউ ক'রে নিবারণকে জড়িয়ে ধ'রে বলল—'ও খুড়ো, কাণ্ড দেখ্তিচো—।'

নিবারণ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল—'বল্বি তো কি হলো ?'

অবশ্য ভরতকে আর কিছু বলতে হলোনা। প্রচণ্ড গর্জন শুনে নিবারণও তাকাল উপরের দিকে। তারপর ভয়-চকিত গলায় চীৎকার ক'রে উঠল—'আরে বাবারে বাবা,—শালারা পাক মারতি নাগিচে।'—

—সত্যিই তাই। এরোপ্লেন দুটো তখন মাথার উপর আস্তে আস্তে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছিল। এবং একটু বাদেই সামনের বিরাট ফাঁকা গো-চর মাঠটায় নেমে পড়ল। ঘটনাটার আকস্মিকতায় নিবারণ আর ভরত ভীষণ রকম ঘাবড়ে গেলো।

ছুটে পালানোর জন্য দুজনেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যস্ততার জন্যেই বোধহয় দুজনে জড়াজড়ি ক'রে সেই রাস্তার ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

দিব্যি পরিষ্কার ফটফটে আকাশের এই দৃশ্যটা তখন বিলভাসানের গ্রামগুলোর লোকজনদের অনেকেরই চোখে পড়েছে। তুমুল একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। কী,—না, গো-চরের মাঠে উড়োজাহাজ নেমেছে। ছোট্‌—ছোট্‌—। হাতের কাজ ফেলে যে যে অবস্থায় ছিল, ছুটে এসে জমা হলো মাঠটার চারপাশে। ভয়ে কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস পেলোনা। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে যা দেখল, তাতেই সকলের চোখ চড়কগাছ হয়ে গেলো। সকলে হা ক'রে এরোপ্লেনটার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখতে লাগল। ওদিকে দুটো এরোপ্লেন থেকেই তখন কয়েকজন গোরা সাহেব নেমে এসেছে। কী সব যন্ত্রপাতি বের ক'রে একখানা এরোপ্লেনের গায়ে খানিক ঠোকাঠুকি করতে লাগল। বোধহয় কোনো কলকব্জা বিগড়ে মাঝপথে এই বিপত্তি। একটু বাদেই সাহেবগুলো কলকব্জা ঠিক ক'রে এরোপ্লেনের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। আর হুস্‌ ক'রে দু'খানা এরোপ্লেনই আকাশে উঠে গিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেলো।

ঘটনাটা ঘটে গেলো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। কিন্তু এর একটা বিরাট প্রতিক্রিয়া ঘটল বিল-ভাসানের চাষীদের মধ্যে। এর ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা হলো। কোথাও বা এটাকে কোনো দৈব অভিশাপের ফল ভেবে তার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য মাদুলি-কবচ ধারণের ব্যবস্থা হলো। হরি-সংকীর্তনের আসর বসল। আবার রাখাল ছেলেরা এটাকে নিয়ে মজাদার গানও বাঁধল। সব মিলিয়ে বিল-ভাসানের চাষীদের মধ্যে এটা একটা নতুন ধরনের উত্তেজনা বয়ে আনল।

কিন্তু এর মাস কয়েক বাদে আর একটা যে ঘটনা ঘটল, সেটার প্রকৃতি একটু অন্য রকমের। সদ্য উত্তেজনার প্রাখর্য তাতে কম থাকলেও বিলভাসানের চাষী মানুষেরা ঘটনাটায় প্রথমে বড়ো ভাবিত হলো। তারপর তাদের গতানুগতিক সরল জীবনযাত্রার চিন্তাধারায় একটা মোড় নিতে শুরু করল ধীরে ধীরে। হয়ত নিজেদের অলক্ষ্যেই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের সবে শুরু। কয়েক দিনের অল্প-স্বল্প বর্ষণেই আমন ধানের চারাগুলো বেশ তেজালো হয়ে উঠেছিল। সারা বিল জুড়ে সবাই এখন নিড়ান বাছাইয়ের কাজ করছে। বিল-প্রান্তের পশ্চিম কোণটায় ঐ রকমই একটা দল ধানক্ষেতে ব'সে কাজ করছিল। ওরই মধ্যে ব্যাপারটা প্রথম চোখে পড়ল রণপতির। রণপতির বয়স তিন কুড়ি শেষ হয়ে চার কুড়িতে পড়ো-পড়ো করছে। কিন্তু চোখের ধারটা এখনো বড়ো তীব্র। উঠে দাঁড়িয়ে হাতের আগল দিয়ে পড়ন্ত বেলার রোদের আলোটাকে আড়াল দিয়ে বলল—'হ্যাঁরে, দ্যাখ্‌তো নোক্‌টা যায় কোন্‌ দিকি—।'

রণপতির কথায় সবাই একটু কৌতূহলী হয়ে ওঠে। দু' একজন উঠে দাঁড়িয়ে রণপতির উদ্দিষ্ট দিকে তাকায়।

বিলভাসানের পশ্চিমদিকে খানিকদূরে গিয়ে ডাঙা অঞ্চলের শুরু। ওটাই এ-পাশে বিল ভাসানের সীমান্ত অঞ্চল। ও-দিকটার গাছপালার পরিমাণটা একটু বেশী। আর ঐ গাছপালার ভিতর দিয়ে ধপধপে সাদা জামা-কাপড় পরা একটা

মানুষের মূর্তি ধীরে ধীরে বিলভাসানের সমতল নীচু ক্ষেতগুলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। লোকটির হাঁটা-চলার ভঙ্গী, কিম্বা পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে একনজর তাকালেই বোঝা যায়, এ আর যেই-ই হোক, বিলভাসানের কেউ নয়। ফলে এদের কৌতূহল আরো বেড়েই চলল। একটু বাদেই লোকটি একেবারে ওদের কাছে এসে পড়ল। হঠাৎই ঘটল এক অঘটন। দলের একেবারে শেষ প্রান্তে ব'সে ঘাস নিড়োচ্ছিল কষ্ঠীরাম। হঠাৎ মাথাটা একটু উঁচু ক'রে দেখেই—'ওরে বাবারে—আমারে ধরতি আসৃতিছে রে—' বলেই পড়ি মরি ক'রে দে ছুট্।

কষ্ঠীরামের এই ছেলেমানুষী কাণ্ড দেখে সকলে অবাক হলো। কিন্তু তা নিয়ে কেউ হাসাহাসি করার সুযোগ পেলোনা। কারণ আগন্তুক লোকটি তখন একে-বারেই কাছে এসে পড়েছেন। দলের সকলে তখন বিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বয়োবৃদ্ধ রণপতি প্রথমে চিনতে পারল। একটু এগিয়ে গিয়ে হাত জোড় ক'রে বলল—'আজ্ঞে ছোটবাবু, আপনি এদিক কি মনে ক'রে ? পেরণাম হই !'

ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ঈষৎ শ্যামলা রঙের সুদর্শন যুবক। রণপতির কথার জবাবে একটু হেসে জবাব দিলেন—'এই এলাম তোমাদের এদিকে।'—

এলেন তো বটে ! কিন্তু কেন যে এলেন, সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। দলের মধ্যে তখন জোর কানা-ঘুঁষো শুরু হয়েছে। ছোটোবাবুর চেহারার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও নামের সঙ্গে সকলেরই পরিচয় আছে। বাসুন্দের জমিদার, তাদের অনেকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—বৈকুণ্ঠ মুখার্জী মশায়ের ছোটো ছেলে সত্যপ্রসাদ মুখার্জী। কলকাতায় থেকে কী সব অনেক লেখাপড়া করেন। হঠাৎ এই মাঠঘাটের রাস্তায় তাদের মতো চাষা-ভুষোদের মধ্যে ছোটোবাবুকে দেখে সকলের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। তবে, দুই আর দুইয়ে মিলে যেমন চার হয়, তেমনি ছোটোবাবুর আগমন, আর কষ্ঠীরামের আকস্মিক পলায়নের একটা কারণও তারা আবিষ্কার করে ফেলল। কয়েকদিন আগে বৈকুণ্ঠ মুখার্জী মশাই তাঁর বাড়ীর কি কাজে বেগার ধরেছিলেন। সকলেই প্রায় হাজির হয়েছিল। সারাদিন বেদম খেটে কাজও তুলে দিয়ে এসেছিল। কিন্তু যে দু'চার জন যেতে পারেনি, তাদের উপর নাকি বৈকুণ্ঠ মুখার্জী মশাই বিস্তর রেগে রয়েছেন। কাকে কাকে নাকি কাছারি-বাড়ীতে ধরে নিয়ে পাইক-পেয়াদাদের দিয়ে আচ্ছা ক'রে মারও দিয়েছেন। কষ্ঠীরামকেও নাকি খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে। তাহলে কি ছোটোবাবু কষ্ঠীরামকে ধরতে এসেছেন ? কিন্তু, তা যদি হবে, তাহলে সঙ্গে পাইক কোথায় ? পেয়াদা কোথায় ? কি জানি বাবা। বাবু-লোকদের মতিগতি বোঝা ভার। হয়ত আগে তাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে সব খবর নিতে এসেছেন।

ওদিকে ছোটোবাবু তখন রণপতির সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন—

—'তোমাকে সেদিন কাছারি-বাড়ীতে দেখেছিলাম না ? বাবার সঙ্গে খাজনার বিষয়ে কথা-বার্তা বলছিলে !'

মনে পড়ল রণপতির। দিন কুড়ি আগে ওরা কয়েকজন মিলে বৈকুণ্ঠবাবুর কাছে আরজি জানাতে গিয়েছিল। গত দু'সন খরায় ধান ভালো হয়নি। পাটের ফলনও যৎকিঞ্চিৎ। এ-সনের ফসল পেয়ে বাকী খাজনা আর ধার-দেনা শোধ

দেবার আবেদন নিয়ে সবাই বৈকুণ্ঠবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিল। তারা জাতে ছোটো। চাষী। তাই কাছারী-ঘরের বারান্দায় উঠতে সাহস পায়না। বারান্দার নীচে গামছা বিছিয়ে সবাই বৈকুণ্ঠবাবুর আসবার অপেক্ষায় বসেছিল। বাবু সকালবেলার পূজাহ্নিক সেরে জলখাবার খেয়ে দর্শন দেবেন। ব'সে থাকতে থাকতে রণপতিরা লক্ষ করেছিল, ও-পাশের শিব-ঠাকুরের মন্দিরের পাশে বেলগাছের ছায়ায় এক বাবু ঝোলা কাপড়ের চেয়ারে (ইজিচেয়ার) শুয়ে বই পড়ছেন। ওরা মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিল। ফ্যালা-কামার বৈকুণ্ঠবাবুর বাড়ীর বাঁধা চাকর। ওদের চেনে। ওদের ঘন ঘন তাকাতে দেখে এক ফাঁকে এসে বলেছিল—'চিনতে পারছিস্ না ? এই আমাদের সেই ছোটোবাবু। —কলকাতায় লেখাপড়া করেন।— বড়ো নেতা হয়েছেন।'—

ওরা আরো বড়ো বড়ো চোখ ক'রে অবাক হয়ে ছোটোবাবুকে দেখেছিল। একটু বাদেই বৈকুণ্ঠবাবু কাছারীতে এসে বসেছিলেন। বাঘের মতো রাশভারী মানুষ। বৈকুণ্ঠবাবুকে দেখলেই যেন ওদের আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হয়ে যায়। হাত জোড় ক'রে ভয়ে ভয়ে সবাই বৈকুণ্ঠবাবুর কাছে আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু বৈকুণ্ঠবাবু সরাসরি 'না' ক'রে দিয়েছিলেন। খাজনা বাকী রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

ওরা হতাশ হয়ে ফিরে আসছিল। হঠাৎ দেখল, বই বন্ধ ক'রে ছোটোবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন। কাছারীঘরের বারান্দায় বাবার পাশে এসে দাঁড়ালেন। মিষ্টি হাসিটুকু মুখে লেগেই আছে। কিন্তু থমথমে গলায় বললেন—'বাবা, কিছু সময় না দিলে গরীব প্রজারা কি ক'রে খাজনা মেটাবে? ওরা তো বলছে—গত বছর ফসলের অবস্থা ভালো যায়নি।'—

—ও হরি! ছোটোবাবু তাহলে এতোক্ষণ তাদের কথা সব শুনছিলেন! ছোটো-বাবুর কথা শুনে ওরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বৈকুণ্ঠবাবুর গলায় হঠাৎ যেন বাঘ ডেকে উঠল—'তোদের তো আস্পর্ধা কম নয়—সব দাঁড়িয়ে আছিস ? খাজনার টাকা না নিয়ে কোনো ব্যাটা যদি ফের কাছারী-বাড়ীতে আসবি তো—' —তারপর গলাটা একটু নামিয়ে ছেলের দিকে ফিরে বলেছিলেন—'—দ্যাখো সতু, তুমি দেশোদ্ধার ক'রে বেড়াচ্ছো—বেড়াও। আমি তাতে বাধা দেবো না। কিন্তু আমার এই তুচ্ছ বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে মাথা গলাতে এসোনা। প্রজাদের এইভাবে লাই দেওয়ার পরিণাম কি জানো ?'—

ওদের আর বাপ-ব্যাটার কথা কাটাকাটি শুনবার সাহস হয়নি। তড়িঘড়ি ক'রে পালিয়ে আসে। কাছারী-বাড়ীর দেউড়িটা পার হয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

সে সব কথা এখন মনে পড়ল রণপতির।

রণপতি তাই ছোটোবাবুর কথার উত্তরে বলল—'হ্যাঁ বাবু, আপনি তো সব শুনছিলেন সেদিন।'

ছোটোবাবু দলের সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রণপতিকে বললেন—'তা, তোমার নামটা কি যেন ?'

রণপতি কৃতার্থ ভঙ্গীতে হাত জোড় ক'রে বলল—'আঁজ্ঞে, আমি রণপতি মণ্ডল।—আমারে আপনি রণপতি কবেন।'—

—'আচ্ছা রণপতি,—আমি যদি তোমাদের গ্রামে যাই, আমাকে থাকতে দেবে তোমাদের কাছে?'

কথাটার অসম্ভাব্যতা বোধহয় রণপতিকে বিচলিত করে। তাই একটুখানি আমতা হেসে বলে—'কি যে বলেন ছোটোবাবু, আপনি আমাদের গেরামে যাবেন, সে তো আমাদের সাত-পুরুষির ভাগ্যি। আমরা তো সব আপনাদের ছিচরণের দাস। তা বলে, আপনি আমাদের মতো গরীব-গুরো ছোটোনোকদের কাছে থাক্‌তি যাবেন ক্যানো?—এমন কথা কচ্ছেন! আমরা কি আপনার ঠাট্টার যুগ্যি?'

ছোটোবাবুর হাসি-হাসি মুখখানা এবার গম্ভীর হয়ে যায়। পরক্ষণেই হেসে বলেন—'না রণপতি, তোমাদের সঙ্গে আমি ঠাট্টা করছি না। সত্যি সত্যিই তোমাদের কাছে আমি থাকব বলেই এসেছি।'—

—কী জানি, বাবু লোকদের এ কী ধরনের মশ্‌করা! ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটার অর্থ অনুধাবন করবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো কিছুই ঠাহর করতে না পেরে আরো অবাক হয়ে যায়।

বিলভাসানের চাষী মানুষগুলোর পাশে পাশে হেঁটে, খানা-খন্দের ধুলো-কাদা পায়ে জড়িয়ে, দুর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার বৈকুণ্ঠবাবুর ছোটো ছেলে সত্যপ্রসাদ মুখার্জী যেদিন সত্যি সত্যিই তাদের গ্রামে, তাদের ভাঙা-চোরা মাটির ঘরে বাস করবার জন্য এলেন, সেদিন ওদের চিরাচরিত সংস্কারে, ওদের আজন্ম-লালিত ধ্যান-ধারণার জগতে একটা বড়ো রকমের নাড়া লাগল। একান্ত গতানুগতিক জীবনে এতোবড়ো একটা বিস্ময়কর ঘটনাকে কিভাবে মিশ খাওয়াবে, কিছুতেই ওরা যেন বুঝে উঠতে পারছিল না।

॥ দুই ॥

চারপাশে তিনচারটে ভিটে-বাড়ী। মাঝখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিশাল এক মজা পুকুর। কচুরি-পানায় ভর্তি। জলের বালাই বড়ো একটা নেই। জ্যৈষ্ঠ মাসের খুরুনে এখন বড়ো তেজ। পুকুরের কাদা পর্যন্ত শুকিয়ে খটখটে হয়ে উঠবার উপক্রম করেছে। শুধু পুকুরটার এক কোণে গভীরতর অংশে এখনো খানিকটে জল রয়েছে। সেখানে জল-কাদার মধ্যে পড়ে রয়েছে দশ বারো হাত লম্বা নিকষ-কালো বিশালাকার একখানা কাঠের গুঁড়ি। আর ঐ কাঠের গুঁড়িখানার মতোই কালো আর মজবুত একদল লোক জল-কাদায় মাখামাখি হয়ে গুঁড়িখানাকে ডাঙায় ঠেলে তুলবার চেষ্টা করছে। আশেপাশে একদল উলঙ্গ-অর্ধোলঙ্গ ছেলে-

মেয়ে পরম উৎসাহে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। কাঠখানাকে নাড়াতে গিয়ে জোয়ান জোয়ান লোকগুলো হিমসিম খাচ্ছে। কখনো বা কাদার মধ্যে পিছলে পড়ছে।—এ দৃশ্যটায় ওরা পরম কৌতুক অনুভব করছে। বাঁশের একখানা লম্বা লগি গুঁড়িখানার একপাশে মাটিতে পুঁতে ঠেক্‌নো দিতে দিতে পঞ্চা অর্থাৎ পঞ্চানন বলল—'গাছের গোড়া না অসুরের মুড়োরে এডা! শালার শালা যে নড়েই না।'—

ওপাশ থেকে জলধর ফুট্ কাটে—'অসুরের মুড়ো না, এডা হ'লো গে মাতুব্বর-জ্যাঠার শাউড়ী ঠারোনোর মাথা—।'

মাতুব্বর-জ্যাঠা—অর্থাৎ এ পাড়ার সবথেকে মানী আর জমি-যাতির মালিক কৈলাস মাতুব্বর। কৈলাসের শাশুড়ী ঠাকরুণের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। কিন্তু এখনো বেশ ডাঁটো আছে। গায়ে-গতরে একটু ভারী। পাড়া-সম্পর্কে জ্যাঠা কৈলাস মাতুব্বরের শাশুড়ীকে নিয়ে চ্যাংড়া জলধর তাই রসিকতা করল।

বয়স্ক হরবিলাস ধমক দেয়—'থাম্ দেখি তুই ছ্যামড়া, মাতুব্বর শুনতি পারলি তোরে আস্ত রাখবে না নে।'

জলধর তড়বড় করে জবাব দেয়—'থোও দি'নি তোমার মাতুব্বর। মাতুব্বর আমার এইডে করবেনে—!'—সব কথার মধ্যেই কেমন ক'রে যেন একটা আদি রসাত্মক শব্দ জুড়ে যায়।

হঠাৎ সামনের ভাগাড়-পথটার দিকে তাকিয়েই সহদেব ব্যস্ত গলায় বলে—'এ্যাই, মুখ খারাপ করিস্‌নে কেউ। ছোটোবাবু আসতিচে, দেখতি পাচ্ছিস্ নে—?' —সহদেব সবাইকে মুখ-খারাপ করতে বারণ করল বটে, কিন্তু নিজেই কথার শেষে বেশ একটা কাঁচা শব্দ জুড়ে দিলো।

সামনের দিকে এক পলক নজর ক'রে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ভার-ভারিক্কি হয়ে কাজে মন দিলো। কেউ বাঁশ বাঁধিয়ে, কেউ বা কাঁধ লাগিয়ে গাছের গুঁড়িটাকে ঠেলে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল। সত্যপ্রসাদ এদিকেই কোথাও যাচ্ছিলেন। এতোগুলো লোককে কাজ করতে দেখে থেমে পড়লেন। কাদা বাঁচিয়ে শুকনো কচুরি-পানার উপর পা রেখে রেখে ওদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। একটুক্ষণ দেখে নিয়ে বললেন—'কি করছ তোমরা এসব ? কি হবে এতো বড়ো কাঠ দিয়ে ?'

হরবিলাস জবাব দেয়—'নৌকো হবে ছোটোবাবু।'

ওপাশ থেকে জলধর বলে ওঠে—'এমনি নৌকো না—বাচির নৌকো হবে দাদাবাবু!'

সত্যপ্রসাদ প্রসন্ন কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকালেন জলধরের দিকে। উনিশ কুড়ি বছরের স্বাস্থ্যবান টগবগে জোয়ান ছেলেটি। হঠাৎ ছেলেটিকে বড়ো ভালো লেগে যায় সত্যপ্রসাদের। বলেন—'তুমি তো বড়ো সুন্দর নামে ডেকেছ আমাকে। দাদাবাবু! বাঃ! বেশ বলেছ! কী যে সবাই আমাকে ছোটোবাবু ছোটোবাবু করো। ভালো লাগে না। এবার থেকে সবাই আমাকে দাদাবাবু—না-না—দাদাবাবুও চলবে না—'সত্যদা' বলে ডাকবে। কেমন ?'

সকলে একবার এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। তারপর বোকার মতো মাথা নাড়ে।

সত্যপ্রসাদ এবার জলধরের দিকে তাকিয়ে বলেন—'তোমার নামটা কি যেন—?'

জলধর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর বিনীত ভঙ্গীতে বলে,—'আঁজ্ঞে, আমার নাম ছিরি জলধর চন্দর দাস। বাবা ঈশ্বর তারক চন্দর দাস। সাকিন—'

সত্যপ্রসাদ হাসতে হাসতে তাকে থামিয়ে দেন—'আর বলতে হবে না। আমি শুধু তোমার নামটাই জানতে চাইছিলাম। তা, তুমি কি যেন বলছিলে জলধর?'

জলধর যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে—'আঁজ্ঞে, বাচির নাও বানাতি হবে, তাই কচ্ছিলাম। মাতুব্বর-জ্যাঠা কইছে, এবার ছোন্দার-খালের সব বাচির নাওরে হারাতি হবে। জিততি পারলি গেরামের লোকরে খাসি মা'রে খাওয়াবে। আর, সব বাচেন-দের মেডেল দেবে।'

সত্যপ্রসাদ যেন খুব অবাক হয়েছেন—'তাই নাকি? তাহলে তো খুব সাংঘাতিক ব্যাপার হবে!'

জলধর হঠাৎ যেন তার মনের জোর ফিরে পায়। খুব উৎসাহিত হয়ে বলে—'আপনারে কিন্তু স-স-সত্যদা বাচির নৌকোর হাল ধরতি হবে। তা'লি দ্যাখ্‌বো আমাদের হারায় কোন্ শা—'

—কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই জলধর হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের মুখটা চেপে ধরে।

আশপাশের সকলেই মুখ টিপে হাসছিল। সত্যপ্রসাদও হো হো ক'রে হেসে উঠলেন—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

হঠাৎ দেখা গেলো, কৈলাস মাতব্বর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। প্রবীণ মানুষ। কিন্তু ছুটছে একটা ছোটো ছেলের মতোই। সত্যপ্রসাদের কাছে এসে বলল—'শুয়ে ছিলেন, তা আবার উঠে আস্‌লেন ক্যানো ছোটোবাবু? কলেন যে শরীলডা খারাপ লাগ্‌তিচে—!'—বলতে বলতে পাশে দাঁড়ানো ছোটো একটা ছেলের দিকে ফিরে বলল—'দোড়োয়ে যা তো রে, আমাদের হাত্‌নের (বারান্দা) থেকে চউকিখান নিয়ে আয়। আ'নে বাবুরে বস্‌তি দে।'—

সত্যপ্রসাদ তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন—'না, না,—তোমার ব্যস্ত হতে হবেনা কৈলাস। আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। একটু ঠাণ্ডা মতো লেগেছিল। সে ঠিক হয়ে গেছে। রাতদিন শুয়ে বসে থাকতে ভালো লাগেনা। তাই চারদিক একটু ঘুরে ফিরে দেখছিলাম। তা কি ব্যাপার, তুমি নাকি বাইচের নৌকা বানাচ্ছ?'

কৈলাস যেন এবার একটু লজ্জা পায়। বলে—'আঁজ্ঞে হ্যাঁ ছোটোবাবু, এট্টু সখ চেতিছে। নবীনরে তো দেখিচেন।—আমার জ্যেষ্ঠো পুত্তুর। —ওর বড়ো হাউশ হইছে—বাচির নাও বানাবে।'

—বোঝা গেলো, নবীনের তো হাউশ হয়েছেই, হাউশটা নবীনের বাবারও কিছু কম হয়নি।

হঠাৎ কৈলাস রাস্তার দিকে তাকিয়েই চেঁচামেচি জুড়ে দেয়—'ও মাস্টের, আরে চল্লে ক'নে? এদিক দিয়ে এট্টু ঘুরে যাও।'—

রাস্তা দিয়ে একটি যুবক যাচ্ছিল। কৈলাসের ডাকাডাকিতে থেমে পড়ল। ধীরে ধীরে রাস্তা থেকে নেমে এসে ওদের পাশে দাঁড়াল।

—'আপনাদের তো চিন্-পরিচয় হয়নি ছোটোবাবু'—কৈলাস বলল—'এ আমাদের যতীন মাস্টের। নড়াল কলেজের থেকে আই এ পাস দেছে। গরমেণ্টের চাকরী পাইলো। তা ওর বাবা কইছে—তুমি গরীবের ছেলে, গরীবের মতো থাকো। লেখাপড়া শিখিছো। এখন গেরামের ছেলে-পেলে মানুষ করো।'

সত্যপ্রসাদ ছেলেটিকে দেখলেন ভালো করে। প্রায় ওঁর নিজেরই সমবয়সী। হয়ত বছর কয়েকের ছোটো হতে পারে। সাধারণ গ্রাম্য চেহারা। কিন্তু ওরই মধ্যে চেহারায় যেন একটা বিদ্যাবুদ্ধির ছাপ আছে।

যতীন এগিয়ে এসে নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত জোড় ক'রে বলল—'আপনিই ছোটোবাবু? আপনার কথা কদিন ধ'রে সকলের মুখে শুনছি। আসব আসব ক'রেও এ-কদিন আসা হয়ে ওঠেনি।'

সত্যপ্রসাদ প্রতি-নমস্কার করলেন না। যতীনের দুই হাত হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন—'হ্যাঁ ভাই, আমিই ছোটোবাবু।—এখন থেকে তোমাদের সত্যদা। —ভারী ভালো লাগল তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে।'

সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে সত্যপ্রসাদ ডায়েরীতে লিখছিলেন—"২০শে মে। ১৯৪৫। বিলভাসান। আজ পাঁচদিন হইল এখানে আসিয়াছি। কৈলাস মণ্ডল নামক এই ব্যক্তির গৃহে স্থান পাইয়াছি। এখানে থাকিয়া নূতন জীবনের সহিত পরিচিত হইতেছি। এতোদিন যে জীবনের কথা দূর হইতে শুনিয়াছি, বইয়ে পড়িয়াছি, এখানে আসিয়া তাহার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় হইতেছে। জানিনা, এইভাবে বাড়ী হইতে চলিয়া আসাটা উচিত হইয়াছে কিনা। বাবা যে ইহাকে সহজভাবে লইতে পারিবেন না, তাহা অনুমান করিতে পারি। তবে ইহা ছাড়া, আমার আর কোনো পথও খোলা ছিল না। ইহার জন্য একটি মানসিক প্রস্তুতি দীর্ঘদিন ধরিয়াই চলিতেছিল। প্রজাদের খাজনা লইয়া বাবার সহিত মতান্তর আমার এই চলিয়া আসার উপলক্ষ্য মাত্র। কলিকাতার বা সেখানকার কমরেডদের কোনো সংবাদ জানি না। তাহাদের কাছেই বা ইহার কী প্রতিক্রিয়া হইবে জানিনা।—পার্টি অফিসে সত্বর সমস্ত বিষয় জানাইয়া পত্র লিখিবার ইচ্ছা আছে। পার্টির তরফ হইতে এই অঞ্চলে কৃষক-সমিতি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিব। পার্টি কী নির্দেশ দিবে—জানিনা। তবে একটি বিষয় ক্রমেই আমার নিকট পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে যে, দেশের দরিদ্র অজ্ঞ চাষীদের জন্য সত্য-সত্যই যদি কিছু করিতে হয়, তবে তাহা দূর হইতে নয়—তাহাদের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের শরিক হইয়াই তাহা করিতে হইবে।"

—একমনে লিখে চলেছিলেন সত্যপ্রসাদ। হঠাৎ হারিকেনের আলোটা দপ্‌দপ করতে শুরু করল। যুদ্ধের বাজার। কেরোসিনের টানাটানি। সাধারণ গরীব ঘরে কেরোসিনের নামগন্ধ নেই। সন্ধ্যে লাগবার আগেই কাজকর্মের পাট সব সারা। সূর্যদেব পাটে বসল তো জগৎ অন্ধকার। বাসুন্দের হাট থেকে অনেক খোঁজাখুঁজি

করে বিস্তর দাম কবুল করে এক আধসের লাল কেরোসিন হয়ত জোগাড় করা যায়। কিন্তু এই আক্রা দাম দেবার মতো ক্ষমতা ক-জনার আছে। তাই সন্ধ্যেবেলায় হারিকেন জ্বালানো নিতান্তই বড়ো মানুষ পয়সা-ওয়ালা লোকের কাজ। বিল-ভাসানে সে রকম লোক কয়জনই বা মেলে। কিন্তু কৈলাস মাতব্বর সত্যপ্রসাদের জন্য কেরোসিন তেল আর হারিকেনের ব্যবস্থা করেছে। বাবুলোকদের আবার রাত্তির বেলায় লেখাপড়া করার বাই থাকে। ছোটোবাবু যখন দয়া করে তার বাড়ীতেই থাকছেন, তখন তাঁর সুখ-সুবিধেগুলোও যতটা পারে কৈলাসকে নজর রাখতে হবে বৈকি।—হারিকেনটা দপ্‌দপ্‌ করতেই সত্যপ্রসাদ উঁচু করে কয়েকটা ঝাঁকুনি দিলেন। তেল কমে এসেছে। কিন্তু একেবারে ফুরোয়নি। লাল তেল। আলোর থেকে ধোঁয়া বেশী। ঝাঁকুনি খেয়ে হারিকেনের আলোর দপ্‌দপানি থামল না। বরং উল্‌টে আরো বেড়ে গেলো। তারপর ফুস্‌ ক'রে একেবারেই নিভে গেলো।

অন্ধকারটা চোখ-সহা হতে একটু সময় লাগল সত্যপ্রসাদের। কতই বা রাত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই চরাচর যেন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দূরে কাদের বাড়ীতে বোধহয় হরির-লুটের কীর্তন হচ্ছে। বাতাসে কীর্তনের অস্পষ্ট সুর-ধ্বনি ভেসে আসছে। সত্যপ্রসাদ ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এ অঞ্চলে সবার বাড়ীর ঘরই উলুখড়ে ছাওয়া। তেমন পয়সাওয়ালা হলে কেউ টিন কিম্বা টালির ছাউনি দেয় ঘরে। কৈলাসের বাড়ীর সব ঘরই খড়ে ছাওয়া। উত্তর পোতায় বিরাট আটচালা ঘর। ও-ঘরে কৈলাস থাকে পরিবার নিয়ে। দুই ছেলে আর এক মেয়ে। বড়ো ছেলের বিয়ে দিয়েছে। বউয়ের কোলে দুই বছরের ছেলে। বউ-ছেলে নিয়ে বড়ো ছেলে থাকে পাশের আর একখানা চৌরি ঘরে। কৈলাস ঠাকুর-ভক্ত লোক। বিস্তীর্ণ ভিটের একেবারে দক্ষিণ পাশে ঠাকুর ঘর। পুজো-আচ্চার সময় ঘরটা বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। ঠাকুর ঘরের লাগোয়া বারান্দাটা সুন্দর করে বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে কৈলাস। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নিকোনো মাটির বারান্দা। জামকাঠের তক্তা জুড়ে খাট বানানো হয়েছে। এটাই এখন সত্যপ্রসাদের আস্তানা। ঘরের বাইরে এসে উঠোনে দাঁড়িয়েই সত্যপ্রসাদ অনুভব করলেন—বিশ্রী একটা গরম পড়েছে। এতোক্ষণ ডায়েরী লেখায় নিমগ্ন ছিলেন বলে গরমটা যেন তেমন টের পাচ্ছিলেন না। নানারকম এলোমেলো চিন্তা সত্যপ্রসাদের মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ক'দিন হ'লো এখানে এসেছেন। খানিকটে ঝোঁকের মাথায়ই চলে এসেছেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি কী হবে, তা নিয়ে এখনো কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। একটা অস্থিরতার সঙ্গে ক'দিন ধরে অবিরত সংগ্রাম করতে করতে মনের মধ্যে ক্লান্তি অনুভব করছেন সত্যপ্রসাদ।

জ্যৈষ্ঠের তারা-ভরা নির্মেঘ আকাশ। নিস্তব্ধ রাত্রি। নানা এলোমেলো চিন্তায় সত্যপ্রসাদ একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ একটা চাপা হিস্‌ হিস্‌ শব্দ শুনেই চমকে উঠলেন। শব্দটা আসছে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের গোয়াল ঘরের সামনে থেকে। গোয়ালের মধ্যে গরুগুলোও কেমন যেন চঞ্চল হয়ে দাপাদাপি করছে। কাউকে কি ডাকবেন সত্যপ্রসাদ? কাকেই বা ডাকবেন? যে যার ঘরে

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সত্যপ্রসাদ শব্দটা লক্ষ ক'রে নিজেই একটুখানি এগিয়ে গেলেন। গোয়াল ঘরটার একটুখানি সামনে এগিয়ে যেতেই বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালেন। অন্ধকারের মধ্যে মিহি একটুখানি তারার আলো। কিন্তু তাতেই সত্যপ্রসাদ দেখলেন, গোয়ালঘরের কোণের ফাঁকা জায়গাটায় দুই তিন হাত লম্বা একটি দণ্ডাকৃতি পদার্থ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কখনো কখনো মৃদু মৃদু হেলছে, দুলছে। যেন বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। আর ঐ দণ্ডাকৃতি দীর্ঘ পদার্থটির একেবারে শীর্ষদেশে দুইপাশে দু'টি স্ফীত অংশ। সেখান থেকেই মাঝে মাঝে তীব্র তীক্ষ্ণ হিস্ হিস্ শব্দ বেরিয়ে আসছে। কি ঐ পদার্থটি? চকিতে সত্যপ্রসাদের মুখ দিয়ে অস্ফুটে উচ্চারিত হ'লো—'সাপ ?'—সত্যপ্রসাদ বুঝতে পারলেন, এই তাহলে সেই সাপের শঙ্খ-লাগা। মিথুন-মত্ত দু'টি সাপের পাকে পাকে দীর্ঘ আলিঙ্গনে জড়িয়ে সোজা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার গল্প তিনি শুনেছেন। কিন্তু ব্যাপারটার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কখনো মাথা ঘামানোর চেষ্টা করেননি। আজ সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর দৃশ্যটি একেবারে মুখোমুখি প্রত্যক্ষ করলেন। জীবন্ত দুই মৃত্যুর বিভীষিকা তাঁর কত কাছে দাঁড়িয়ে। ওদের যেকোনো একজনের উদ্যত আক্রমণ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা এখন একেবারেই নেই সত্যপ্রসাদের। আর তার পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। তবু মনের মধ্যে কোনোরকম ভয়ের সঞ্চার ঘটল না। শুধু একটি প্রগাঢ় অনুভূতি তাঁর অন্তরের গভীর তলদেশ পর্যন্ত আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। বুঝতে পারলেন সত্যপ্রসাদ—বিলভাসানের এই সহজ সরল অজ্ঞ চাষী মানুষগুলির জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ বঞ্চনা শোষণও যেমন সত্য, তেমনি তাদের জীবনযাত্রার পারিপার্শ্বিকের এইসব হিংস্রতা আদিমতাও একান্ত সত্য, বাস্তব। এদের এই জীবনযাত্রার অংশীদার যদি তাঁকে হতে হয়, তাহলে এর সব কিছুকেই জীবনের অঙ্গীভূত ক'রে নিতে হবে।

নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে সত্যপ্রসাদ পিছন ফিরে তাঁর শয্যায় এসে আশ্রয় নিলেন।

॥ তিন ॥

কৈলাসের বাড়ীর সামনে সেদিন বেশ একটা জটলা চলল খানিকক্ষণ।

সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস কৈলাসের। গাড়ু হাতে মাঠের কাজকর্ম সেরে এসে গোয়ালঘরের পাশে গাদা দিয়ে রাখা তক্তাগুলো দেখছিল। উঁচু বাঁশের শক্ত আড় বেঁধে ঠেক্‌নো দেওয়া হয়েছে। তার উপরে সেই বিরাট কাঠের গুঁড়িটাকে তেরছাভাবে উঁচু করে চাওইদারেরা ফালা ফালা তক্তা বের করেছে। কয়েকদিন ধরেই তো ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ ক'রে চাওইদারদের করাত-টানার শব্দ চলছে একটানা। ভালো ক'রে রস টানানোর জন্য এখন তক্তাগুলো সব সারি সারি গাদা দিয়ে রাখা হয়েছে। রস শুকিয়ে গেলেই নৌকা গড়ার কাজ শুরু হবে।

বাগেরহাটের মিস্ত্রিদের খবর দেওয়া হয়েছে। বা'চের নাও গড়তে ওদের হাত বড়ো পাকা। ওরা এসে পড়লেই কাজ শুরু হবে।

হঠাৎ একটা গোলমাল কানে গেলো কৈলাসের। তাড়াতাড়ি ভিটের থেকে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। দক্ষিণপাড়ার ওদিক থেকে কারা যেন উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলতে বলতে এদিকে আসছে। আরে, ওদের মধ্যে হাত পিছ-মোড়া দিয়ে বাঁধা ওটা কে? দলটা কাছে আসতেই কৈলাস দেখল, গামছা দিয়ে কষ্ঠীরামের দুই হাত পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধা। সবাই ওকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে পিঠের উপর লাগাচ্ছেও দু'এক ঘা। কষ্ঠেটা আবার তাহলে কোথাও কিছু একটা অপকর্ম ক'রে বসেছে। কৈলাস একটু এগিয়ে দাঁড়াল। কৈলাসকে দেখে সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠল। হাত পা নেড়ে ফ্যালান্ ব'লে উঠল—'তুমি মাতুব্বর-কাকা এবার আর কিছু ক'তি আসেনা। তোমার কথায় আগের বার ছা'ড়ে দিলাম। এবার আর ওরে ছাড়তিছি না।'

কৈলাস একটু ধমকের গলায় বলল—'সে তো ছাড়বিনে বোঝলাম। তা, কি হইছে সেডা তো আমারে ক'বি।'

ফ্যালানের পাশ থেকে নবা গলা বের ক'রে বলল—'হবেডা আবার কি? কালকে রাত্তিরে আমাদের বাড়ী আবার ধান চুরি করতি গি'লো! আমরা ওরে ধ'রে বা'ন্ধে রাখিচি।'—

এতোগুলো লোকের হাতে মার-ধোর আর ধামসানি খেয়ে কষ্ঠীরাম বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছিল। কি একটা বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু সবাই মিলে দাবড়ানি দিয়ে ওকে চুপ করিয়ে দিলো।

কৈলাস ওদের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল—'তোদের কথা তো সব শোনলাম। তা, এবার ওর হাতের বাঁধনডা খুলে দে। তারপর ভা'বে দেখি কি করা যায়।'—

কৈলাসের শান্ত গলার কথায় কাজ হলো। সকলের উত্তেজিত ভাবটা একটু নরম হলো। একজন এগিয়ে এসে কষ্ঠীরামের হাতের বাঁধনটা খুলে দিলো।

কিন্তু কৈলাসও তো মাতব্বর বটে! সে হঠাৎ এগিয়ে এসে কষ্ঠীরামের গালে ঠাস্ ক'রে একটা চড় কষিয়ে দিলো। গলা চড়িয়ে বলল—'এ্যাতো ঘাই-গুঁতোন্ খাইয়েও তোর শিক্ষে হলো না! চড়ায়ে তোরে আজ তক্তা বানায়ে দেবো হারামজাদা!'—

কষ্ঠীরাম হাউমাউ ক'রে কৈলাসের পা জড়িয়ে ধরল—'মারো মাতুব্বর-কাকা, মারো। তোমরা সকলে মিলে আমারে মা'রে ফেলো!'

ফ্যালান্ হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'ওসব মায়া-কান্নায় আজকে আর কাজ হবে না। দশের সামনে নাকে খৎ না দিলি আজকে আর ছাড়ান নেই।'

ভীড়ের মধ্যে সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠল—'সেই কথাই ঠিক। দে, ধ'রে ওরে সকলে নাকে খৎ দে!'

একজন এগিয়ে এসে কষ্ঠীরামের ঘাড় ধ'রে মাথাটা মাটির কাছে চেপে ধরল। দু'তিনজন চেঁচিয়ে উঠল—'ছ্যাপ্ ঢাল্, ছ্যাপ্ ঢাল্।'

অগত্যা কষ্ঠীরাম কী আর করে। থুক্ ক'রে খানিকটা থুথু ফেলল মাটিতে। ওরা কষ্ঠীরামের মাথাটা চেপে ধ'রে নাকটা সেই থুথুর পরে ঘষে দিলো বারকয়েক। কৈলাস সকলকে শুনিয়ে কষ্ঠীরামকে বলল—'বল্, এ-রকম কাজ আর করবিনে কোনোদিন। মানুষির বাড়ী আর চুরি করতি যাবিনে—বল্!'

কষ্ঠীরাম চিঁ চিঁ করতে করতে কি বলল কিছু বোঝা গেলো না। মজা দেখতে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে চারপাশে জমা হয়েছিল। কষ্ঠীরামকে নাকে খৎ দিতে দেখে তারা ভীষণ রকম মজা পেলো। সাধারণতঃ এ-রকম শাস্তি তাদের মাঝে মাঝে পেতে হয় যতীন মাষ্টারের ইশ্‌কুলে। কিন্তু কষ্ঠীরামের মতো আধ-বুড়ো লোকের নাকে খৎ দেওয়া একটা মজার ব্যাপার বইকি! বাচ্চাগুলো হি হি ক'রে হাসতে শুরু করল।

কষ্ঠীরাম বাচ্চাগুলোর দিকে এক পলক তাকিয়েই মুখটা ঘুরিয়ে নিলো। তার নিজের গুষ্টিগুলোও ওদের মধ্যে আছে কিনা কে জানে। তবে নিজের বাপের নাক-খৎ দেওয়াটা বোধহয় আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে না। এতোক্ষণে কষ্ঠীরামের চোখ ছাপিয়ে জল এলো। কৈলাসের দিকে ফিরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল—'সবাই তো নাকে খৎ দেওয়ায়ে কওয়ালে, মানুষির বাড়ী আর চুরি করতি যাস্‌নে। কিন্তু চুরিডা যে করি ক্যানো, সেডা তো কেউ কও না।'—

কষ্ঠীরামের কথাটা হঠাৎ চাপা পড়ে গেলো। পিছন ফিরে সবাই দেখে, সত্যপ্রসাদ কখন এসে ওদের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন। সত্যপ্রসাদকে দেখে সবাই যেন একটু অপ্রস্তুত হলো। একটুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেলো। কষ্ঠীরামের কাছে এগিয়ে গিয়ে কৈলাস নরম গলায় বলল—'বাড়ী যা চ'লে। বৈকেল ব্যালায় আমার সাথে একবার দ্যাখা করিস্।'

সকলে চলে যেতে সত্যপ্রসাদ কৈলাসকে বললেন—'কি ব্যাপার কৈলাস! কি নিয়ে গোলমাল?'

কৈলাস একটু হেসে বলল—'ও কিছু না ছোটোবাবু, এট্টা চুরি-ধারির ব্যাপার। এই যে লোকটা গ্যালো দ্যাখলেন, ওর নাম কষ্ঠীরাম। কাল এক বাড়ী ধান চুরি করতি যাইয়ে ধরা পড়িছে।'—কৈলাসের গলাটা এবার একটু ভারী হয়ে ওঠে—'কোষ্ঠেডার স্বভাবটা এট্টু ঐ রকমের। এট্টু হাতটানের দোষ আছে। কিন্তু কবো কি ছোটোবাবু, একা কোষ্ঠে না, গেরামে গেরামে এখন ও-রকম কতো কোষ্ঠে যে বা'রোবে, তার ঠিক নেই। না বারোয়ে করবেডা কি ক'ন? খাবে কি? নিজির হাঁড়িতি ভাত না থাকলি পরের হাঁড়ির দিকি নজর যাবেই।'

সত্যপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করেন—'কষ্ঠীরামের নিজের জমিক্ষেত কি আছে?'

—'নিজির বল্‌তি কিছুই নেই।'—উত্তর দেয় কৈলাস—'আগে বোধ করি বিঘে দুয়েক মতন জমি ছিলো। তা সে তো ওর বাপ বাঁচে থাকতি থাকতিই বারোয়ে গেছে। আমাদের পাশের গেরামের পুলিন রায়রে আপনি চেনেন না। আপনার বাবার সাথে পরিচয় আছে। এক নম্বরের কু-চক্কুরে আর মামলাবাজ মানুষ। ওই পুলিন রায়ই কোষ্ঠের বাবার জমিটুক মামলা-মকোদ্দমা ক'রে বার ক'রে নেছে। আর শুধু কোষ্ঠেদের জমি ক্যানো, কতো জনের যে এইভাবে সব্বোনাশ করিছে

পুলিন, তার কি ঠিক আছে? যশোর কোর্টের হাকিম উকিল বাবুরা তো সব পুলিনের পকেটের লোক। যা কবে তাই।'—

সত্যপ্রসাদের সদা-প্রসন্ন চোখে-মুখে কেমন যেন একটা বিষণ্ণতা ছায়া ফেলে। জিজ্ঞাসা করেন—'তোমাদের বিলভাসানের আশেপাশের আর সব গ্রামের চাষীদের অবস্থা কেমন?'

কৈলাস একটু ভেবে নিয়ে বলে—'সব গেরামেই দুই চার ঘর ক'রে আছে, যাদের কারো কাছে হাত পাততি হয়না। পাট ব্যাচার পয়সা তো আছেই, ধানও এরা কম ব্যাঁচে না! নিজেদের নামে জমি। নিজেরাই হাল-বলদ নিয়ে চাষ করে। ঠ্যাকা-বাধায় কাজের চাপ বুঝে জন-কিষেণ কিনে কাজ তুলে নেয়। এদের অবস্থা মোটামুটি বল্‌তি পারেন—খাইয়ে নিয়ে বাইয়ে পড়ে। তা এরা আর কয়জন ক'ন! বেশীর ভাগেরই তো ঐ কোষ্ঠেরামের মতো অবস্থা। কারো বা দু'এক বিঘে আছে—কারো বা তাও নেই। জন-কিষেণ খা'টে সংসার চালাতি হয়। কেউ কেউ বর্গা করে। তা, বর্গা ক'রে কি-ই বা থাকে। হাল-বলদের খরচ, বীজ ধানের খরচ—যাবতীয় সব জোগায়ে ফসলের তো পায় আধা-ভাগ। তাতে কি পোষায় নাকি ক'ন? ফসল তুলে, ধার-কর্জো দেনা দায়িক মিটোয়ে, মাস-খানেকের মধ্যি যে পথের ফকির, আবার সেই পথের ফকির হ'তি হয়।'

কৈলাস একটু থামতেই সত্যপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন—'এই যে বর্গা জমির কথা বললে, তোমাদের এখানে এই বর্গা জমির মালিক কারা?'

কৈলাস এবারও উত্তর দেবার আগে একটু ভাবে। ভেবে নিয়ে বলে—'যতোদূর মনে কচ্ছে, আমাদের এই-দিকে জমি বর্গা দেয় তিন রকমের লোকেরা। এক হলো গিয়ে অনাথা বিধবা মেয়েছেলেরা। সব গাঁয়েই এ-রকম দুই পাঁচজন আছে। বাড়ীতে জোয়ান পুরুষ-মানুষ নেই। দুই চার বিঘে চাষের জমি থাক্‌লি কে বা তার চাষ-আবাদ করে! তাই বর্গা দিয়ে চাষ করাতি হয়। আর আছে নড়ালের, যশোরের, বাসুন্দের আর আফরার বাবুরা। তেনাদেরও অনেক জমি আছে এ-অঞ্চলে। সেগুলো এখানকার চাষীরা বর্গায় চাষ করে। আপনাদেরও তো কম জমি নেই ছোটোবাবু—এদিকি—।'

সত্যপ্রসাদ আবিষ্ট হয়ে শুনছিলেন। হঠাৎ কৈলাসের এ-কথায় একটু যেন সচেতন হয়ে ওঠেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ কৈলাস। আমাদের বেশীরভাগ জমিই বাসুন্দের ওপাশে। তবে বিলভাসানের এদিকেও কিছু জমি আছে। তবে সেগুলো বোধহয় চাষীদের মধ্যে বিলি-বন্দোবস্তে দেওয়া আছে। বছর শেষে খাজনা আদায় করা হয়।'—

কৈলাস আবার তার কথার খেই ধরে বলে—'আর যারা জমি বর্গা করায়, তারা সব আমাদের এই দিকেরই লোক। বেশীরভাগ বর্গা জমি এদেরই হাতে। যেমন একজনের কথা কলাম—ঐ যে পুলিন রায়। পুলিন রায়ের মতো যারা, এদের সকলেরই নিজের নামে মোটা পরিমাণ জমি আছে। আর সব সময়েই ধান্দায় থাকে, মামলা মকোদ্দমায় প্যাঁচ ক'ষে কার কোন্‌টুক বা'র ক'রে নিতি পারে। এরা আবার অন্য তালেও আছে। নড়ালের জমিদারবাবু, নয়তো আফরা, কি বাসুন্দে,

কি যশোরের বাবুদের কাছের থেকেও জমি ইজেরা নেয়। বাবুরা তো বড়ো এট্টা কেউ জল-জঙ্গল ভা'ঙ্গে বিল-কাদার মধ্যি আসতি চায় না। পুলিন রায়ের মতো লোকেরা তাই বাবুদের জমি ইজেরা নেয়। বছরের মাথায় বাবুরা জমির খাজনা পালিই খুশি। পুলিন রায়রা তারপর সেই জমি এখানকার চাষীদের দিয়ে বর্গা করায়। নিজেদের এক পয়সাও লাগে না। হাল-বলদ, বীজধান—সব হ'লো গিয়ে বর্গাদার চাষীর। আর ফসল উঠলি—নিজ্জলা আধাভাগ উঠে আসে পুলিন রায়দের ঘরে। আর সব সময়েই তো মন জোগায়ে চলতি হয়। এট্টু এদিক-ওদিক হ'লোতো পরের বছর সে চাষীর কপালে জমি চাষ করা উঠে যায়। পুলিন রায়রা আগের চাষীর কোলের থেকে জমিটুক কা'ড়ে নিয়ে আর এক জনরে বর্গা দিয়ে দেয়।'

সত্যপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করেন—'পুলিন রায়ের মতো লোক কত আছে এখানে ?'

কৈলাস উত্তর দেয়—'তা ছোটোবাবু, সব গেরামেই এ-রকম দুই চার জনরে পাবেনই। যেমন ধরেন, আমাদের এই বাঁকপুর গেরামের অনন্ত বিশ্বাস, এ-পাশের বনখালির ভজন দাস, ও-পাশের মল্লিহাটির ওই পুলিন রায়, ও-দিকের বিলতিতের বদন মণ্ডল।—এরা সব এই ভাবেই জমি বর্গা খাটায়ে পয়সার মানুষ হইছে। এ-অঞ্চলের বেশীর ভাগ বর্গা জমি—বল্‌তি গেলি এদেরই।'

সেদিন রাত্রে সত্যপ্রসাদ ডায়েরীতে লিখলেন—"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশের চাষীদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য যে কতখানি দায়ী, তাহা এখানকার এই বিস্তৃত কৃষি-প্রধান অঞ্চলটির দিকে লক্ষ করিলেই পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়। এই ব্যবস্থা চাষীকে জমি হইতে উৎখাত করিবার পথ স্থায়ী করিয়াছে। যে জমিদারেরা ছিল সরকারের রাজস্ব-আদায়কারী এজেণ্টমাত্র, তাহারাই এখন জমির মালিক ও স্বত্বাধিকারীতে পরিণত হইয়াছে। জমিতে চাষ করে যে কৃষক, জমিতে তাহার মালিকানা নাই। রাজস্ব-আদায়কারী সরকারী এজেণ্টরাই এখন জমির প্রকৃত মালিক সাজিয়া বসিয়াছে। জমির ক্রয়-বিক্রয় বিলিব্যবস্থা—সব কিছুরই নিয়ন্ত্রণ করে তাহারা। জমির পরিচর্যার জন্য প্রাণপাত করিয়া সম্বৎসর খাটিয়া মরে যে কৃষক, জমির সুফলটুকু হইতে তাহারা বঞ্চিত। জমিদার এবং কৃষকদের মাঝখানে তালুকদার, পত্তনীদার, গাঁতিদার, জোতদার প্রভৃতি নানা মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব ঘটিয়া কৃষিব্যবস্থাকে আরো জটিল করিয়া তুলিয়াছে। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা জমিদারের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া নিজেরাই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ এলাকায় খাজনা আদায় করিতেছে। জমিদারদের দেয় রাজস্ব অপেক্ষা বহুগুণ অর্থ ইহারা প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লয়। চাষীরা জমির সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া ভাগ-চাষী এবং তারপর জনমজুর-ক্ষেতমজুরে পরিণত হইয়া যাইতেছে। জোতদারদের এই অমানুষিক অত্যাচার হইতে প্রজাদের বাঁচাইতে না পারিলে বাংলার কৃষককুলের ধ্বংস অনিবার্য।"

॥ চার ॥

রাস্তা থেকেই রণপতি হাঁক-ডাক শুরু করল—'ও কৈলেসদা, তাড়াতাড়ি বারোয়ে দ্যাখো, কাদের ধরে আনিচি—'

রণপতির ডাক শুনে কৈলাস ব্যস্ত হয়ে বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ায়। রণপতির পিছনে জনা পাঁচেক অচেনা লোক। সকলেরই ঘাড়ে বোঁচকা-বুঁচকি। পথশ্রমে ক্লান্ত। রণপতি লোকগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে—'বিলকান্দার ক্ষ্যাতে গি'লাম। ফেরার পথে এনাদের সাথে দ্যাখা। আমার কাছে বাত্তা নেচ্ছে—কৈলেস মোড়লের বাড়ী কোন্‌ড়া? তা আমি একেবারে সাথে ক'রেই নিয়ে আসলাম।'

এতোক্ষণে যেন কৈলাসের হুঁশ হ'লো। —দ্যাখো দিকিনি কত বড়ো বেভ্রম। আরে, এতো মেস্তোরীরা এসেছে। কৈলাস এবার রণপতির চেয়েও গলা চড়িয়ে ছেলেদের নাম ধ'রে ডাকাডাকি শুরু ক'রে দেয়—'ওরে ও নবীন, ওরে ও সতীশ,—কনে গেলি সব—' মিস্ত্রীদের দিকে ফিরে বলে—'আসো, আসো মেস্তোরী ভাইরা, কয়দিন তো তোমাদের পথের দিকিই তাকায়ে রইছি—।'

লোকগুলি হেঁটে হেঁটে যথার্থই বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কৈলাসের আন্তরিক অভ্যর্থনায় খুবই আপ্যায়িত হ'লো। ওদের মধ্যেকার বয়স্ক লোকটি—চেহারায় ভার-ভারিক্কি ভাব দেখলে হেড-মিস্ত্রী ব'লে মনে হয়—কৈলাসের ব্যস্ততায় যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে—'আস্‌তি এট্টু দেরীই হয়ে গেছে আমাদের মাতুব্বরদাদা। সব যন্তর-পাতি গোছগাছ ক'রে বাড়ীর দিকডাও এট্টু সাম্‌লে-সুম্‌লে আস্‌তি দেরী হয়ে গেলো। তা, চিন্তার কিছু নেই। কাজ আমরা সময় মতোই তুলে দেবো।'

নবীন আর সতীশ ছুটে এসে মিস্ত্রীদের কাঁধের বোঁচকা-বুঁচকি ধ'রে ধ'রে নামাল। কৈলাসের মেয়ে চাঁপা নতুন শাড়ী পরা আরম্ভ করেছে। সেও ডুরে শাড়ীটা টেনে-টুনে কোনোমতে গায়ে জড়িয়ে একটা মাদুর নিয়ে বিছিয়ে দিলো উঠোনের কোণে আমগাছটার ছায়ায়। তারপর দুটো গাড়ুতে জল ভ'রে এনে নামিয়ে রাখল মিস্ত্রীদের পা ধোবার জন্য। হাত মুখ ধুয়ে মিস্ত্রীরা আমগাছের শীতল ছায়ায় গা এলিয়ে দিয়ে বসল। কৈলাস বাড়ীর মধ্যে থেকে একপাক ঘুরে এসে বলল—'মেস্তোরী ভাইরা, পাকের জোগাড় আরম্ভ হইছে। তা, দুডো ডাল-ভাত নামাতিও তো খানিক সময় লাগবেনে। তাই কই কি, এট্টু কিছু গালে দিয়ে জিরেয়-শিতেয় নিলি ভালো হয়।'

কৈলাসের ইঙ্গিতে নবীন সতীশ দুই ভাই মিস্ত্রীদের জলখাবারের জোগাড় ক'রে দিলো। চিড়ে-মুড়ি জলে ভিজিয়ে নারকেল-কোরা আর গুড় মেখে জলখাবারের ব্যবস্থা হ'লো। জলখাবারের পাট সেরে মিস্ত্রীরা আবার থিতু হয়ে বসল। হাতে হাতে হুঁকো ঘুরতে লাগল। কৈলাস রণপতি ছাড়াও পাড়ার আরো অনেকে এসে মিস্ত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছে। মিস্ত্রীরা এসেছে বাগেরহাট থেকে। ভিন্ জায়গার লোক। সেদেশের খবরা-খবর জানতে সকলের মনেই কৌতূহল।

সেই রাতেই কৈলাস ৺সত্যনারায়ণের সিন্নির আয়োজন ক'রে বসল। সেদিন তুলোরামপুরের হাটবার ছিল। কৈলাস লোক পাঠিয়ে দিলো হাটে। পূজোর জিনিসপত্র জোগাড় ক'রে আনল। কাল থেকেই মিস্ত্রীদের কাজ আরম্ভ করিয়ে দিতে হবে। তার আগে পূজো-আচ্চার এসব দিকগুলো সেরে নিতে হবে। কাজটা সখের কাজ বটে, কিন্তু বৃহৎ কাজও তো বটে। রীত-কানুনগুলো সব মেনে চলা দরকার।

রাতের দিকে গ্রামের ছেলেবুড়ো সব ঝেঁটিয়ে এসে জড় হ'লো কৈলাসের উঠোনে। সত্যনারায়ণের সিন্নির লোভ তো ছিলই। ভিনদেশের মিস্ত্রীরা এসেছে মাতব্বরের বাড়ী বা'চের নাও গড়তে। তাদেরও একবার দেখবার ইচ্ছা সকলের মনে। গরুর খাবারের জন্য খড়ের পালা সাজানো ছিল উঠোনের এক কোণে। সেখান থেকে হালকা ক'রে খড় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে সারা উঠোন জুড়ে। উঠোনের মাঝখানে টিম্ টিম্ করছে একটা হারিকেন। সেখানে পূজোর উপকরণ, প্রসাদের ফলমূল সাজানো হচ্ছে। একপাশে খোল-কত্তাল বাজিয়ে পাড়ার কয়েকজন কীর্তন-গাইয়ে গা'ন ধরেছে—'ও দয়ালো ঠাকুর, তোমায় এই আসরে আসতে হবে।'

ভীড় থেকে একটু দূরে একটা জলচৌকি পেতে একাকী বসেছিলেন সত্যপ্রসাদ। পূজো-পাট সম্পর্কে তাঁর অহেতুক কোনো ভক্তিও ছিলনা, আবার তাচ্ছিল্যও ছিল না, বরাবরই এ-ব্যাপারে একটু নিস্পৃহতা পোষণ করেন। এখন এই আবছা আলো-অন্ধকারের মধ্যে ব'সে ব'সে উঠোন-ভর্তি মানুষগুলোকে দেখে মনে হ'লো, এই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে কোথায় যেন একটা মাদকতা আছে। কিছুক্ষণ ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে থাকলেই একটা আবিষ্টতা এসে মনটাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে চায়।

ভীড়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে ছিল যতীন। দুটো হারিকেনের টিমটিমে আলো। মানুষজনের মুখ দেখা যায় না ভালো ক'রে। কিন্তু এরই মধ্যে যতীন লক্ষ করল সত্যপ্রসাদকে। একবার এগিয়ে যাবার কথা ভাবল যতীন। কিন্তু পরেই সঙ্কোচ-বোধ করল। সত্যপ্রসাদের সঙ্গে সেই একদিনের আলাপ। তারপরেও দু'একদিন সত্যপ্রসাদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছে। সত্যপ্রসাদই এগিয়ে এসে যতীনের দু'হাত জড়িয়ে ধ'রে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেছে। কিন্তু যতীন কিছুতেই যেন মনের সঙ্কোচটুকু কাটিয়ে উঠতে পারে না। তাছাড়া সে বরাবরই দেখে এসেছে, ঐ সব মানুষদের সঙ্গে ওদের মেলে না। নড়াইল কলেজে আই. এ. পড়বার সময়ই যতীন এটা বরাবর লক্ষ করেছে। ক্লাশের সেরা ছেলেদের একজন ছিল সে। কিন্তু সে যে নীচুজাত চাষার ছেলে, এটা নিয়ে আড়ালে নানারকম রসিকতা হতো, সেটা সে উপলব্ধি করত।—'চাষার ছেলে বিদ্যাসাগর হবে'—এ-রকম মন্তব্য তার অনেক সহপাঠীর কাছ থেকেই যতীনকে শুনতে হয়েছে। দু'একটি ব্যতিক্রম যে না ছিল, তা নয়। কিন্তু বর্ণশ্রেষ্ঠ সহপাঠীদের অধিকাংশেরই ব্যবহার ছিল রূঢ় এবং তাচ্ছিল্যপূর্ণ।—যদিও ছাত্র হিসেবে তারা অনেকেই ছিল যতীনের থেকে নিকৃষ্ট। ফলে যতীনের মনের মধ্যে এদের সম্পর্কে সেই থেকে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

হয়ে রয়েছে। আর ব্রাহ্মণ জমিদার বৈকুণ্ঠবাবুর ছেলে সত্যপ্রসাদের সঙ্গে তাদের একাসনে বসার কথা চিন্তা করাও তো ধৃষ্টতা। ওঁরা মনিব। তারা ভৃত্য। তাদের বাড়ীর ছেলেরা বৈকুণ্ঠবাবুদের মতো লোকদের বাড়ীতে বেগার দেবে, জন-মুনিষ খাটবে, বাবু কিম্বা বাবুর বাড়ীর ছেলেমেয়েরা একটু হেসে কথা বললে কৃতার্থ হয়ে যাবে—এটাই এখানকার সাত-পুরুষের রেওয়াজ। বাবুদের বাড়ীর কোনো ছেলে চাষাভূষোদের বাড়ীর কোনো ছেলের হাত জড়িয়ে ধ'রে ভাই-বেরাদার ব'লে কথা বলবে, এটা তো ভাবাই যায় না। উচ্চবর্ণের ধনী জমিদার বৈকুণ্ঠবাবুর কলকাতায়-শিক্ষিত ছেলে সত্যপ্রসাদের বন্ধুতার ভঙ্গীটুকুকে তাই যতীন কখনই সহজভাবে নিতে পারত না। এখানকার এই চাষীদের দশ এগারখানা গ্রামের মধ্যে সেই হ'লো সবচেয়ে বেশী লেখাপড়া-জানা বিদ্বান ছেলে। কিন্তু এই শিক্ষার আলোটুকু যেন তার মনের জটিলতাকে বাড়িয়ে দিয়ে একটা হীনমন্যতার জন্ম দিয়েছে। অশিক্ষার মধ্যে একটা সহজ আত্ম-সমর্পণের ভাব থাকে। কোনো জটিলতার জট জমা হতে দেয় না। বিলভাসানের অশিক্ষিত চাষী মানুষগুলোর মধ্যেও তাই কোনো জটিলতা নেই। জোতদার জমিদারবাবুদের শত রকমের অত্যাচারে তারা ক্ষুব্ধ মাঝে মাঝে হয় বটে, কিন্তু মনে কোনো বিদ্বেষ পুষে রাখতে পারে না। ততটা মানসিক শক্তি ওদের সাত-পুরুষের মধ্যে কারো দেখা যায় না। সব ঘৃণা লাঞ্ছনা আর অত্যাচারের মধ্যেও 'বাবু'দের প্রতি একটা সমীহ এবং নির্ভরতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু যতীন চাষী-বাড়ীর ছেলে হয়েও এখানকার এই চিরাচরিত মনোভাবটি হারিয়ে ফেলতে বসেছে। তার ঐ লেখাপড়া-জানা মনটিই এর জন্য দায়ী। কলেজে পড়বার সময় যতীন দেখেছে, লেখাপড়ায় সে তার বহু সহপাঠীর থেকে শ্রেষ্ঠ হয়েও কোথায় যেন সে সকলের থেকে পিছিয়ে আছে। শিক্ষক, সহপাঠী সকলেরই চোখে-মুখের ঐ ভাবটা যতীন পড়তে পারত। ফলে কারো সঙ্গেই সহজভাবে মিশতে পারত না। আবার লেখাপড়ায় উৎকৃষ্টতার গৌরবটুকু তার মনের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা অহমিকা-বোধও জাগিয়ে দিয়েছিল। ফলে সে বিলভাসানের চাষী-মানুষের পিতৃপুরুষের রক্তবাহিত আজন্ম আত্ম-সমর্পণের প্রবণতাটাও রপ্ত ক'রে উঠতে পারেনি। বিলভাসানে সত্যপ্রসাদের আগমন, যে চাষাদের সঙ্গে একাসনে বসতে ঘৃণা বোধ হয়, যাদের জল অচল, সেই চাষাদের বাড়ীতে এসে থেকে তাদের অন্নগ্রহণ—এসব ব্যাপারগুলোকে কিছুতেই যতীন সহজভাবে মানিয়ে নিতে পারছিল না। এত বড়ো একটা বৈপ্লবিক বিপর্যয়কর ঘটনায় অজ্ঞ সরল চাষীরাও প্রথমটায় ভয়ানক রকম হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের সহজ সরল জীবনযাত্রায় কোনো কিছুই বেশীদিন দাগ কেটে স্থায়ী হয়ে থাকতে পারে না। সত্যপ্রসাদের আগমন তাই বিদ্যুতের মতো তাদের হঠাৎ যেমন চমকেও দিয়েছিল, সেই চমকটুকু মুছে যেতেও তেমনি দেরী হয়নি। কিন্তু যতীন মনের খিঁচ্‌টুকুকে কিছুতেই দূর করতে পারল না। পরে অবশ্য এই ব'লে মনকে আশ্বস্ত করেছিল যে, এটা সত্যপ্রসাদের একটা বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। 'বাবু'দের তো নানারকম বিলাস থাকে। কোনো বাবু কলকাতায় গিয়ে মদ মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করেন। কোনো বাবু বিল-ভাসানের কিম্বা দেশের আর পাঁচ গাঁয়ের চাষীদের পিঠে ছড়ির ঘা মেরে হাতের সুখ

করেন। কিম্বা আরো সাতটা পাঁচটা বড়লোকী করেন। আর সত্যপ্রসাদবাবু ওসব কিছুই না ক'রে গাঁয়ের চাষীদের মধ্যে থেকে বিবেকানন্দের জীবে প্রেম দেখাচ্ছেন। এটাও বাবুদের একটা বিলাস। তবে বিলাসটা একটু নতুন ধরনের, এই আর কি! দুদিন বাদে এই বিলাসিতার মোহটা কেটে গেলেই আবার ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাবেন। এবং চাষাদের শোষণ ক'রে, বঞ্চিত ক'রে কিভাবে পৈতৃক সম্পদের পরিমাণ আরো বাড়ানো যায়, সেদিকে মনোযোগী হবেন। এসব কথা ভেবেই মোটামুটি নিশ্চিন্ত ছিল যতীন। এবং সত্যপ্রসাদকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলত। হঠাৎ দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে গেলে যতটুকু অন্তরঙ্গতা না দেখালেই নয়, তাই দেখাতো। কিন্তু নিতান্ত আকস্মিকভাবেই তার এই ধারণাটায় আজ একটা চিড় খেলো।

খোল করতাল আর কীর্তনের উদ্দাম শব্দ তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে। কান পাতা দায়। হঠাৎ যতীন পিঠের উপর কার হাতের স্পর্শ অনুভব করল। —'আরে, ছোটোবাবু যে'—কথাটা বলতে গিয়েও যতীন সামলে গেলো। সংযত গলায় শুধু বলল—'সত্যদা!'—

সত্যপ্রসাদের গলায় আন্তরিকতার স্পর্শ লাগে,—'হ্যাঁ ভাই, আমি সত্যদা। চলো, বাইরে কোথাও গিয়ে কথা বলি। এখানে যা শব্দ-ব্রহ্মের নিনাদ, কানে আর কিছু ঢুকবার উপায় নেই।'

সত্যপ্রসাদের কথায় যতীনও হেসে ফেলে—'ঠিকই বলেছেন। চলুন, বাড়ীর নিচে যাই।'

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে উঁচু ভিটে থেকে নিচে নেমে আসে। সামনের ভাগাড়টা পার হয়ে এগিয়ে যায়। সামনেই কচুরী-পানা-ভর্তি বিশাল পুকুরটা। চারদিকে থমথমে গাঢ় অন্ধকার। শুকনো কচুরী-পানার ভিতর কট্‌কটে ব্যাঙ নানারকম শব্দ ক'রে ডাকছে। রাশি রাশি জোনাকী হালকা পাখায় উড়ে উড়ে আলোর মালা বুনে কেমন যেন একটা মায়ার খেলা খেলছে।

পুকুরপাড়ের শেষপ্রান্তে অনেকখানি চওড়া জায়গা। দিনের বেলায় ছেলেরা এখানে হাডুডু, গোল্লাছুট খেলে। একটু ধুলো হলেও জায়গাটা বেশ পরিষ্কার। পুকুরের কুল ঘেঁষে ঘাস দেখে ওরা বসল। দু' চারটা কথাবার্তা বলতে বলতে যতীনের সঙ্কোচ-বোধটা আস্তে আস্তে কেটে আসে। এবং মনে মনে একটু দুঃসাহসীও হয়ে ওঠে। হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে—'আচ্ছা সত্যদা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। কিছু মনে করবেন না। আপনি হঠাৎ কলকাতার জীবন ফেলে, বাড়ী ঘর-দুয়োর ছেড়ে, আমাদের এই ছোটোলোক চাষাদের মধ্যে কেন থাকতে এলেন?'

সত্যপ্রসাদের সুন্দর হাসিটুকু অন্ধকারেও অনুভব করা গেলো। —'একথা কেন জিজ্ঞাসা করছ যতীন? আমাকে দু'টো অন্ন দিতে তোমাদের এই বিলভাসানের এতবড়ো তল্লাটের মানুষগুলো কি একেবারেই ফতুর হয়ে যাবে?'

যতীন আগের মতোই ভারী গলায় বলে—'আমি কিন্তু আপনাকে কথাটা ওভাবে জিজ্ঞাসা করিনি সত্যদা। আমি সত্যি সত্যি জানতে চাইছি।'

সত্যপ্রসাদ বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলেন। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলো আকাশ

দিয়ে উড়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে তারাগুলোকে ঢেকে দিচ্ছিল। সেদিকে অন্য-মনস্কের মতো তাকিয়ে থাকলেন। তারপর অত্যন্ত নীচুস্বরে কেমন যেন একটু অসংলগ্নভাবে বলতে লাগলেন—'তোমার কথার কি উত্তর দেবো, আমি বুঝতে পারছিনা যতীন। কারণ, আমি নিজেই এর উত্তর জানি না।'

যতীন কোনো জবাব দিলো না। চুপ ক'রে বসে থাকল। সত্যপ্রসাদের কণ্ঠের এই আকস্মিক বিষণ্ণতা ওকেও একটু আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল।

একটু বাদে সত্যপ্রসাদই আবার কথা বললেন—'তবে তোমাকে একটা কথা বলি যতীন। বিশ্বাস করা বা না করা তোমার ইচ্ছা। ছোটোলোক চাষাদের বাড়ী এসে আমার এই থাকার কথাটা ঠিক না। কারণ, আমি কখনই ও-ভাবে ব্যাপারটা ভাবি না। তোমাদের এখানে এসে থাকতে আমার কোনোই সঙ্কোচ নেই। কারণ মানুষের মর্যাদাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তোমাদের পক্ষে অবশ্য এ-কথা সহজে মেনে নেওয়া কঠিন। নানা অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে জন্ম হয় সংস্কারের। আমার পিতৃ-পুরুষদের আচরণ যদি তোমাদের বিলভাসানের চাষীদের মধ্যে এই সংস্কারের জন্ম দিয়ে থাকে যে, তেলে জলে কখনও মিশ খায় না, বাবুর রক্ত আর চাষীর রক্ত কখনো এক হতে পারে না, তাহলে আমি তাদের দোষ দিতে পারি না। তাদের অভিজ্ঞতাই তাদের এই সংস্কারের জন্ম দিয়েছে। এককথায় তাদের সেই সংস্কারকে উড়িয়ে দেবার দুঃসাহস আমার নেই ভাই।'—

একটু থামলেন সত্যপ্রসাদ। কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বললেন—'তোমাদের এই বিলভাসানে আমার জায়গা হবে কিনা জানি না। কিন্তু সারা বাংলাদেশ জুড়ে এ-রকম হাজার হাজার বিলভাসান রয়েছে—। কোথাও না কোথাও আমার একটু জায়গা হবেই!'

পরিস্থিতিটাকে হাল্‌কা করার জন্যই যেন যতীন একটু হেসে বলল—'সবই তো বুঝলাম সত্যদা, কিন্তু হঠাৎ আপনার মাথায় এ-রকম একটা চিন্তা আসল কেন? বিলভাসানের চাষীদের মধ্যে এসে বাস করার দরকার হ'লো কেন আপনার?'

যতীনের গলার হালকা সুর সত্যপ্রসাদকেও স্পর্শ করল। হেসে বললেন—'কপালে তোমাদের অন্ন খাওয়া ছিল—ঠেকাবে কে?'

একটু চুপ ক'রে থেকে সত্যপ্রসাদ আবার কথা বললেন। কণ্ঠের হালকা সুরের পরিবর্তে আবার ফিরে এলো সেই বিষণ্ণতা—'স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমি বাড়ীছাড়া। বরাবর কলকাতায় মানুষ। কলেজের লেখাপড়াও কলকাতায়। বি. এ. পাশ করার পর কিছুদিন কংগ্রেসের কাজ করেছি। বিলেতি জিনিসের দোকানে পিকেটিং করেছি। সেই সুবাদে কয়েকদিন জেলও খেটেছি। কিন্তু কোনো কিছুতেই যেন মনের শূন্যতা ভরেনি। সমস্ত ব্যাপারটাকে মাঝে মাঝে বড়ো ছেলেমানুষী ব'লে মনে হয়েছে। পরাধীনতার দুঃখ তো আছেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো একটা দুঃখ ক্রমেই মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। এ দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামের বাসিন্দা। চাষবাসই তাদের প্রধান জীবিকা। কিন্তু উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রেও তাদের মুখে আজ দুটো অন্ন জোটে না। বিদেশী শাসকরা

তাদের উপর শোষণ চালাচ্ছে। অত্যাচার করছে। কিন্তু আমরাও তো তাদের উপর কম অবিচার করছি না। এই বোধটা আমার আরো বেশী ক'রে মাথা চাড়া দিতো—মাঝে-মধ্যে কলকাতা থেকে যখন বাড়ী আসতাম। আমাদের জমিদারীটা খুব বড়ো না হলেও দাপট কিছু কম নেই। চাষীদের কিভাবে শোষণ করা হয়, কিভাবে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত ক'রে তাদের তিলে তিলে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া হয়, তা জানবার জন্য আমাকে বেশী দূরে যেতে হয় নি। আমার বাড়ীতেই সে অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট হয়েছে। ভিতরে ভিতরে এই বিষয়টা আমাকে বড়ো পীড়া দিতো। বাড়ী এসে টিকতে পারতাম না। দশদিন বাড়ী থাকব ব'লে এসে দু'দিনেই আবার কলকাতায় পালিয়ে যেতাম। কিন্তু সেখানেই বা স্বস্তি কোথায়! তুমি কার্ল মার্কস-এর নাম শুনেছ কিনা জানি না যতীন। পৃথিবীতে এতো বড়ো চিন্তাবিদ্ আর জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। মনের ঐ অবস্থায় কয়েকজন মার্ক্সবাদী নেতার সঙ্গে কলকাতায় আমার যোগাযোগ হয়। তাঁদের কাছেই মার্ক্সবাদ সম্পর্কে কিছু বই পড়বার সুযোগ আমার ঘটে। দেশের চাষীদের শোষণ, বঞ্চনা মনের মধ্যে যে ভার সৃষ্টি ক'রে রেখেছিল, মার্ক্সবাদের এই দীক্ষা আস্তে আস্তে আমার মনের সে ভার দূর ক'রে দেয়। খুব স্পষ্ট ক'রে না হলেও আমি যেন একটা পথের সন্ধান পেলাম। বুঝলাম, চাষীদের মুক্তির একমাত্র পথ—তাদের 'আত্ম-জাগরণ'। জোতদার, জমিদার ইত্যাদি শোষক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে যেদিন তারা নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, সেদিনই তাদের সত্যিকারের মুক্তি আসবে। তাদের এই জাগরণে আমার সামান্য সামর্থ্য নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করবার একটা তাগিদ মনের মধ্যে বড়ো তীব্রভাবে অনুভব করছিলাম। এবার কলকাতা থেকে বাড়ী এসে তোমাদের এই বিলভাসানের কয়েকজন চাষীর খাজনা মকুব নিয়ে বাবার সঙ্গে আমার মতান্তর হলো। সেদিনই আমি আমার পথ স্থির ক'রে ফেললাম। আর আমার সেই নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাবার জন্য বিলভাসানে আসা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।'—

যতীন স্তব্ধ হয়ে সত্যপ্রসাদের কথা শুনছিল। কৈলাসের বাড়ীর কীর্তনের শব্দ আরো উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বাতাসে সেই প্রবল শব্দ-তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ সেই শব্দ ভেদ ক'রে ভিন্ন আর একটা আর্ত চীৎকারের ধ্বনি বাতাসে ধ্বনিত হ'লো। একটু বাদেই দক্ষিণ পাড়ার দিক থেকে অন্ধকার আকাশ লক্ষ ক'রে কয়েকটা আলোকের শিখা ঊর্ধ্বমুখে মাথা তুলে দাঁড়াল। মুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলল যতীন। বিলভাসানে শুকনো খড়ের চালে মাঝে মাঝেই এটা ঘটে। তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যতীন বলল—'শীগ্‌গীর উঠুন সত্যদা, ও-পাড়ায় বোধহয় আগুন লেগেছে।'

বলেই যতীন ছুটতে শুরু করল। সত্যপ্রসাদও তার পিছনে পিছনে ছুটলেন। আগুনের দীপ্ত শিখাতেই তখন খবরটা দ্রুত চারিদিকে জানাজানি হয়ে গেলো। কীর্তনের আসর ভেঙ্গে লোকজন সবাই ছুটল। দক্ষিণ-পাড়ার সখীচরণদের ভিটেয় আগুন লেগেছে। সবই খড়ের ঘর। একটার সঙ্গে আর একটা প্রায় লাগানো। আগুন এক ঘর থেকে আর এক ঘরে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলতে লাগল।

রান্নাঘরের কোনো অসাবধানী বউ-ই কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। পাটকাঠির জ্বালে রান্না হয়। উনুনের আগুন পাটকাঠি বেয়ে রান্নাঘরের বেড়ায় ধরেছে। সেখান থেকে খড়ের চালে। এখন দাউ দাউ ক'রে আগুন ছড়াচ্ছে চারিদিকে। উঠোন জুড়ে ভীত ত্রস্ত মানুষগুলোর চীৎকার চেঁচামেচি—'ওরে কলসী আন্, ওরে জল আন্—ওরে বাঁশ মার্।' —কিন্তু যতটা চীৎকার চেঁচামেচি আর ছুটোছুটি হতে লাগল, আগুনকে আয়ত্তে আনবার জন্য সে-রকম কার্যকরী কিছু ব্যবস্থা হতে দেখা গেলো না। নিমেষে সত্যপ্রসাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল কলকাতায় ফায়ার ব্রিগেডের আগুন নেভানোর দৃশ্য। সত্যপ্রসাদ দশ বারোটি জোয়ান ছেলেকে দ্রুত নির্দেশ দিলেন পরপর লাইন দিয়ে দাঁড়াতে। বিভ্রান্ত ছেলেগুলি সত্যপ্রসাদের নির্দেশে বেশ খানিকটা সুশৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াল। ভিটের নিচেই পুকুর। হাঁড়ি কলসী বালতি ভর্তি জল হাতে হাতে উপরে উঠে আসতে লাগল। যতীন এবং আর কয়েকটি লোককে নিয়ে সত্যপ্রসাদ অগ্নিকাণ্ডের কাছাকাছি এগিয়ে গেলেন। জোরালো হাতে সবাই জল ছুঁড়ে মারতে আরম্ভ করল আগুনের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন বাগ মানল। কিন্তু হঠাৎই একটা অঘটন ঘটে গেলো। একটা আধ-পোড়া ঘরের চাল বাঁশ-বাখারি সমেত হড়কে পড়ল নিচে। বাঁশগুলো তখনো জ্বলছিল। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সত্যপ্রসাদ। একটা জ্বলন্ত বাঁশের খণ্ড ছিটকে এসে সজোরে লাগল সত্যপ্রসাদের কপালে।

'উঃ মা'—ব'লে অস্ফুটে একটা শব্দ ক'রে লুটিয়ে পড়লেন সত্যপ্রসাদ।

এই আকস্মিক ঘটনার আঘাতে সবাই কেমন বোবা ব'নে গেলো। এতো বড়ো অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়-ক্ষতিতেও কেউ যেন এতোটা ভীত বা বিহ্বল হয়নি। এ-ধরনের অগ্নিকাণ্ডের মুখোমুখি তাদের মাঝে-মধ্যেই হতে হয়। এটা তাদের অভ্যাসের আওতার বহির্ভূত নয়। কিন্তু বাবুদের বাড়ীর ছেলে চাষার ঘরের আগুন নেভাতে গিয়ে প্রাণ দিতে বসেছেন, এটা তাদের বিস্ময়েরও ব্যাপার, ভয়েরও ব্যাপার। এর যে কী সর্বনেশে পরিণাম দাঁড়াবে, তা তাদের চিন্তারও বাইরে। ফলে একটা বোবা জন্তুর মতো সবাই ভয়ার্ত অনুভূতিটা বুকের মধ্যে সবলে চেপে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এলো কৈলাস। ছাইমাটি জলকাদা-মাখা সত্যপ্রসাদের অচেতন দেহটার দিকে তাকিয়ে একেবারে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠল—'ওরে, তোরা একি সব্বোনাশ করলি রে। গাঁয়ের মধ্যি রাজহত্যে করলি রে।'—কৈলাস বারবার এই একই কথা বলতে লাগল, আর পাগলের মতো নিজের বুকে কিল মারতে লাগল।

ঘরের চালের আগুন তখন প্রায় সবই নিভে গেছে। শুধুমাত্র বাঁশ-খুঁটির ভিতরের আগুন তখনো ধোঁয়াচ্ছিল। চারিদিকে একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ। ভীড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল যতীন। ঘটনার আকস্মিকতায় সেও বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। কৈলাসের ঐ পাগলের মতো চীৎকারে হঠাৎ যেন তার সম্বিৎ ফিরে এলো। দু'তিনটি ছেলেকে ডেকে সবাই ধরাধরি ক'রে সত্যপ্রসাদের অচেতন দেহটাকে অগ্নিদগ্ধ ঘরগুলো থেকে দূরে সরিয়ে এনে মাদুর বিছিয়ে শুইয়ে দিলো।

কে একজন দৌড়ে গিয়ে লক্ষ্মণ কবিরাজকে ডেকে নিয়ে এলো। এই সব চাষী-বাসীদের গ্রামে ডাক্তারের কোনো চল্ নেই। বড়ো একটা প্রয়োজনও হয় না। এখানে বাঁচাটাও যেমন সহজ, মরাটাও তেমনি। তবে লক্ষ্মণ কবিরাজ চিকিৎসা খারাপ করে না। লক্ষ্মণ এসেই সত্যপ্রসাদের কপালের ক্ষতস্থানটা ভালো ক'রে পরিষ্কার ক'রে দিলো। কপালের ডানপাশে অনেকটা জায়গা পুড়ে গেছে। কী একটা পাতা এনে থেঁতলে জাব বানিয়ে লক্ষ্মণ পোড়া জায়গায় লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো। তারপর একঘটি জল চেয়ে নিয়ে ঘটির পরে মুখ রেখে বিড়বিড় ক'রে কী সব মন্ত্র আওড়ালো। তারপর সেই মন্ত্রপূত শীতল জল আস্তে আস্তে সত্যপ্রসাদের চোখে মুখে কপালে ছিটিয়ে দিতে লাগল। একটু বাদেই সত্যপ্রসাদ অস্ফুটে একটা শব্দ ক'রে উঠলেন। সকলের চোখে মুখে উজ্জ্বলতা দেখা দিলো।

যতীন সত্যপ্রসাদের মুখের উপর একটুখানি ঝুঁকে বলল—'সত্যদা, কোনো ভয় নেই, আমরা সবাই আছি।'

সত্যপ্রসাদ যেন একটুখানি ম্লান হাসলেন। আচ্ছন্নতার ভাবটা এখনো পুরো-পুরি কাটেনি। শ্রান্ত চোখ দুটো মেলে সকলের দিকে একবার তাকালেন। তারপর ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন—'আগুন থেমেছে তো ?'—

ব'লেই কপালের যন্ত্রণায় বোধহয়, আবার চোখ বুজলেন। যতীনের সমস্ত হৃদয় জুড়ে একটা তীব্র অনুভূতি মোচড় দিয়ে উঠল। সত্যপ্রসাদ সম্পর্কে তার মনের মধ্যে এতোদিন যে গ্লানি জমা হয়ে ছিল, তাঁর যে আচরণকে নেহাৎ একটা শৌখিন বিলাসিতা ব'লে মনের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে একটা অবজ্ঞা-মিশ্রিত ধারণা পোষণ ক'রে ছিল, এই মুহূর্তে তা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। সত্যপ্রসাদের এই চাষী-প্রীতি শুধু যে বিলাস নয়, এর পিছনে যে প্রাণের টানও আছে, যতীন তা আপন অন্তরে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করল। হতভাগা চাষাদের কখানা কুঁড়েঘর বাঁচানোর জন্য জমিদার বৈকুণ্ঠবাবুর আদরের ছেলের এইভাবে প্রাণ বিপন্ন ক'রে এগিয়ে আসার মধ্যে যে বৈপরীত্য রয়েছে—তার সত্যতাটুকু যতীন স্বীকার না ক'রে পারল না। জ্ঞান ফিরে এতোখানি দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যেও সত্যপ্রসাদের ঐ প্রথম কয়টি কথা—'আগুন থেমেছে তো'—বারবার যতীনের মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে বাজতে লাগল।

॥ পাঁচ ॥

বাইচের নৌকা-গড়ার কাজ জোর এগিয়ে চলেছে। বাগেরহাটের মিস্ত্রীদের হাত ভালো। যেমন জোরে চলে, কাজও তেমনি পরিষ্কার। প্রায় শ' হাত লম্বা কাঠের দাঁড়া বসানো হয়েছে। দু'পাশে তক্তা জোড়ার কাজও শেষ হবার মুখে। কাজের বাকীও এখনো অনেক। আড়া, গুরো, ডালি বসানো। তারও পরে রয়েছে গলুইয়ের কাজ। তবে যেভাবে রম্ রম্ ক'রে এগোচ্ছে, বিশ্বকর্মা পূজার আগেই

নৌকা জলে নামিয়ে দেওয়া যাবে ব'লে মনে হয়।

দুপর বেলায় মিস্ত্রীরা খেয়েদেয়ে উঠে মাতব্বরের বারান্দায় শুয়ে একটু গা গড়িয়ে নিচ্ছিল। সারাদিনের মধ্যে এইটুকুই তো বিশ্রাম। নৌকাগড়ার জায়গাটা এখন নিস্তব্ধ। মিস্ত্রীদের র‍্যাঁদা ঘষার ঘ্যাঁষ-ঘ্যাঁষ শব্দ, হাতুড়ি পিটিয়ে কাঠে পাতাম বসানোর ঠকাঠক্ আওয়াজ—সবই এখন বন্ধ। আম এবং নারকেল গাছের তলায় রৌদ্র-ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে দীর্ঘ নৌকার কাঠামোটা অতিকায় একটা আদিম প্রাণীর কঙ্কালের মতো পড়ে ছিল।

নৌকার কাঠামোটার ওপাশে মাঝে মাঝে ঠুক্ ঠুক্ ক'রে একটা শব্দ হচ্ছিল। কৈলাস মাতব্বরের মেয়ে চাঁপা শব্দটা শুনে এগিয়ে এলো। বছর পনেরোর ঢল্‌ঢলে চেহারার কিশোরী মেয়েটা। চোখে মুখে লাবণ্য আর উচ্ছলতা উপচে পড়ছে। একটুখানি এগিয়ে উঁকি মেরে দেখেই ওর দু'চোখে কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল। হাত দু'খানা কোমরে রেখে চোখ দু'টো বড়ো বড়ো ক'রে বলল—'এ আবার কোন্ মেস্তোরী আস্‌লেন ?'

উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি কোনো কথা বলল না। মাথা নিচু ক'রে হাতুড়ি-বাটালি সহযোগে আগের মতোই ঠুক্‌ঠাক ক'রে চলল।

চাঁপা এগিয়ে এসে হঠাৎ ছোঁ-মেরে ওর হাতের জোড়া-লাগানো কাঠের টুকরো-গুলো তুলে নিলো। অবাক হবার ভঙ্গীতে বলল—'আরে বাপ, এযে দেখি নৌকো গড়ানো হচ্ছে। একেবারে মোয়ের-পঙ্খী। আগে জানলি বাবা কি আর বাগের-হাটের মেস্তোরী আনতো নাকি ! আমাদের এমোন ছিরিমান মেস্তোরী থাক্‌তি—'

ছোটো ছোটো কাঠের টুকরোগুলো মিলে সত্যিই সুন্দর একখানা নৌকার আদল এসেছে। চাঁপা দু'হাতে সেখানা উপরে তুলে ধ'রে বলল—'তা যাই কই মেস্তোরী, নৌকোখান বড়ো ভালো গড়াইছো !'—

মিস্ত্রী আর কেউ নয়। স্বয়ং জলধর। সে তখন রাগে ফুলছে। উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বলল—'ভালো হবে না কলাম চাঁপা। আমার নৌকো ফেরৎ দে—'

চাঁপা তাড়াতাড়ি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে নৌকো-সমেত হাত দু'খানা পিছনে লুকিয়ে বলল—'যদি না দিই'—

সদাহাস্যময় জলধরের মুখখানা এখন গোম্‌ড়া। চাঁপার উচ্ছল মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে বলল—'না দিবি তো না দিবি। নৌকো নিয়ে ধুয়ে খাগে যা—।' —ব'লে দুপ্‌দুপ্ ক'রে পা ফেলে এগিয়ে গেলো। বড়ো নৌকা-খানার গায়ে হেলান দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকল।

চাঁপা মুখ টিপে একটুখানি হেসে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। ছোট্টো নৌকা-খানাকে সন্তর্পণে জলধরের পাশে নামিয়ে রেখে ডাকে—'এই জলাদা—'

জলধর কোনো সাড়া দেয় না। চাঁপা আবার বলে—'এই জলাদা, রাগ করলে ?'

জলধর তবু কোনো কথা বলে না। মুখ ঘুরিয়ে ব'সে থাকে। চাঁপার মুখখানা এবার থমথমে হয়ে ওঠে। ফিরে দাঁড়িয়ে বলে—'থাক তবে, আমি চলে যাই।'

চাঁপা কয়েক পা এগিয়ে যেতেই জলধর ঘাড় কাৎ ক'রে একবার চাঁপার দিকে

তাকায়। যেতে যেতে হঠাৎ যেন চাঁপার কিছু একটা মনে প'ড়ে গেলো। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে জলধরের কানের কাছে মুখ রেখে বলল—'এই জলাদা, এট্টা জিনিস খাবা ? মিঠে গাছের তেঁতুল মাখিছি গুড় দিয়ে। পোড়া মরিচের গুড়ো আর নেবু-পাতা দিছি। খাবা ?'

জলধরের মাথাটা এবার আস্তে আস্তে ঘুরে আসে। কিন্তু গাম্ভীর্য অটুট্ রেখে বলে—'নিয়ে আয়।'—

চাঁপা ফিক ক'রে হেসে উঠে বলে—'খাওয়ার কথা শুন্‌লি অমনি নোলা সক্‌সক্ করে,—তাইনা ? তা, তুমি বসো। আমি নিয়ে আস্‌তিছি'—

চাঁপা পিছন ফিরে দু'পা এগোতেই জলধর গম্ভীর গলায় বলে—'শোন্, আগের দিন আমারে কিন্তু কম দিছিলি। কইছিলি, পরের দিন বেশী ক'রে দিবি। আজ একটু বেশী ক'রে আনবি।'—

চাঁপার চোখেমুখে হাসির বান ডাকে। কোনো কথা না ব'লে হালকা পা ফেলে দ্রুত মিলিয়ে যায়।

একটু বাদেই চাঁপা আবার ফিয়ে আসে। দু'হাতে দু'টুকরো কলাপাতায় খানিকটা ক'রে জারানো তেঁতুলের পিণ্ড। দু'জনে নৌকাখানার গায়ে ঠেসান দিয়ে ব'সে সেই অম্ল-মধুর তেঁতুলমাখা তারিয়ে তারিয়ে চেটে চেটে খায়। শুকনো লঙ্কার ঝাঁজে চোখে জল আসে। সেই জল-ভরা চোখে দুজনে দুজনের দিকে তাকায় আর হাসে। দু'টি কিশোর-কিশোরীর আসন্ন যৌবনকে ঘিরে মধ্যাহ্নের রোদ গাছ-গাছালির ফাঁকে আলোছায়ার বৃত্ত রচনা করে।

বিকেলের দিকে জোর কদমে কাজ চলছিল। ছ'জন মিস্ত্রী সমান তালে খাটছে। কষ্টীরাম মিস্ত্রীদের সঙ্গে জোগাড়ে-র কাজ করছে। সেদিনের সেই চুরির ঘটনার পর কৈলাসই মিস্ত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে এটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। দৈনিক মজুরী হিসেবে কষ্টীরামের যাহোক একটু আয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। মিস্ত্রীরা কাজ করছে আর কষ্টীরাম তাদের হাতে এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। একপাশে হুঁকো হাতে চৌকি পেতে কৈলাস বসে আছে। মাঝে মাঝেই লোকজন আসছে। গল্প-গুজব হচ্ছে। মিস্ত্রীদের হাতের কাজের তারিফ করে সবাই। হঠাৎ রাস্তার দিকে তাকিয়ে কষ্টীরাম সোল্লাসে চীৎকার ক'রে ওঠে—'মাতুব্বর কাকা, ঐ দ্যাখো গগন ঢং আসতিছে।'

বলতে বলতেই বিচিত্র পোশাক-আশাক আর চেহারার একটা লোক এসে দাঁড়াল। বছর পঞ্চাশ মতো বয়স। কিন্তু বেশ শক্ত-সমর্থ, গাট্টাগোট্টা, বলশালী চেহারা। মাথায় বড়ো একটা লাল পাগড়ী জড়ানো। কাঁধে নানা রকম নক্সা-কাটা মস্ত একটা কাঁথার ঝোলা। গলায়, হাতের মনিবন্ধে বড়ো বড়ো কাঁচের পুঁতির মালা। হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝুল, হলুদ রঙের আলখাল্লার মতো একটা পাঞ্জাবী গায়ে। হাতে একখানা পাকা বাঁশের লাঠি। প্রতিটি গাঁঠে তার রূপোর পাত বাঁধানো। মাথার দিকে ছোবল-মেলা সাপের ফণা। নক্‌শা-করা রূপোর কাজ। কৈলাসের কাছাকাছি এসেই লোকটা হাঁক পাড়ল—'জয় গুরু, জয় গুরু! আমি

আস্‌লাম গো মাতুব্বরদাদা'—

কৈলাস তাড়াতাড়ি হুঁকো ফেলে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে জড়িয়ে ধ'রে বলে—'আরে গগন ভাই যে, কি ভাগ্যি আমার! আসো, আসো, বসো!'—কণ্ঠীরাম তাড়াতাড়ি একখানা জলচৌকি এনে বসতে দেয়।

এদিকে পাড়ায় তখন রটে গেছে, গগন ঢং এসেছে। ছেলেবুড়ো সবাই—'ওরে ঢং আইছে, ঢং আইছে'—ব'লে ছুটে এসে চারিদিকে ভীড় করতে লাগল। অল্প-বয়সী বউ-ঝিরাও ঘোমটার আড়ালে মুখ লুকিয়ে ঘরের কোণে জড় হ'লো তামাসা দেখার লোভে।

গগন জল-চৌকিটার উপর ব'সেই গায়ের হলুদ রঙের আলখাল্লা-পাঞ্জাবীটা খুলে ফেলল। কিন্তু দেখা গেলো, নিচে রয়েছে আর একটা আলখাল্লা। এটার রং লাল। মাথার পাগড়ীটা খুলে গগন কাঁধের ঝোলা থেকে মৌলবীদের মতো একটা ফেজ টুপি বের ক'রে পরল। আশে পাশের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এইসব মজা দেখে হি হি ক'রে হাসতে লাগল। গগনের পোশাক-আশাক, কথাবার্তা, চলাফেরা, অঙ্গভঙ্গী—সব তাতেই এমন একটা বিচিত্র কৌতুকের প্রকাশ ঘটে যে, বড়োরাও না হেসে পারে না। লোকে তাই ওর নাম দিয়েছে—ঢং। গগন ঢং।

জল-চৌকির উপর আয়েস ক'রে ব'সে সামনের নৌকার কাঠামোটার দিকে তাকিয়ে গগন বলে—'পথে আস্‌তি শোনলাম, মাতুব্বরদাদা বাচির নৌকো গড়াচ্ছে। তা ভাবলাম, একবার দর্শন করে যাই। নৌকো জলে ভাসানোর দিন কিন্তু খবর দেওয়া চাই দাদা—!'

কৈলাস হেসে বলে—'খবর তো দেবো রে ভাই। তা তোমার নাগাল পালি তো তোমারে খবর দেবো! তুমি শিব-ঠাউরির চ্যালা। কখন যে কোথায় থাকো!'

কথাটা ঠিক। গগনের নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান নেই। থাকা-খাওয়ারও কোনো স্থিরতা নেই। বাউণ্ডুলের মতো দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। ওর বিচিত্র প্রকৃতির জন্য যেখানেই যায়, চারপাশে লোক জুটে যায়। খাওয়া-দাওয়ারও একটা হিল্লে হয়ে যায়। গগন যে কোন্ জেলার লোক, তা কেউ স্পষ্ট ক'রে জানে না। কেউ বলে যশোর, কেউ বলে খুলনা, কেউ বলে ফরিদপুর। আবার কেউ বলে অন্য কোন্ মুল্লুক থেকে এসেছে। নানারকম জনশ্রুতি ওর নামে চলিত আছে। কেউ বলে গগন নাকি কোনো চাষী বাড়ীরই ছেলে না। উঁচু জাতের, ধনী বাড়ীর ছেলে। কোন্ এক তান্ত্রিক সাধুর অভিশাপে নাকি মা বাবা বউ ছেলে সব হারায়। তারপর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। দেশে দেশে বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ায়। তবে যেমন ওর বিচিত্র প্রকৃতি, তেমনি গুণেরও শেষ নেই। কারো কোনো বিপদ-আপদ দেখলেই সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার গান-বাজনা, নানা রকমের হাতের কাজ—সে সবেও ওর জুড়ি নেই। আবার কেউ বলে—লোকটা আসলে মহা ভণ্ড। রাত্রে রাত্রে গোপনে নাকি সীসে আর রূপো গলিয়ে জাল টাকা তৈরী করে। কতোবার পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। নড়ালের জমিদারবাবুরাও একদিন ওকে কাছারী-বাড়ীতে নিয়ে আটকে রেখেছিলেন। কিন্তু কেউই ওকে শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারে নি। খুলনা বাজারের কোন্ একটা মেয়েমানুষ

নাকি ওর পেছনে লেগেছিল। কিন্তু সে বাঁধনও ওকে বাঁধতে পারে নি। সব দিক দিয়েই একেবারে মুক্ত-পুরুষ গগন।

কৈলাসের কথায় গগনও হাসে। বলে—'তা যা কইছো মাতুব্বর দাদা! মাথায় আমার কি যে একটা ক্যাড়া পোকা আছে, কোথাও দু'দণ্ড তিষ্ঠোতে দেয় না'—এমন সময় চাঁপা একটা কাঁসার থালায় অনেকগুলো ভেজা চিড়ে-মুড়ি গুড় আর নারকেল-কোরা এনে গগনের পাশে দাঁড়িয়ে বলে—'ঢং কাকা, মা এগুলো পাঠায়ে দেছে, তুমি খাও।'

গগন জিজ্ঞাসু চোখে চাঁপার দিকে তাকায়। কৈলাস বলে—'আমার মেয়ে, চাঁপা।'

গগন পরম উৎসাহে থালাখানা টেনে নিয়ে বলে—'বেশ, মা লক্ষ্মী। তা দাদা, মা লক্ষ্মীর এবার একটা সাদী-সম্বন্ধ-লাগাও। কয়দিন একটু হৈ চৈ করি।'—

চাঁপা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। কৈলাস বলে,—'তা দাও না ভাই এট্টা ভালো সম্বন্ধ দেখে শুনে। তুমি তো কতো দ্যাশ-বিদ্যাশ ঘুরে ব্যাড়াও।

চাঁপার পিছন পিছন জলের ঘটি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিল জলধর। জলধরের দিকে চোখ পড়তেই গগন বলে—'এ আবার কোন্ মুরোব্বি? তা চেহারাখানা তো বেশ সা-জোয়ান হইছে দেখতিছি—'

জলধর ঘটি হাতে মুখ গোঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। কৈলাস বলে—'তা কথাখানা তুমি ঠিকই কইছো গগন ভাই। আমাদের জলধরের চেহারাখানা বেশ মন্দ মানুষের মতোই হইছে। জলধরের বাবা তারক দাসের কথা তোমার স্মরণ আছে মনে কয়। সেই যে গাড়ী চাপা পড়ার ঘটনাডা—'

গগন একটুখানি ভুরু কুঁচকে ভাবে। হঠাৎই যেন ওর ঘটনাটা মনে পড়ে যায়। জলধরের বাবা তারক দাসের মৃত্যুটা সত্যিই বড়ো করুণ। প্রায় বছর তিনেক হয়ে গেলো। পাশের গ্রাম মল্লিহাটীর পুলিন রায়ের জমি ভাগে চাষ করত তারক। অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান কেটে চারখানা গোরুর গাড়ীতে ভর্তি ক'রে পুলিনের বাড়ীর খোলেনে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল। সঙ্গে পুলিনও ছিল। যেতে যেতে হঠাৎ একটা গোরুর গাড়ীর চাকা খাদের আঠালো কাদার মধ্যে ডেবে গিয়েছিল। ধান-বোঝাই গাড়ী। তাগ্‌ড়া দুটো বলদেও টেনে তুলতে পারছিল না। তখন পুলিন আর ওর লোকজনের চাপে প'ড়ে তারক কাঁধ লাগায়। হন্দ-জোয়ান তারক। কাঁধ দিয়ে ঠেলে গোরুর গাড়ীর চাকা তুলে দিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ পা পিছলে নিজেই চাকার তলায় পড়ে যায়। বুকের উপর দিয়ে গাড়ীর চাকা চলে যায়। একমাস শয্যাশায়ী হয়ে কি কষ্টটাই না পেয়েছিল। তারপর রক্ত বমি করতে করতে মারা যায়। —ঘটনাটা মনে পড়তে গগনের কৌতুক-প্রসন্ন মুখখানার উপর একটা বিষাদের ছায়া ভেসে যায়। গগন আর কোনো কথা বলে না। মাথা নিচু ক'রে থালার চিড়ে মুড়ি গুড় মেখে খেতে থাকে। খাওয়া দেখলে বোঝা যায়—পেটে অনেকখানি খিদে জ'মে ছিলো।

খাওয়া শেষ হতেই জলধর জলের ঘটি এগিয়ে দেয়। গগন ঢক্ ঢক্ ক'রে সব

জলটুকু খেয়ে নেয়। গগন ঢং-কে চুপ মেরে যেতে দেখে আশেপাশের ভীড়টা হালকা হয়ে যায়।

কৈলাস বলে—'গগন ভাই, আজকের রাতটা এখানেই কাটায়ে যাও।'—
গগন তার সেই হলুদ আলখাল্লাটা আবার গায়ে চড়াতে চড়াতে বলে—'তা হয় না দাদা। ছাতিম-তলার মাঠে শোনলাম কাল গরু-দাবোড় (দৌড়) হবে। সেইডা দেখবো বলেই রওনা হইছি। আজ যতোটা পারি, আগোয়ে থাকতি চাই।'
গগন উঠে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—'আচ্ছা মাতুব্বরদাদা, শোন্‌লাম বৈকুণ্ঠ মুখার্জ্জী বাবুর ছোটোছেলে আ'সে রইছেন তোমার বাড়ী। তা, কই তিনি? একবার পরিচয় করতাম।'

কৈলাস বলে—'হ্যাঁ গগন, ছোটোবাবু এখানেই থাকতিছেন এখন। —এই তো ছেলেন। কোন্ দিকে বোধ হয় বার হইছেন।'—

গগন বলে,—'তবে চলি দাদা আজ, পরের বার আলাপ করব।'

একটু এগিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ায় গগন। জলধরের কাঁধের পরে একটা হাত রেখে বলে—'তোর বাপের যোগ্য ব্যাটা হইছিস তুই, পারিস্‌নে তোর বাপের মরার শোধ নিতি?'

ক্রুদ্ধ একটা বোবা জন্তুর মতো গগনের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই জলধর মাথা নিচু করে।

গগন আর দাঁড়ায় না। হন্ হন্ ক'রে রাস্তায় নেমে আসে। পাড়ার ছোটো ছোটো ছেলেরা আবার তার পিছু নেয়।

সত্যপ্রসাদ বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। সেদিন রাতের অগ্নি-কাণ্ডের সেই দুর্ঘটনার পর দশ বারোদিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়েছিল। কপালের ক্ষতটা এখনো পুরোপুরি শুকোয়নি। শরীরও বেশ দুর্বল। কিন্তু কতো আর শুয়ে ব'সে থাকা যায়। বিকেলের দিকে তাই কাউকে কিছু না ব'লে বেরিয়ে পড়েছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিলেন গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে। সামনেই দিগন্ত-বিস্তৃত বিল। ক্ষেতের সমতলে সবুজের আভা। ফাল্গুন-চৈত্রে বোনা ধান আর পাটের চারাগুলো ফন্‌ফন্ ক'রে মাথা তুলেছে। দূরে দূরে এক একটা গ্রামের সারি। বেলা প'ড়ে এলেও বিলভাসানের ক্ষেত প্রান্তর গ্রামগুলো থেকে এখনো যেন জ্যৈষ্ঠের খর-রোদের ঝিমোনি কাটেনি।

গ্রামের একেবারে শেষ মাথায় ভিটেটার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকালেন সত্যপ্রসাদ। ভিটেটা যেন একটু অন্য ধরনের। এ-অঞ্চলের সব ভিটেগুলোই খুব উঁচু উঁচু। বিল অঞ্চল। বর্ষা-শরৎকালে বন্যার ভয়। এ ভিটেটাও খুব উঁচু। কিন্তু এখানকার অন্যান্য ভিটেগুলোয় সাধারণতঃ যেমন গাছপালা কম, এটায় তা নয়। আম জাম বাঁশ কাঁঠাল খেজুর নারকেল তালগোল পাকিয়ে এ যেন বিশাল একটা সবুজের টুক্‌রো। অবাক হয়ে দেখছিলেন সত্যপ্রসাদ। হঠাৎ সেই গাছপালার ভিতর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলো যতীন। উদ্বেগের গলায় বলল—'আপনি এতোটা হেঁটে এলেন কি ক'রে সত্যদা? শরীর তো আপনার এখনো সুস্থ হয়নি।'—

সত্যপ্রসাদ সে কথায় কান না দিয়ে বললেন,—'এটা তোমাদের বাড়ী?'

যতীন একটু লজ্জায় পড়ল। সত্যপ্রসাদের সঙ্গে এতোদিন আলাপ হয়েছে, দুর্ঘটনার পরদিন থেকে রোজই একবার ক'রে কৈলাস জ্যাঠাদের বাড়ী গিয়ে সত্যপ্রসাদকে দেখে এসেছে, কিন্তু কখনো সত্যপ্রসাদকে তাদের বাড়ীতে আসতে বলেনি।

যতীন সাগ্রহে সত্যপ্রসাদের হাত ধ'রে সাদর আপ্যায়নে বলল—'চলুন।'

ঝকঝকে নিকোনো মাটির বারান্দা। তিন পোতায় তিনখানা ঘর। যতীন তাড়াতাড়ি একটা মাদুর এনে বারান্দায় বিছিয়ে দিলো। সত্যপ্রসাদ বললেন—'বেশ বাড়ীটা তোমাদের। কত গাছ!'—যতীন বলল—'সবই আমার বাবার হাতের কাজ।'

কথার ফাঁকে এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়াল। হাঁটুর উপরে কাপড় পরা। খালি গা। মুখ-ভর্তি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। বছর ষাট বয়সের শান্ত প্রবীণ মানুষটি। যতীনের বাবা—নয়নচাঁদ। নয়নচাঁদ হাত দু'টো জড় ক'রে বিনীত কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে বলল—'পেরণাম হই ছোটোবাবু!'—

নয়নচাঁদের এই বিনীত ভঙ্গীতে সত্যপ্রসাদ তো বটেই, যতীনও যেন একটু অস্বস্তি বোধ করল। সত্যপ্রসাদ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে বলল—'আমাকে আবার প্রণাম কেন!'

নয়নচাঁদ তেমনি বিনীত কণ্ঠে বলে—'কি যে বলেন বাবু! আপনি আমাদের বড়োবাবুর ছেলে—পেরণাম করবো না?'

নয়নচাঁদ অবশ্য সেখানে আর বেশীক্ষণ থাকল না। নয়নচাঁদ চলে যেতেই সত্যপ্রসাদ এবং যতীন যেন আবার স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে এলো।

একটু বাদেই শ্রীময়ী মুখের ফর্সা রঙের একটি বউ পাথরের রেকাবীতে অনেক-গুলো কাটা আমের টুকরো এনে সত্যপ্রসাদের পাশে নামিয়ে রাখল। মাথার ঘোমটাটা সামান্য টেনে দিয়ে হেসে বলল—'এটা আপনাকে খেতে হবে দাদা। আমাদের গাছের আম।'

সত্যপ্রসাদ বউটির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হলেন। বউটি সুন্দরী তো বটেই, কিন্তু সেটাই বড়ো কথা নয়। অহেতুক সঙ্কোচ-জড়তাহীন স্বচ্ছ মন এই বধূটির—যেটা এখানকার এই সব চাষী পরিবারে একান্ত দুর্লভ। কথাবার্তায়-ও শিক্ষার একটু পালিশ লাগানো। বউটির বেশভূষায় দারিদ্র্যের চিহ্ন অবশ্য আছে। কিন্তু তা ছাপিয়ে একটি স্নিগ্ধ লক্ষ্মীশ্রী যেন বিরাজ করছে।

যতীন লাজুক মুখে বলল—'আমার স্ত্রী—সরমা।' —সত্যপ্রসাদ হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলেন। সরমাও একটু হেসে নিঃশব্দে হাত জোড় করল। সরমার সহজ আন্তরিকতাটুকু সত্যপ্রসাদের হৃদয় স্পর্শ করল। সত্যপ্রসাদ বুঝলেন—যতীনের মাধ্যমে সরমার কাছে তাঁর পরিচয় আগেই পৌঁছে গেছে। সরমা এবং যতীনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সত্যপ্রসাদ বললেন—'সবই তো বুঝলাম ভাই, কিন্তু এই অবেলায় এতোটা কি খেতে পারব?'

সরমা স্নিগ্ধ কণ্ঠে একটু জোর দিয়ে বলে—'আপনি খান তো দাদা! কিচ্ছু অসুবিধে হবে না!'

অগত্যা সত্যপ্রসাদ খেতে শুরু করলেন। সরমা সংসারের কাজে রান্নাঘরে চলে গেলো। খেতে খেতে সত্যপ্রসাদ যতীনদের সংসারের অবস্থা, জমি-জায়গা, চাষ-বাসের খবরা-খবর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

যতীন বলল—'চলে যায় কোনোরকমে। আই. এ. পাশ করার পর ক্যাল্‌কাটা কর্পোরেশনে একটা চাকরীর অফার পেয়েছিলাম। কিন্তু বাবার ইচ্ছে না যে, আমি অন্য কোথাও চাকরী করতে যাই। ফলে গাঁয়ের স্কুল আঁকড়েই প'ড়ে আছি। এ অঞ্চলে একটা স্কুল গ'ড়ে তোলারও দরকার আছে, তা বুঝি। আগে প্রাইমারী স্কুল ছিল। বছর তিনেক হ'লো জুনিয়র হাই পর্যন্ত চলছে। চেষ্টা ক'রছি, আস্তে আস্তে হাইস্কুল খোলার। আমার সঙ্গে এই অঞ্চলের আরো কয়েকটি ছেলে আছে, যারা এখানে শিক্ষকতা করছে। ছাত্রদের বেতন থেকে সামান্য কিছু হয়। আর কিছু সরকারী গ্রাণ্ট পাওয়া যায়। যা হয়, শিক্ষকরা সবাই মিলে ভাগ ক'রে নেই। এছাড়া, আমাদের বিঘে তিনেক চাষের জমি আছে। ছোটো ভাইটার লেখাপড়া হ'লো না। ওই-ই চাষ-আবাদের কাজ করে। কোনোমতে চলে যায়।'

হঠাৎ আদুড় গায়ের বছর তিনেকের একটি ছেলে ছুটে এসে পিছন দিক থেকে যতীনের গলা জড়িয়ে ধ'রে দোল খেতে লাগল, আর যতীনের কানের কাছে মুখ রেখে বলতে লাগল—'বাবা—বাবা—'

'ওরে ছাড়্—ছাড়্—' যতীন গলা থেকে ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে কোলে টেনে নেয়। সত্যপ্রসাদকে বলে—'আমার পুত্র। নাম রেখেছি—সব্যসাচী।'

সত্যপ্রসাদ ক্ষুদে শিশুটির কাণ্ড দেখে হাসছিলেন। যতীন ছেলেকে বলল—'বাবা সবু, ইনি একটা জ্যেঠু হন। নোমো করো।'

সবু একেবারে তৈরী ছেলে। সত্যপ্রসাদের পায়ের উপর মাথা রেখে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল। কিছুতেই তাকে আর টেনে তোলা যায় না।—সরমা এসে ওকে তুলে নিয়ে যায়। সত্যপ্রসাদ হেসে কুটিপাটি হন।

বিকেলটা যতীনদের বাড়ীতে এসে ওদের সঙ্গে মিশে বেশ একটা তৃপ্তি পেলেন সত্যপ্রসাদ। শিক্ষার আলো যে কিভাবে মানুষকে পালটে দিতে পারে, যতীনকে দেখে তিনি তা অনুভব করলেন।

সত্যপ্রসাদ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'এবার চলি, যতীন।'

যতীন বলল—'চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

সূর্য ডুবতে এখনো সামান্য কিছু বাকী আছে। কিন্তু গাছ-গাছালির ঝুপ্‌ড়িতে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। মাথার উপর ছাতা-মেলা গাছের ডালপালায় বাসায়-ফেরা পাখীদের রকমারি কিচির-মিচির। উঁচু ভিটের ঢালু রাস্তা দিয়ে নামতে নামতে যতীন বলল—'একটু সাবধানে নামবেন সত্যদা, রাস্তাটা বড্ডো গড়ানে—।'

যতীনের পিছন পিছন একটু অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিলেন সত্যপ্রসাদ। ভিটে ছাড়িয়ে সমতল রাস্তার উপর এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ পাশের একটা ঝাঁকড়া গাছ থেকে কিম্ভূত-কিমাকার একটা লোক ঝুপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ল যতীন আর সত্যপ্রসাদের মাঝখানে। প'ড়েই মুখে বিচিত্র একটা 'হু-ই—' শব্দ ক'রে কোন্‌দিকে যেন ছুটে পালিয়ে গেলো।

ভীষণ চমকে উঠেছিলেন সত্যপ্রসাদ। যতীন একটু অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সত্যপ্রসাদের হাত ধ'রে বলল—'ভয় পাবেন না সত্যদা, ওটা হ'লো ধনু পাগল। এইভাবে লোককে ভয় দেখিয়ে মজা পায়। সবাই ওকে চেনে।'

সত্যপ্রসাদ সত্যিই ভয় পেয়েছিলেন। একটু ধাতস্থ হয়ে হেসে বললেন—'আচ্ছা লোক তো! একেবারে পিলে চম্‌কে দিয়েছে।'

॥ ছয় ॥

জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হতে চলেছে। কিন্তু বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। খানা-খন্দের জল শুকিয়ে মাটি চৌচির হয়ে ফেটে উঠছে। মাঠঘাট ক্ষেত-প্রান্তরে বুখো-শুকো টান ধরেছে। ধানের পাতাগুলো কেমন যেন হল্‌দেটে হয়ে উঠছে। গত সন ফসল ভালো হয়নি। অজন্মা গেছে। এবারও যদি এই অবস্থা দাঁড়ায়, তাহলে কি হবে কে জানে। নিজেরা খাবেই বা কি, আর জমিদার মহাজনের খাজনা-পাতি পাওনা-গণ্ডাই বা মেটাবে কি দিয়ে। আকাশের দিকে তাকায়, আর বিলভাসানের চাষী মানুষগুলোর চোখে-মুখে কালো ছায়া ঘনায়।

দুপুর বেলায় বাঁকপুর গ্রামের মানুষগুলো ভেঙ্গে পড়ল স্কুলের বড়ো পুকুরটার পাশে। কুয়ো-ঘোলানো হবে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে উঁচু বিশাল একটা মাঠ। তার একপাশে খোপে খোপে ভাগ করা লম্বা টানা স্কুল বাড়ী। টিন আর মুলি-বাঁশের তৈরী। বাঁকপুর জুনিয়র হাই স্কুল। স্কুলের সামনেই আদ্যিকালের পুরোনো একটা বিশাল বটগাছ। বটগাছের সামনে বড়ো একটা মজা পুকুর। এই পুকুরের মাটি দিয়েই স্কুল-বাড়ীর উঁচু মাঠটা তৈরী হয়েছিল। নেই নেই ক'রেও পুকুরে এখনো দুই-তিন হাত জল আছে। একদিকটায় কচুরীপানায় ভর্তি। সেই পুকুরটায় এসে সবাই হাম্‌লে পড়ল। যারা দুপুরে ভূঁই-নিড়ানোর কাজে ক্ষেতে গিয়েছিল, তারাও এসে জলে নেমেছে। ছোটো ছোটো ছেলেপিলে, কোনো বাড়ীর বা বউঝিরা—তারা তো আছেই। কারো হাতে হেঁচা, কারো হাতে পোলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলের তাণ্ডব নর্ত্তনে পুকুরের জল ঘুলিয়ে উঠল। জলের উপর ভেসে উঠতে লাগল ট্যাংরা, পুঁটি, খয়রা ইত্যাদি। কই শিঙি মাগুর শোল বোয়ালও প্রচুর। হেঁচা, ঝুড়ি, চালুনী, পোলো—যে যা পারল তাই দিয়ে সেই অপর্য্যাপ্ত মাছ ধরতে লাগল। কচুরী-পানা ভর্তি মজা পুকুরের জল। গা হাত পা চুল্‌কে ফুলে ঢোল হয়ে উঠছে। কিন্তু মাছ ধরার নেশায় কারো এখন আর সেদিকে খেয়াল থাকছে না।

স্কুল দুপুরেই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে মাঝে মাঝেই এ-সময় পুকুর ঘুলিয়ে মাছ ধরা হয়। কিন্তু আজ যেহেতু স্কুলের পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছে, ছেলে-মেয়েদের উৎসাহটা তাই একটু বেশী। বাধ্য হয়েই স্কুল ছুটি দিতে হয়েছে। স্কুল ছুটি দিতেই ছাত্ররাও অনেকে বই খাতা রেখে জলে নেমে পড়েছে। যতীন এবং আরো

দু'জন অল্পবয়সী শিক্ষক বটগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মাছ ধরার তাণ্ডব দেখছিল। হঠাৎ দক্ষিণ পাড়ার দিক থেকে একটি রাখাল ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে বলল—'ও মাস্টেরমশায়, তাড়াতাড়ি চলো। রণপতি তাওই-দের বাড়ী নায়েববাবু আইচে। সকলেরে বান্ধে রাখিচে। আর ছোটোবাবুর সাথে কি রকম ঝগড়া-খানৃ নাগিচে দ্যাখবা চলো।'

যতীন ত্রস্ত হয়ে ওর সঙ্গী দু'জন শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বলল—'চলো তো সবাই দেখে আসি কি ব্যাপার।'

তিনজনে মিলে রণপতিদের বাড়ীর দিকে ছোটা শুরু করল।

দুপুরবেলায় সত্যপ্রসাদ বেরিয়ে ছিলেন। যতীন স্কুল দেখতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ক'দিন ধ'রে যাই যাই ক'রেও যাওয়া হচ্ছে না। আজকে যাওয়া মনস্থ করেই দুপুরে বেরিয়েছিলেন। মাথায় আঘাত লাগার পর থেকে শরীরে একটা অবসাদের ভাব যেন সব সময়েই লেগে থাকে। কিন্তু তার থেকেও একটা মানসিক যন্ত্রণায় বেশী ভুগছেন। উদ্দেশ্যহীন, কর্মহীন দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। কলকাতায় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা'র অফিসে চিঠি লিখেছেন। কিন্তু সেখান থেকেও এখনো কোনো নির্দেশ আসেনি। কৈলাসের বাড়ীর ঠিকানা দিয়েছেন। এখানে চিঠিপত্র পাওয়ার খুব অসুবিধা। পোষ্টাফিস অনেক দূরে। শনি মঙ্গল-বারে বাসুন্দের হাটে ডাক আসে। এদিকের কারো কোনো চিঠি থাকলে হাট-ফেরত লোকেরা হাতে হাতে নিয়ে আসে। কলকাতার 'কৃষকসভা'র অফিস থেকে এখনো কোনো চিঠি না আসায় সর্বদা একটা অস্থিরতায় ভুগছেন সত্যপ্রসাদ।

গ্রামের মধ্য দিয়ে টানা বড়ো রাস্তা। দু'পাশে ছড়ানো-ছিটোনো এক একটা ভিটেবাড়ী। নানারকম ভাবনা-চিন্তায় আবিষ্ট মনে পথ চলছিলেন সত্যপ্রসাদ। হঠাৎ বড়ো-রাস্তাটা থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা একটেরে ভিটের দিকে চোখ পড়তেই নজরটা আটকে গেলো। এতোদূর থেকে চিনতে পারার কথা নয়। কিন্তু ওই চেহারাটা তাঁর এতোই পরিচিত যে চিনতে ভুল হ'লো না। দ্রুতপায়ে আর একটু কাছে এগিয়ে যেতেই সত্যপ্রসাদ বুঝলেন, তাঁর অনুমান যথার্থ। ও'দের বাড়ীর দুর্ধর্ষ পাইক রঘু সিং লাঠি হাতে ভিটের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা যেমন মারামারিতে ওস্তাদ, তেমনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। জমি-জায়গা দখলের দাঙ্গায় কিম্বা প্রজাদের কাছে খাজনা আদায় করতে যাওয়ার সময় নায়েব মশাই রঘু সিংকে ছাড়া এক পাও নড়েন না। সত্যপ্রসাদ ভিটের উপরের ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, উঠোনে আরো কিছু লোক ঘোরাঘুরি করছে। বুঝলেন, তাঁদের নায়েবমশাইয়ের শুভাগমন ঘটেছে এ-বাড়ীতে। রঘুসিং-এর পাশ দিয়ে সত্যপ্রসাদ দ্রুত ভিটেটার উপরে উঠে গেলেন। রঘু তাদের ছোটোবাবুকে হঠাৎ এখানে এই অবস্থায় দেখে খুব অবাক হয়ে গেলো।

উঠোনে পা দিয়েই সত্যপ্রসাদ দেখলেন, দু'পাশে আরো দু'জন পাইক লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ছাঁচেয় দলা পাকিয়ে উবু হয়ে বসে আছে পাঁচ ছয়জন মানুষ। সকলেরই খালি গা। সারা গা হাত পায়ে ধুলো মাটি। দেখলেই

বোঝা যায়, সদ্য ক্ষেতের কাজ ছেড়ে এসেছে। কয়েকজনকে চিনতে পারলেন সত্যপ্রসাদ। দুর্বল বুড়ো মানুষ ব'লেই বোধহয় রণপতির হাতটা বাঁধা হয়নি। কিন্তু আর সকলেরই দু'হাত পিছ-মোড়া দিয়ে বাঁধা। ওদেরই মাথার গামছা খুলে ওদের হাত বাঁধা হয়েছে। এ পাশের লোকটার নাম বোধ হয় পঞ্চানন। বিশাল একটা কালো মোষের মতো চেহারা। কয়েকদিন আগে রাস্তা দিয়ে ওকে যেতে দেখেছিলেন সত্যপ্রসাদ। মাথায় ছিলো দু'মন আড়াই মন ওজনের একটা ধানের বস্তা। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিল, যেন এক আঁটি হাল্‌কা খড় মাথায় নিয়ে হাঁটছে। লোকটার শক্তি দেখে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সত্যপ্রসাদ। কিন্তু সেই লোকটাই এখন হাত-বাঁধা অবস্থায় ভয়ার্ত চোখে উবু হয়ে বসে আছে। ওপাশে দেখলেন,—সেই সরল দামাল ছেলেটা। জলধর। ওরও হাত বাঁধা। চকিতে একবার সত্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়েই ঘাড় গোঁজ করল। এছাড়া, ওদেরই মতো আরো কয়েকটি অপরিচিত মুখ। সব মিলিয়ে একটা নিঃশব্দ, ভীত, অসহায় আত্মসমর্পণ।

সত্যপ্রসাদকে দেখেই রণপতি হাউহাউ ক'রে উঠল—'ও ছোটোবাবু, দেখেন আমাদের কি অবস্থা হইচে।'—

সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা থেকে প্রচণ্ড একটা ধমক এলো—

'চুপ কর্ হারামজাদা,—মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো!' —সত্যপ্রসাদ বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা জলচৌকির উপর বসে আছেন নায়েব মশায়। সত্যপ্রসাদকে দেখে ভূত-দেখার মতোই চমকে উঠলেন—'সতু, তুমি এখানে? আমরা তো জানি, তুমি কলকাতায় চলে গেছো। তা এখানে এই ছোটোলোক চাষা-ভূষোদের সঙ্গে কি করছো? এখানেই থাকো নাকি আজকাল? কি লজ্জার কথা!'—

একটু দম নিয়েই আবার বললেন—'আর বাবা সতু, একি চেহারা হয়েছে তোমার? কপালে ওটা আবার কি হয়েছে—?'

এসব কথা নায়েবমশায়ের নিশ্চয়ই বলার অধিকার আছে। পুরোনো আমলের লোক। প্রায় বাপের বয়সী। জ্ঞান হতেই সত্যপ্রসাদ ওঁকে দেখে আসছেন। ছোটোবেলায় কতোদিন ওঁর কোলে পিঠে চ'ড়ে বেড়িয়েছেন। ভালও বাসতেন খুব। কিন্তু সত্যপ্রসাদ এখন এসব কথার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি বললেন—'নায়েবকাকা, আপনি এদের ছেড়ে দিন।'

নায়েবমশাই এবার সত্যিই বিস্মিত হলেন—'তুমি বলছ কি সতু? এই হারামজাদাগুলো কি হাড়ে বজ্জাত, তা তুমি জানো না! এদের এক একটাকে ধরতে পাইকগুলোর কি কম হয়রানি হয়েছে?'

সত্যপ্রসাদ শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—'তা, এদের অপরাধ?'

নায়েব এবার খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—'অপরাধ? ব্যাটারা পর পর দুই সনের খাজনা দেয়নি। খাজনার সঙ্গে পার্বণী, তহুরি, নজরানা, ঈশ্বরবৃত্তি—এসব মিলিয়ে এক একটার আট দশটাকা বাকী! ব্যাটারা সব আস্ত নবাব এক একটা। দেখা পাওয়াই ভার। এবার খাজনা না দিলে ডিক্রি ক'রে সব জমি নিলামে তুলে

বিক্রি ক'রে দেবো। বজ্জাতগুলোকে কি ক'রে ঠাণ্ডা করতে হয়, তা আমি জানি।'

সত্যপ্রসাদ আগের মতোই শান্তভাবে বললেন—'নায়েবকাকা, আমি বলছি—আপনি ওদের ছেড়ে দিন। আর শুনুন, খাজনা ওরা অবশ্যই দেবে। তবে পার্বণী, তহুরি, নজরানা—এই সব বাজে আদায়, এগুলোর টাকা আপনাকে ছাড়তে হবে। গত বছর ওদের ফসল ভালো হয়নি। এ-বছর ফসল তুলে অবশ্যই ওরা ওদের জমির প্রাপ্য খাজনা মিটিয়ে দেবে।'

নায়েবমশাই একেবারে তাজ্জব ব'নে গেলেন। ছেলেটা বরাবরই একটু ক্ষ্যাপা, তা তিনি জানেন। কিন্তু তাই ব'লে এতোটা! তবু মুখে একটু হাসি বজায় রেখেই সত্যপ্রসাদকে বললেন—'তুমি কি পাগল হ'লে নাকি সতু? এসব কি আজেবাজে কথা বলছ?'—তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বললেন—'তাছাড়া, আশকারা দিয়ে এইসব ছোটোলোকদের একবার মাথায় তুললে তার পরিণাম কি হবে ভেবে দেখেছো?'

সত্যপ্রসাদ বললেন—'আমার যা ভাবার, তা আমি ভেবেই বলেছি।—আপনি ওদের ছেড়ে দিন। আর ভবিষ্যতে আপনি খাজনার বাইরে এক পয়সাও নিতে পারবেন না।'

নায়েবমশায়ের কণ্ঠস্বর এবার চড়ল—'দ্যাখো সতু, আমি তোমার বাঁবার মাইনে-করা কর্মচারী। আমাকে কি করতে হবে, আর কি করতে হবে না,—সেটা তোমার বাবাই ভালো বুঝবেন।'

—'আপনি তাহলে ওদের ছাড়বেন না?'—সত্যপ্রসাদের কণ্ঠে চাপা গর্জন উঠল।

নায়েবমশায় সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—'না, সেটা সম্ভব নয়।'

হঠাৎ দেখা গেলো, ভিটের নিচের রাস্তা দিয়ে যতীন এবং আরো কয়েকজন লোক ছুটতে ছুটতে এদিকেই আসছে। রাখাল ছেলেটা দৌড়ে গিয়ে তাদের খবর দিয়েছিল।

সত্যপ্রসাদ দৃঢ় অবিচলিত কণ্ঠে বললেন—'ঠিক আছে, আপনি না ছাড়েন, আমিই ওদের ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার যা বলার থাকে, বাড়ীতে গিয়ে বাবাকেই বলবেন।'

সত্যপ্রসাদ এগিয়ে গিয়ে একে একে সকলের হাতের বাঁধন খুলে দিলেন। লোকগুলো বিহ্বল হয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। সত্যপ্রসাদ বললেন—'বাড়ী চলে যাও সব।'

পাইক দু'টো বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে রইল। ছোটোবাবুর কাজের বিরুদ্ধে তারা কীই বা করতে পারে। নায়েবমশায় শুধু চাপা আক্রোশে বললেন—'এর জবাবদিহি তোমাকে তোমার বাবার কাছেই করতে হবে সতু।'

এমন সময় যতীন এবং তার দলবল এসে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে যতীন জিজ্ঞাসা করল—'কি হয়েছে সত্যদা?'

সত্যপ্রসাদ কোনো জবাব দিলেন না। সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিঃশব্দে রাস্তায় নেমে এলেন।

আরো ছয় সাত দিন কেটে গেলো। মাঝখানে দু'দিন প্রচণ্ড বর্ষণ হ'লো। আষাঢ়ে-ঢল এখনো নামেনি। কিন্তু এই দু'দিনে যা জল নামল, তারও পরিমাণ কম নয়। খাল-বিল খানা-খন্দ পুকুর-ডোবায় অনেকখানি ক'রে জল জমল। সকাল-সন্ধ্যেয় কোলা-ব্যাঙের ডাকে চারিদিক উচ্চকিত হয়ে উঠল। বৃষ্টি-ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধে বাতাস হয়ে উঠল মন্থর। চাষীদের কাজও খুব বেড়ে গেলো। আউশ আর আমন ধানের ঝিম-মারা গাছগুলো আর পাটের ন্যাতানো ডগাগুলো দু'দিনের অঝোর বর্ষণের ছোঁয়ায় সতেজ সবল হয়ে উঠল। বিলের একেবারে নিচের জলা জমিগুলোতে বোরো ধানের গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ দেখা দিলো। বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে ধান আর পাট গাছের যেমন শ্রীবৃদ্ধি ঘটল, তেমনি তাদের চারপাশে নানা ঘাস-জঙ্গল আর আগাছারও উপদ্রব ঘটল সমান তালে। সেগুলো নিড়ান-বাছাইয়ের কাজে বিলভাসানের চাষীদের এখন হিমশিম খেতে হচ্ছে। যে সব ধনী চাষী নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ করে, তারা এখন তাড়াতাড়ি কাজ তুলবার জন্য জন-মজুর কিনে কাজ করাচ্ছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 'গাতা' বা দল বেঁধে কাজ হচ্ছে। ছয়-সাত জনের এক একটা দল। পর্যায়ক্রমে এক একজনের ক্ষেতে কাজ হয়।

বিলের ভিতর দিকে একটা ক্ষেতে এই রকম একটা দল কাজ করছিল। জলধরও আছে এই দলে। দলের মধ্যে ওই-ই সকলের চেয়ে বয়সে ছোটো। কিন্তু বয়স কম ব'লে ঘরে ব'সে থাকলে কে আর ভাতের দলা মুখে তুলে দেবে। বিধবা মা, ছোটো ছোটো আরো তিন চারটে ভাইবোন। এতোগুলো লোকের মুখে অন্ন দিতে হবে। মাথার উপর বাপ নেই। সংসারের দায়-দায়িত্ব তাই এখন জলধরের উপর। নিজেদের জমি আছে বিঘে দুই। এছাড়াও পাশের মল্লিহাটি গ্রামের জোতদার পুলিন রায়ের দুই বিঘে জমি বর্গাচাষ করে। দলের সকলেরই প্রায় কমবেশী এই অবস্থা।

জলকাদার মধ্যে ব'সে কাজ করা। বেশ পরিশ্রমের কাজ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানারকম গল্প-গুজব চলে। হাসি-মস্করা খিস্তি-খেউড়—সব রকমই তাতে আছে। আবার সুখ-দুঃখের কথাও হয়। তবে আজকাল বিলক্ষেতে যেখানে যে গল্পই হোক না কেন, সত্যপ্রসাদের নায়েব-তাড়ানোর গল্পটা একবার উঠবেই। লোকের মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে ঘটনাটা এখন নানা আকার নিয়েছে। সারা বিলভাসানের চাষীদের ঘরে ঘরে এখন সেগুলো বিশেষ আলোচ্য বিষয়। জমিদার বৈকুণ্ঠ মুখার্জীবাবুর অমন ডাকসাইটে নায়েবকে থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে বিল-ভাসানের গাঁ থেকে উঠে যেতে হয়েছে, এরকম ঘটনা তো সচরাচর এসব অঞ্চলে ঘটে না।

জলধরদের 'গাতা'র দলটাতেও এ-কথা সে-কথার পর ঘুরে-ফিরে ঐ গল্পটাই এসে হাজির হ'লো। জলধর তড়বড় ক'রে ব'লে উঠল—'নায়েব সুম্মুন্দিরে সত্যদা সেদিন যে দাব্‌ড়ানি দিয়ে দেছে, তাতে মনে কয় না যে আর ছয় মাসের মধ্যি এ দিকি পাড়া দেবে।—ইচ্ছে যা করতিছিল না সেদিন,—যে উঠে গিয়ে ক্যাঁৎ ক'রে এক নাথি লাগাই সুম্মুন্দির পাছায়।'

সেদিন সেই দলে ছিল জগেনও। সে ওপাশ থেকে ফোঁস ক'রে ব'লে ওঠে—'এখন তো খুব তড়্পাচ্ছিস্। সেদিন তো বান্ধে নিয়ে গেলি মুখখান সু'ই ফু'ড়োয়ে আটকায়ে থুইছিলি। একবার ঘেটিডাও (ঘাড়) তো তুলিস্নি।'

জলধর বলে—'কি যে তুমি কও জগেনদা। ঘেটি তুলে মরি আর কি। পাইক-ব্যাটার কোঁতকা-খান দেখিছিলে। কায়দা-মতন পড়লি ঘেটির হাড় আর জাগায় থাকতো না। আর নায়েববাবুর মুখির দিকি তাকালিই তো আমার পরাণ খাঁচা ছাড়া হয়ে যায়। কি গেরমাই রে বাবা!—পলাতি পারলি বাঁচি!'

জলধরের কথায় সকলে হাসতে গিয়েও হাসতে পারে না। গলাটা কেমন যেন আটকে আসে।

হরবিলাস সকলের থেকে একটু বয়স্ক। ঘাসের গোড়া তুলতে তুলতে সে বলে—'পলায়ে কোথায় যাবি বল্? পলানির কি কোনো জায়গা আছেরে? চারিদিকে সব ফাঁদ পাতা রইছে। যেদিক যাবি, ফাঁদে আটকায়ে যাবি। বৈকুণ্ঠ-বাবুর নায়েব তো দূরির মানুষ। আমাদের গ্রামের শগুন-গুলোই কি কম নাকি? আমাদের হাড়-মাংস চিবোয়ে খাতি শিয়েল-শগুন কেউ কম যায় না।'

জলধরের আঙুলের ফাঁকে একটা পানি-জোঁক লেগেছিল। কাস্তের ডগা দিয়ে জোঁকটাকে ছাড়িয়ে ফেলে জলধর বলল—'তুমি ঠিক কথা কইছো হরবিলেস মামা। এই দ্যাখো না, মল্লিহাটির পুলিন রায়ের দুই বিঘে জমি আমি গত সন বর্গায় চাষ করিলাম। বাবা নেই। আমি কি বুঝিডা কও? ধার-কজ্জো ক'রে বীজধান কিনে জমিডা চাষ করলাম। ধানও হইছিলো ভালোমতন। তা, হয়ে হলোডা কি কও? সব ধান কা'টে নিয়ে তুলতি হলো পুলিন রায়ের খোলেনে। ভাগের ভাগ অদ্ধেক তো নেলোই, তারপরেও কয়,—খোলেন-ঝাড়ানি, পার্বণি, গদি-সেলামী, ছেলেপড়ানী, কয়ালি—এইরকম কি সব হাবি-জাবির জন্যিও নাকি ধান দিতি হবে। একটু কেবল ক'তি গি'লাম, অমনি পুলিন জোতদার দাব্ড়ানি দিয়ে কয়—সকোলে দেয়, তুই দিবিনা ক্যানো?—এডাই নাকি বর্গা চাষের নিয়ম। নিজের লাঙল-গরু দিয়ে, বীজধান কিনে, এতো খা'টে-খুটে ধান ফলালাম, তার প্রায় সবডাই তো নিয়ে গেলো।—বললি বিশ্বেস করবা না হরবিলেস মামা, সব হিসেব-কিতেব মিটেয়ে পুলিন রায় আমারে মোটে চার ধামা ধান দেলো। কিছু ক'তি গেলিই কয়—এইডেই নিয়ম।'

হরবিলাস উদাস গলায় বলে—'তাইতো কইরে জলধর। যতই তড়পাস্ আর তেড়িবেড়ি করিসনে ক্যানো, ওদের ওই নিয়মের ফাঁদ কাটায়ে কোনো দিকিই যাতি পারবি না।'

ওপাশে কাজ করছিল রামপদ। মাঝামাঝি বয়স। কিন্তু বয়সের তুলনায় একটু ভার-গম্ভীর। কথা বলার আগে একবার গলা খাঁকরায়। ওটা ওর বদ-অভ্যাস। গলা খাঁকরে রামপদ বলে—'তোমাদের কথাতো সব শোনলাম। কিন্তু সারা জীবন কপাল চাপ্ড়ায়ে কি ফলডা হবে কও?' —সকলে চুপ ক'রে থাকে। এ-কথার উত্তর কারো জানা নেই। রামপদ আবার বলে—'যদি কারো না কও তো তোমাদের এট্টা কথা কই—!'

রামপদর কথা শুনবার জন্য সকলে উৎকর্ণ হয়।

রামপদ বলে—'কয়দিন আগে আমার মামাতো ভগ্নীপতি আইছিলো। নড়ালের হাটের ওইপাশে ওদের বাড়ী। ও অঞ্চলের চাষাদের অবস্থাও আমাদেরই মতন। তার পরে, ওদিকি হইছিলো আর এক জ্বালা। কোনো জিনিস যদি হাটে বেচতি নিয়ে যাও, তার জন্যি হাট-তোলা দিতি হবে। জমিদারের পেয়াদা আ'সে যার কাছে যা পাবে, ছোঁৎ ক'রে তুলে নিয়ে যাবে। অতিষ্ঠ হয়ে সকলে করিছে কি জানো? রাতির অন্ধকারে পেয়াদারে বাঁশ দিয়ে পিটোয়ে মা'রে চিত্রা নদীর জলে ভাসায়ে দেছে। খুব ধর-পাকড় চলতিছে এখন। আমার ভগ্নীপতির ভাব দেখে মনে হলো, য্যানো এট্টু গা-ঢাকা দিয়ে ব্যাড়াচ্ছে। তবে, ওই পেয়াদা খুন হবার পর থেকেই নাকি হাট-তোলা বন্ধ হয়ে গেছে।'

জলধর ফস্ ক'রে ব'লে ওঠে—'ঠিক কথাখান কইছো তুমি। লাঠি না ধরলি আমাদেরও আর বাঁচার পথ নেই।'

জলধরের অতি উৎসাহে হরবিলাস হেসে উঠে বলে—'তুই থাম্ দেখি ছ্যামড়া! তোর খালি মুখি-মুখি লম্বা কথা। লাঠি অমনি ধরলিই হলো—তাই না? একি তোর ঢালি-পাকের খেলা? লাঠি ঘুরোয়ে দুই পাক মা'রে আসলি, আর অমনি তোর গলায় মেডেল ঝুলোয়ে দেলো! লাঠি কি ওদের কিছু কম আছে ভাবিস?'

কিন্তু জলধরের মধ্যেকার একটা ভীষণ জ্বালা যেন ওকে উত্তেজিত ক'রে তোলে। গগন ঢংয়ের সেই কথাগুলো ওর মনের মধ্যে বেজে উঠল। সে কি পারে না—তার বাপের মৃত্যুর শোধ নিতে?—জ্বালা-ধরা গলায় জলধর চীৎকার ক'রে ওঠে—

'ওদেরও লাঠি আছে তা জানি। কিন্তু কয়খান লাঠি আছে ওদের? আমরা যদি সবাই একজোট হই? তা হলি? তাহলি কি পারবে ওরা আমাদের সাথে?'

তিন চার জন সমস্বরে ব'লে ওঠে—'ঠিক কথা, ঠিক কথা কইছে জলা! আমাদের একজোট হতি হবে!'

রামপদ আবার গলা খাঁকরায়। বলে—'এসব মাথা গরম করার কাজ না। কোন্ দিক দিয়ে কোন্ কথা কার কানে যাবে, তখন সব্বোনাশের মাথায় বাড়ি। তা, আমি এট্টা কথা কই শোনো! একদিন চলো সবাই, সত্যদাদাবাবুর কাছে যাইয়ে সব বাত্তা নেই। কতো ল্যাখাপড়া জানা মানুষ। কলকাতায় থাকে। খবরের কাগজ পড়ে। কতো জানে শোনে। আর দ্যাখো, বৈকুণ্ঠবাবুর ছেলে হ'লি কি হয়, আমাদের পরে খুব দরদ নিয়ে চলে। সত্যদাদাবাবুর কাছে বাত্তা নিলিই সব জানা যাতি পারে।'

এর পর সবাই নিঃশব্দে কাজ ক'রে যায়। কিন্তু কী একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা যেন সেই নিঃশব্দ পাথর-চাপা বুকের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

॥ সাত ॥

নিষ্কর্মা উদ্দেশ্যহীন দিনগুলো ক্রমেই সত্যপ্রসাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠতে

লাগল। কোনো কিছু না ভেবেই ঝোঁকের মাথায় বিলভাসানে চলে এসেছিলেন। তারপরে একমাস কেটে গেলো। নিজের মাথায় কোনো পরিকল্পনা আসছে না। 'কৃষকসভা'র তরফ থেকেও কোনো নির্দেশ পাচ্ছেন না। এ অবস্থায় মানসিক অস্থিরতা বাড়াই স্বাভাবিক। এর মধ্যে ঘটে গেলো সেদিনের ঐ ঘটনাটা। প্রজাদের সামনে নায়েবকাকাকে এইভাবে অপমানিত করাটা ঠিক হ'লো কিনা কে জানে! তবে ব্যাপারটা যে একটু নাটকীয় হয়ে গেলো, তা ঠিক। কিন্তু এ ছাড়া সত্যপ্রসাদের আর কী-ই বা করার ছিল! অকারণে নিরীহ মানুষগুলোর উপরে এই পীড়ন—চোখের সামনে দেখে এ-তো মুখ বুজে সহ্য করা যায় না।

একটা উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির মানসিক অবস্থা নিয়ে সত্যপ্রসাদ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। দুপুরবেলা। প্রথম আষাঢ়ের নির্মেঘ আকাশ। ঝাঁঝালো রোদ ছড়িয়েছে চারিদিকে। সেই রোদের মধ্যে খানিকক্ষণ এলোমেলো ঘুরে বেড়ালেন সত্যপ্রসাদ। ঘুরতে ঘুরতে স্থির করলেন, যতীনের সঙ্গে দেখা করবেন। চুপচাপ না ব'সে থেকে ওদের স্কুলে দু'একটা ক্লাশ নিলে ক্ষতি কি? খানিকটা সময় তো কাটবে। একথা ভেবেই সত্যপ্রসাদ স্কুল বাড়ীটার দিকে রওনা দিলেন।

খানিকদূর যাবার পর রাস্তার বাঁপাশে একটা পুকুর পড়ল। পুকুরটার লাগোয়া কোনো বাড়ীঘর নেই। শুধু দক্ষিণ পাশে সামান্য দূরে একটা ভিটে বাড়ী। পুকুরের এপাশের পাড়ে অনেকগুলো জাম আর বাবলা গাছ। সুন্দর ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে। রোদের তাপে শরীর মাথা জ্বালা করছিল। সত্যপ্রসাদ এগিয়ে জামগাছের ছায়ার নিচে দাঁড়ালেন। বেশ খানিকটা নিচে পুকুরের জল। স্বচ্ছ পরিষ্কার জলে রোদ প'ড়ে চিক্‌চিক্ করছে। এপাশের পাড়ে জলের কাছ ঘেঁষে কয়েকখানা কাটা তালগাছের গুঁড়ি। বাঁশ দিয়ে আটকে ঘাট বানানো হয়েছে। সত্যপ্রসাদ চুপচাপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। নির্জন নিস্তব্ধ পরিবেশ। শুধু মাথার পরে জামগাছের কোন্ ডালে ব'সে একটা ঘুঘু পাখি ঘু-ঘু ঘু-ঘু ক'রে একমনে ডেকে চলেছে।

তালগাছের গুঁড়ির ঘাট্‌লার পাশে জলের দিকে তাকিয়ে সত্যপ্রসাদের মনে হঠাৎ কেমন একটা সন্দেহ দেখা দিলো। একগোছা দীর্ঘ কালো চুল যেন জলের মধ্যে ভাসছে। চারপাশের জলটা একটু ঘোলা ঘোলা। কিন্তু তারই মধ্যে জলের কিছুটা নিচে যেন অস্পষ্ট একটা অবয়বের আভাস। সত্যপ্রসাদ দ্রুত ঘাটে নেমে এলেন। তালগাছের একেবারে নিচের গুঁড়িখানার উপর দাঁড়ালেন। গুঁড়িখানা খুব পিছল। পা পিছলে প'ড়ে যাবার ভয় প্রতি মুহূর্তে। তবু সাবধানে দাঁড়িয়ে ভালো ক'রে নিচের দিকে তাকালেন। এবার আর সন্দেহের কারণ নেই। জলের নিচে একটা মানুষ। লম্বা চুল দেখে বুঝলেন, মেয়েমানুষ। এইটুকু জলে একটা বড়ো মানুষের পক্ষে ডুবে যাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষতঃ, এই বিল অঞ্চলের মানুষেরা জলের সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত। হাঁটা-চলা শেখার সঙ্গে সঙ্গেই সাঁতারটাও শিখে ফেলে। কিন্তু আপাততঃ তাঁর চোখের সামনে হাত দুই আড়াই জলের নিচে যে আস্ত একটা মেয়েমানুষ ডুবে রয়েছে, এটা ঐ জলের মতোই তাঁর কাছে এখন পরিষ্কার হয়ে গেলো। কিন্তু কি করবেন এখন সত্যপ্রসাদ? আশেপাশে কেউ

নেই। কাকেই বা ডাকবেন। প্রতিটি মুহূর্তই এখন ঐ জলে-ডোবা মানুষটির পক্ষে মূল্যবান। এমনিতেই বেঁচে আছে কি মরে গেছে, বোঝা যাচ্ছে না। নিমেষেই মন স্থির ক'রে ফেললেন সত্যপ্রসাদ। পরনের ধুতিটা কোমরের দিকে একটু গুটিয়েই ঝপ্ ক'রে নেমে পড়লেন জলে। তলতলে পাঁকের পরে পা পড়তেই প্রায় কোমর সমান জলে ডুবে গেলো। হাত বাড়িয়ে জলের নিচের দেহটি স্পর্শ করলেন। তারপর সবলে সেই দেহটি ধ'রে উপর দিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এবং নিজের শক্তির দীনতা টের পেলেন। কিন্তু এ অবস্থায় পিছিয়ে আসাও তো সম্ভব নয়। জলের নিচে হাতড়ে হাতড়ে শরীরের সামনের দিকটা আবিষ্কার করলেন। ডুবন্ত দেহটার দুই বাহুমূলের নিচে দিয়ে হাত গলিয়ে সজোরে দেহটাকে সাপ্টে ধরলেন।—তারপর কয়েক মিনিটের অমানুষিক পরিশ্রমে অসাধ্য কাজটা সম্ভব করলেন। জল কাদায় মাথামাখি হয়ে দেহটাকে টেনে তুললেন পুকুরের কূলের নরম মাটির উপরে। জলের মধ্যে দাঁড়িয়েও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। রীতিমত হাঁপাচ্ছিলেন সত্যপ্রসাদ। সদ্য টেনে তোলা দেহটার উপর নজর পড়ল। মুহূর্তকাল পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন সত্যপ্রসাদ। নিম্নাঙ্গে শাড়ীটা এলোমেলো ভাবে জড়ানো। কিন্তু শরীরের ঊর্ধ্ব-ভাগ সম্পূর্ণ অনাবৃত। চাষীবাড়ীর পরিশ্রমী চেহারার ভরাট পুষ্ট যৌবনের একটি মেয়ে। এইসব চাষীবাড়ীর মেয়ে-বউদের মধ্যে ব্লাউজ পরার প্রচলন কম। নিতান্তই বাইরে কোথাও যেতে হ'লে সেমিজ বা ব্লাউজ পরে। অচেতন যুবতী-দেহের নিরাবরণ ঊর্ধ্বাঙ্গের দিকে এক নিমেষ তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন সত্যপ্রসাদ। কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। হাত পা শিথিল হয়ে আসছে। কিন্তু নিমেষেই সত্যপ্রসাদ সব দ্বিধা সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। মেয়েটির কোমরের ভিজে আঁচল টেনে তুলে বুকটা ঢেকে দিলেন। জলে ডোবা রোগীর শুশ্রূষার যে পুঁথিগত প্রাথমিক জ্ঞানটুকু ছিলো, সেটাকে কাজে লাগালেন সত্যপ্রসাদ। মেয়েটার হাত দুটোকে ঘুরিয়ে এনে কয়েকবার পেটের উপর চাপ দিতেই নাক দিয়ে খানিকটা জল আর গাঁজলা মতো বেরিয়ে গেলো। মনে হ'লো, এবার যেন খুব ধীরে ধীরে একটু শ্বাস বইছে। কিন্তু জ্ঞান ফেরার কোনো লক্ষণ নেই। মেয়েটার ঠোঁট দুটো ফাঁক ক'রে দাঁত স্পর্শ করলেন সত্যপ্রসাদ। দাঁতে দাঁতে শক্ত হয়ে আটকে রয়েছে। অর্থাৎ—মৃগীরোগ। এইটুকু জলে মেয়েটার ডুবে-যাওয়ার কারণ এবার বোঝা গেলো।

সত্যপ্রসাদ দ্রুতপায়ে উপরে উঠে এলেন। পুকুরের অন্য পাড়ে আসতেই দেখলেন—গাছের নিচে এক থুত্থুরে বুড়ী শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে জড় ক'রে ঝুড়িতে তুলছে। জ্বালানি হবে। সত্যপ্রসাদের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই বুড়ী ঝাঁটা ঝুড়ি ফেলে দিলো। মুখখানা যথাসম্ভব আঁচল দিয়ে আবৃত ক'রে নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে রইল। 'বাবুলোক' দেখে লজ্জা লেগেছে আর কি! এর মধ্যেও হেসে ফেললেন সত্যপ্রসাদ। বুড়ীর আর একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—'শোনো বুড়ীমা, তোমাদের একটা মেয়ে পুকুরের ঐ পাশে জলে ডুবেছে।'

বলতেই ঝট্ ক'রে বুড়ীর মুখের কাপড়টা স'রে গেলো। ভাঙা-চোরা তোবড়ানো মুখের ঘোলা ঘোলা চোখ দুটো মেলে সত্যপ্রসাদের জলকাদামাখা চেহারার দিকে

একবার তাকাল। তারপর নিমেষেই উল্টোমুখো হয়ে কুঁজো বুড়ীটা উর্ধ্বশ্বাসে ছোটা শুরু করল। সত্যপ্রসাদ ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলেন না। এখন কী করবেন স্থির করতে একটু সময় লাগল। একটু বাদেই দেখলেন, মেয়ে-পুরুষ মিলে পাঁচ ছয় জন লোক উত্তেজিতভাবে ছুটে আসছে। বুড়ীর পালিয়ে যাবার কারণটা বোঝা গেলো। ছুটে গিয়ে বাড়ীর লোকজনকে খবর দিয়েছে। লোক-গুলো দৌড়ে এসে সত্যপ্রসাদের ক্লান্ত অবিনাস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সত্যপ্রসাদ কোনো কথা না ব'লে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। তারপর আস্তে আস্তে পুকুরের পাড় ছেড়ে নেমে এলেন।

লোকগুলো পড়ি-মরি ক'রে ছুটল। রাস্তায় এসেই সত্যপ্রসাদ দ্রুত পা চালা-লেন। চেহারার যা অবস্থা হয়েছে, তাতে কেউ দেখলে লজ্জায় পড়তে হবে। কৈলাসের বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই দেখলেন, যা ভেবেছিলেন, তাই সত্যি হ'লো। রাস্তার উল্টোমুখ থেকে আসছে যতীন। সত্যপ্রসাদের মুখোমুখি হয়ে বিস্মিত যতীন বললন—'কি ব্যাপার সত্যদা? কাপড়-চোপড়ের এ-অবস্থা হ'লো কি ক'রে?'

সত্যপ্রসাদ বললেন—'তোমাদের এখানে এসে একটার পর একটা যা সব অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তাতে আর সামলে উঠতে পারছি না!'—তারপর একটু হেসে বললেন—'আগে চলো কাপড়টা ছাড়ি। তারপর সব বলব।'

কৈলাসের বাড়ীতে সত্যপ্রসাদ ও'র আস্তানায় যতীনকে বসিয়ে কাপড় ছাড়তে গেলেন। ওদিকে মিস্ত্রীদের কাজ চলছে। কিন্তু কৈলাস বা তার দুই ছেলের কেউ বাড়ী আছে ব'লে মনে হ'লো না। বাড়ীর মেয়েরাও সব ভিতর বাড়ীতে। সত্যপ্রসাদ যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কাপড়-চোপড় ছেড়ে একটা লুঙ্গি প'রে সত্যপ্রসাদ এসে যতীনের পাশে বসলেন। যতীন উৎসুক চোখে সত্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকাল। সত্যপ্রসাদ সমস্ত ঘটনাটা যতীনকে ব'লে গেলেন। যতীন একটু চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করল—'কোন্ বাড়ীটা বলুন তো?'

সত্যপ্রসাদ মোটামুটি বাড়ীর অবস্থানটা বলতেই যতীন গম্ভীর হয়ে গেলো। আস্তে আস্তে বলল—'বুঝেছি। হতভাগী সৌরভী ছাড়া ও আর কেউ নয়। লক্ষী-ছাড়ীটা গ্রামসুদ্ধ সকলকে জ্বালাচ্ছে, আপনাকেও দেখছি আজ বেশ ভোগালো।' সত্যপ্রসাদ বললেন—'কি ব্যাপার বলোতো?'

যতীন একটু ম্লান হেসে বলল—'মেয়েটা আমাদের গ্রামের একটা প্রব্লেম উম্যান আর কি!'

আসলে, সৌরভীর মতো মেয়ে এখানকার প্রত্যেক গ্রামেই দু'চারটে ক'রে আছে। অল্প বয়সে বিয়ে-থা হয়। শ্বশুরবাড়ী স্বামীর ঘর করতে যায়। সেখানে শ্বশুর-শাশুড়ী বা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়। তারপর শ্বশুর-বাড়ীর লোকেরা বউয়ের অবাধ্যতার ছুতো ধ'রে তাকে জোর ক'রে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। ছেলের হয়ত তারা আবার বিয়েও দেয়। তখন আগের বউটার বাপ-ভাইয়ের সংসারে গলগ্রহ হয়ে প'ড়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। কোনো কোনো

ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, কিছুদিনের মধ্যেই সব গোলমাল মিটে যায়। অবাধ্য বউ বাধ্য হয়ে ঘোমটার আড়ালে সোনামুখ ক'রে শ্বশুরবাড়ী ফিরে যায়। তারপর স্বামীর সোহাগে বছর বছর ছেলের মা হয়। ছেলে বড়ো হ'লে ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনে। তারপর নিজেই আর এক দজ্জাল শাশুড়ী হয়ে ওঠে। এগুলো এখানকার চক্রাকারে ঘটা ঘটনা। তবে সৌরভীর ব্যাপারটা একটু আলাদা। চার ভাইয়ের এক বোন। মাথার পরে বাবাও বেঁচে আছে। কিন্তু সৌরভীর বিয়ে দিতে একটু দেরি হয়েছিল। গরীবের সংসার। যোগাড়-গোছাড় ক'রে বিয়ে দিতে একটু সময় লেগেছিল। পনেরো-ষোলো বছর বয়সেই সৌরভীকে কুড়ি বাইশের ভরা যুবতী ব'লে মনে হতো। ওর বাপ-ভাইরা এখান থেকে মাইল পাঁচ ছয় উত্তরে ধল্‌তিতে গ্রামে ওর বিয়েও দিয়েছিল। খুব হাসি-হাসি মুখ নিয়ে সৌরভী স্বামীর ঘর করতে গিয়েছিল। কিন্তু মাস ছয়েক বাদে একদিন রাত্রিবেলায় একা একা পালিয়ে চ'লে আসে। বাপ-ভাইরা ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারে না। ওর মেজ দাদাটা আবার বেদম গোঁয়ার। হা'লো-লাঠিখানা দিয়ে সৌরভীর পিঠের পরে বেশ কয়েক ঘা মেরে বলেছিল—'শউরবাড়ী থেকে ক্যানো চ'লে আস্‌লি—তোকে বল্‌তি হবে।'—কিন্তু সৌরভী কোনো জবাব দেয়নি। ওর মেজদা ক্ষেপে গিয়ে ওর পিঠের উপর সপাটে আরো কয়েক ঘা চালায়। সৌরভী তখন একটানে লাঠিখানা কেড়ে নিয়ে ফু'সে উঠে বলেছিল—'তোরা আমার বিয়ে দিছিস্, না ছাই দিছিস্! ওডা কি এট্টা পুষ্যে মানুষ (পুরুষমানুষ), যে ওর ঘর আমি করবো!'—সৌরভীর তিন তিনটে বড়ো ভাই, কী বুঝল কে জানে! কিন্তু সেই থেকে সৌরভীকে আর তারা স্বামীর ঘর করতে যেতে বলত না। অতৃপ্ত-যৌবনা মেয়েটা বাপ-ভাইয়ের সংসারে চার পাঁচ বছর ধ'রে মুখ গু'জড়ে প'ড়ে আছে। সৌরভীর মুখে কিছু আটকায় না। ওর মুখের ভয়ে মা বাবা দাদা বৌদিরা কিছু বলতে সাহস করে না। স্বেচ্ছাচারিণীর মতো পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। আর পাড়ার লোকের অভিশাপ, গালমন্দ কুড়োয়। আবার কারো বাড়ীর কোনো কাজে-কর্মে বিপদে-আপদে ডাকলে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করে। সম্প্রতি মৃগীরোগ ধরেছে। কথায় কথায় যখন তখন ফিট হয়ে যায়। আর এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওর বেলেল্লা-পনাও যেন বাড়ছে।

এসব কথা বলতে বলতে যতীন বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল—'এই দেখুন, কথায় কথায় কাজের কথাটাই ভুলে গেছিলাম। অথচ এর জন্যই আমার এখন স্কুল থেকে ছুটে আসা।'

যতীন পকেট থেকে দু'খানা চিঠি বের করল। দু'খানাই খাম। একখানায় পোষ্টাফিসের ছাপ মারা। আর একখানা সাধারণ। সত্যপ্রসাদ হাত বাড়িয়ে চিঠি দু'টো নিলেন। হাতের লেখা দেখে মনে হচ্ছে, একখানা মা-র চিঠি। পোষ্টাফিসের ছাপমারা চিঠিখানা দেখে মনে হচ্ছে, কলকাতার চিঠি। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা'র অফিস থেকে পাঠানো হয়েছে। পরে পড়বেন ব'লে চিঠিখানা সাবধানে সরিয়ে রাখলেন।

যতীন বলল—'একটা চিঠি গতকালের হাট ফেরত আমাদের স্কুলের চিঠিপত্রের

সঙ্গে আনা হয়েছে। আর এই চিঠিটা সকালে একজন লোক স্কুলে এসে আপনার নাম ক'রে আপনাকে দিয়ে দিতে ব'লে গেলো।'

খাম খুলে চিঠিখানা নিঃশব্দে পড়ে গেলেন সত্যপ্রসাদ। চিঠিখানা পড়ার সময় নানারকম অনুভূতির ছায়া ও'র মুখের উপর দিয়ে খেলা ক'রে গেলো।

চিঠিটা পড়া শেষ হ'লে একটু বিষণ্ণ হেসে সত্যপ্রসাদ বললেন—'মার চিঠি। আমাদের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমার এখানে অবস্থানের কথাটা মা নায়েবকাকার মুখ থেকেই জেনেছেন।'

যতীন ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে বলল—'আপনার মা আছেন ?'

সত্যপ্রসাদ বললেন—'আছেন মানে ? একেবারে জল-জ্যান্ত আছেন।'—একটু চুপ ক'রে থাকলেন সত্যপ্রসাদ। তারপর বিষণ্ণ আবেগ-মাখানো গলায় বললেন—'বুঝলে যতীন, সংসারে এখনো যদি আমার বিন্দুমাত্র কোনো আকর্ষণ থেকে থাকে, তবে তা আমার ঐ মায়ের জন্যই।'

সন্ধ্যেবেলায় সত্যপ্রসাদ হারিকেন জ্বেলে খামখানা খুলে আবার ওগুলো পড়তে বসলেন। 'কৃষক-সভা'র পক্ষ থেকে এসেছে একখানা নির্দেশনামা এবং খানকয়েক ইস্‌তাহার। এগুলো থেকেই তাঁকে এখন ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে। ইতিমধ্যেই ওগুলো বারকয়েক মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন। কিন্তু সুস্পষ্ট কোনো পথ-নির্দেশ খুঁজে পাচ্ছেন না।

উঠোনের দিকে ঝুপ্‌সি অন্ধকার। সেখান থেকে অস্পষ্ট চাপা-গলার কথা-বার্তা শোনা গেলো। সত্যপ্রসাদ গলা বাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, অন্ধকারে অনেকগুলো লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী সব বলাবলি করছে। সত্য-প্রসাদ কৌতূহলী হয়ে হারিকেনের শিখাটা ঈষৎ কমিয়ে রেখে উঠবার উপক্রম করলেন। এমন সময় জলধর এগিয়ে এসে বলল—'আপনি এট্টু বাইরে আসেন সত্যদা। মেলা লোক আইছে। ওরা সবাই আপনার সাথে দেখা করতি চায়।'

সত্যপ্রসাদ তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ব্যাপার দেখে অবাক হলেন। প্রায় পঁচিশ তিরিশ জন লোকের এই অসময়ে এমন সংঘবদ্ধ উপস্থিতি দেখে অবাক হবারই কথা। সত্যপ্রসাদ বাইরে এসে দাঁড়াতেই সত্যপ্রসাদের থেকে কিছুটা ব্যবধান রেখে লোকগুলো সারা উঠোন জুড়ে গোল হয়ে ব'সে পড়ল। এতো লোকজন দেখে কৈলাস এবং তার দুই ছেলেও একপাশে এসে দাঁড়াল। অগত্যা সত্য-প্রসাদও বসলেন। অতঃপর দেখা গেলো, জনতার মধ্যে একটা গুজ্‌-গুজ্‌ ফুস্-ফুস্ চলছে। এ ঠেলছে ওকে, সে ঠেলছে তাকে। অর্থাৎ তাদের বক্তব্যটা সত্যপ্রসাদের কাছে সাজিয়ে গুছিয়ে বলার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর গলা-খাঁকারি দিয়ে উঠে দাঁড়ায় রামপদ। অন্ধকারের মধ্যে সকলের মাথার উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সত্যপ্রসাদকে উদ্দেশ ক'রে বলে—'সত্যদাদাবাবু, আপনার কাছে আমরা এট্টা দুঃখ জানাতি আইছি। আমাদের এট্টা পথ আপনারে ব'লে দিতি হবে।'

সত্যপ্রসাদকে ঈষৎ চিন্তিত মনে হ'লো। বললেন—'আমি তোমাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলো ?'

ইতিমধ্যে নবীন আর সতীশের তত্ত্বাবধানে হাতে হাতে হুঁকো ঘোরা শুরু হয়েছে। ক্লান্তি অপনোদন আর বুদ্ধির ফলন জোগাতে এটা ওদের কাছে অপরিহার্য।

যথারীতি গলা-খাঁকারি দিয়ে রামপদ বলে—'আমাদের বিলভাসানের হা'লো-চাষাদের অবস্থা তো আপনি দেখ্‌তিছেন। খরা-অজন্মা বান-বন্যা তো আছেই। তার পরে আবার জমিদার জোতদারের পেষণ। আমাদের অবস্থা হইছে জাঁতি-কলে পড়া ইন্দুরির মতোন। যতোই খাটি-খুটি, প্যাটের ভাত পুরো জোটে না। আপনি বৈকুণ্ঠবাবুর ছেলে। উনিও আমাদের পরে কম অত্যাচার করেন না। তা সে নালিশ নিয়ে আমরা আপনার কাছে আসিনি। আপনি আমাদের কি চোখে দ্যাখেন, তা আমরা জানৃতি পারিছি। আমরা তাই সকলে আপনার কাছে বুদ্ধি নিতি আস্‌লাম। আমরা আর কতোকাল এইভাবে প'ড়ে প'ড়ে মার খাবো ক'ন ? আমাদের কি বাঁচার কোনো পথ নেই ?'

সত্যপ্রসাদ কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না। চুপচাপ ব'সে থাকলেন। কৈলাসের গোয়ালঘরের উপর দিয়ে দূর আকাশের একটা স্থির জ্বলজ্বলে তারা যেন সত্যপ্রসাদকে গাঢ় চোখে দেখছে। অভিভূত সত্যপ্রসাদ ধীরে কণ্ঠে বললেন—'যে প্রশ্ন তোমরা আমার কাছে করেছো, এর উত্তর আমার জানা নেই। তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি, একজোট হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো ছাড়া তোমাদের বাঁচার কোনো পথ নেই। লড়াই ক'রে তোমাদের বাঁচতে হবে। আর, তোমাদের সে লড়াইয়ে আমার শেষ রক্তবিন্দু নিয়ে আমি তোমাদের পাশে দাঁড়াতে রাজি আছি।'

সত্যপ্রসাদের ধীর গম্ভীর আন্তরিক কথাগুলো উপস্থিত লোকগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ আর উদ্দীপনার সঞ্চার করল। উত্তেজনার একটা চাপা গুঞ্জন উঠল তাদের মধ্যে। সকলে একটু শান্ত হতে সত্যপ্রসাদ আবার বললেন,—'তোমাদের বাঁচার কোনে পথ আছে কিনা – এই যে প্রশ্ন তোমরা আমাকে করেছো, ঐ একই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আমি নিজেও আজ ঘরছাড়া। পথে পথে ঘুরছি। তোমাদের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছি। ভাইসব,—এসো, আমরা সবাই একজোট হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে লড়াই করার শপথ নিই। এছাড়া আমাদের বাঁচার আর কোনো পথ নেই।'

আবেগে উত্তেজনায় সেই রুদ্ধবাক কুণ্ডলী-পাকানো জনতা পরস্পর পরস্পরের হাত চেপে ধরল। লড়াই—এবার থেকে লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হও ভাই। হাতে হাত মিলাও সবাই। অন্ধকারের আলোয় জোড়া জোড়া চোখগুলিতে যেন আগুনের ফুল্‌কি উঠল।

সকলে চ'লে যাবার পরও সত্যপ্রসাদ স্তম্ভিত হয়ে ব'সে রইলেন। একটু বাদে কৈলাস এসে খেতে ডাকল। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে খেতে বসলেন।

বড়ো ঘরের বারান্দায় দু'জনে খেতে বসেছেন। নবীন সতীশ আগে বা পরে খায়।

এতোদিন সত্যপ্রসাদ ওদের বাড়ীতে রয়েছেন, কিন্তু ওদের শ্রদ্ধা-মিশ্রিত সঙ্কোচের ভাবটা যেন কিছুতেই কাটে না। সত্যপ্রসাদের সামনে কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এদিকে সত্যপ্রসাদের জন্য তাদের অহঙ্কারও কম নয়। বৈকুণ্ঠবাবুর ছোটো ছেলে, এতোখানি শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী সত্যপ্রসাদ তাঁদের বাড়ীতে অতিথি হয়ে রয়েছেন, এটা তাদের পরম আনন্দ এবং গর্বের বিষয়ও বটে। কৈলাসও যথাসাধ্য সত্যপ্রসাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর রাখে। এতোবড়ো বাড়ীর ছেলে আজ তার বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করছেন, এ তার পরম সৌভাগ্য বইকি! যতো কাজই থাক না কেন, সত্যপ্রসাদের খাওয়ার সময় কৈলাস তাঁর পাশে এসে বসবেই। খাওয়ার উপকরণ প্রায়ই যৎসামান্য। কিন্তু সেটুকুও যাতে যত্ন ক'রে পরিবেশন করা হয়, সেদিকে কৈলাসের সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি। সাধারণতঃ পরিবেশনের কাজটা করে নবীনের বউ। কখনো চাঁপাও টুকটাক জিনিস এগিয়ে দেয়। কিন্তু রান্নাঘরে ব'সে সব জিনিসটা সতর্কভাবে নজর রাখে কৈলাসের গৃহিণী। তার সযত্ন পরিবেশনায় সামান্য উপকরণও অসামান্য হয়ে ওঠে। এখানকার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে প্রথম প্রথম সত্যপ্রসাদের বেশ অসুবিধা হতো। আনাজপাতি যাই হোক, এসব বিল অঞ্চলে মাছের কখনো অভাব ঘটে না। কিন্তু সে মাছের রন্ধন-পদ্ধতি আদৌ রুচিকর নয়। প্রথমতঃ, মশলা-পাতির ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত। তারপর, তিক্ত-দ্রব্যের আধিক্য। মাছ রান্নায় উচ্ছে নিমপাতা প্রভৃতি তেতো জিনিসের বহুল প্রয়োগ এখানকার রন্ধন-পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এগুলো প্রথম প্রথম সত্যপ্রসাদের রসনার পক্ষে আদৌ প্রীতিকর মনে হয় নি। এখন আস্তে আস্তে কিছুটা জিভ সহা হয়ে গেছে।

অন্যদিন খেতে ব'সে সত্যপ্রসাদ নানারকম গল্প-গুজব করেন। দু'জনের মধ্যে কখনো কখনো একটু-আধটু ঠাট্টা-রসিকতাও চলে। কিন্তু আজ সত্যপ্রসাদ নিঃশব্দে মাথা নিচু ক'রে খেয়ে চলেছিলেন। সামান্য দূরে কৈলাসও খেতে বসেছে। খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে আড়চোখে সত্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। সত্যপ্রসাদের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না।

কৈলাস একসময়ে আস্তে আস্তে বলে—'ওরা কিন্তু আপনার পরে খুব ভরসা নিয়ে গেলো, ছোটোবাবু—!'

সত্যপ্রসাদ সংক্ষেপে জবাব দেন—'হ্যাঁ, সে তো দেখলামই।' —কৈলাস একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার বলে—

'কথাডা আপনি ঠিকই কইছেন ছোটোবাবু। একজোট হয়ে সবাই লড়াই করতি না পারলি বাঁচার কোনো পথ নেই।'

ক্ষণিকের বিরতির পর কৈলাস আবার বলে—'তবে এট্টা কথা কি ছোটোবাবু, এই লড়াই করতি গেলি যে আগুন জ্বলবে, তার ঠ্যালা কে সামলাবে! লড়াই করবেডা কারা ক'ন? এদের তো আপনি জানেন, যাদের সাথে এরা লড়াই করবে, তাদেরই কাছে এদের জান-প্রাণ, ভিটে-মাটি বাঁধা। কোন্ ভরসায় এরা লড়াই করতি যাবে! আর, লড়াই করতি গিয়েই বা এরা কয়দিন টিকে থাকতি পারবে!'

সত্যপ্রসাদ একটু চিন্তিতমুখে বলেন—'তাহলে তুমি কি করতে বলো কৈলাস?'

কৈলাস থেমে থেমে বলে—'আমি বলি কি ছোটোবাবু, আপনি ফিরে যান। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। এইসব মুখ্যু-সুখ্যু গোঁয়ার-গোবিন্দ চাষাদের ক্ষ্যাপায়ে দিয়ে আপনি ওদেরও ক্ষতি করবেন, আপনার নিজিরও ক্ষতি হবে। তাই কই কি, এখান থেকে চলে যাওয়াই আপনার সব দিক দিয়ে মঙ্গল।'

সত্যপ্রসাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। থালায় জল ঢেলে উঠে দাঁড়িয়ে অস্বাভাবিক শান্তকণ্ঠে বললেন—'দ্যাখো কৈলাস, তোমার এখানে থাকলে তোমার যদি কোনো অসুবিধা হয়, বা যদি মনে করো, তোমার কোনো বিপদ হবে, তাহলে কালই আমি তোমার এখান থেকে চ'লে যাবো। তবে একটা কথা মনে রেখো। তোমাদের এই বিলভাসানে আমাকে থাকতে হবেই। এ আমার অন্তরের শপথ। আর আজ সন্ধ্যেবেলায় ঐ লোকগুলোকে যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি, তা আমি পালন করবই।'

বৃদ্ধ কৈলাস মাতব্বরের চোখ দু'টো ছাপিয়ে জল এলো। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে এ'টো হাতেই হাত জোড় ক'রে বলল—'আমারে মাফ করেন ছোটোবাবু, ওকথা আমি বল্‌তি চাইনি—ওকথা আমি বল্‌তি চাইনি ছোটোবাবু!'

উল্টোদিকে ফিরে কাপড়ের খুঁটে চোখ দু'টো মুছে কৈলাস এবার একটু উচ্চকণ্ঠে বলল—'আপনার বাবা বৈকুণ্ঠ মুখার্জী মশায়ের মনে দয়ামায়া নেই জান্‌তাম। তা আপনিও দেখ্‌তিছি কম যান না। তা ঠিক আছে, আপনার খ্যামোতা থাকে আপনি যাবেন আমার বাড়ীর থেকে!'

প্রচণ্ড অভিমানী শিশুর মতো বৃদ্ধ কৈলাস টলতে টলতে সেখান থেকে সরে গেলো।

॥ আট ॥

পরদিন সত্যপ্রসাদ ডায়েরীতে লিখলেন—"২৩শে জুন, ১৯৪৫। গত কল্যাকার দিনটি স্মরণীয়। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা'র অফিস হইতে পত্র পাইয়াছি। স্পষ্ট পথ-নির্দেশ না থাকিলেও তাহাতে পথের সঙ্কেত আছে। ইস্তাহারগুলি মূল্যবান। ১৯৩৬-এর এপ্রিলে কংগ্রেসের লাখ্‌নৌ অধিবেশনের সময় 'নিখিল ভারত কৃষক সভা' সংগঠিত হয় এবং তাহারই সূত্র ধরিয়া ১৯৩৬-এর আগষ্ট মাসে কলিকাতার অ্যালবার্ট হলের সভায় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা'র যখন জন্ম হয়, তখন আমি কলিকাতায় উপস্থিত থাকিলেও এই সংগঠনের সহিত তখন কোনোরূপ যোগাযোগ ঘটা সম্ভব ছিল না। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বর্তমানে 'প্রাদেশিক কৃষক সভা'র কার্যধারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে ইহার সদস্য সংখ্যাও প্রচুর। এই কৃষক সভার একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে নিজেকে পরিণত করিবার জন্য আমি সবিশেষ যত্নশীল থাকিব। বিলভাসানে আসিয়া এখানকার চাষীদের শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

এখানে যে কিছু সঙ্গতিপন্ন চাষী আছে, যাহারা নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ করে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের সংখ্যা সীমিত। অধিকাংশ কৃষকই ভাগচাষী। এই ভাগচাষীদের কাহারও বা নিজস্ব সামান্য দুই এক বিঘা জমি আছে, কাহারও বা তাহাও নাই। তাহারা ভূমিহীন। এই সমস্ত স্বল্প জমির মালিক বা ভূমিহীন কৃষকেরা জোতদারদের জমি চাষ-আবাদ করে। আইনের চোখে ইহারা আদৌ প্রজাই নয়। জমিতে ইহাদের কোনো স্বত্ব নাই। জোতদারের যে জমি ইহারা চাষ করে, সে জমিতে ইহাদের কোনো দখলী-স্বত্ব তো থাকেই না, উপরন্তু বহু বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত একই জমিতে চাষ-আবাদ করিয়া আসিলেও জোতদার-জমিদাররা ইহাদের এক বৎসরের বেশী মেয়াদে একসাথে কখনই জমি চাষের অনুমতি দেয় না। জমিতে এই বর্গাদার চাষীদের স্থায়ী কোনো অধিকার নাই। আছে শুধু একটা মৌখিক লিজ। বিঘা প্রতি দুই তিন টাকা খাজনা দিয়া জমিতে যে ফসল হয় তাহার অর্ধেক পায় জোতদার। এই অর্ধেক ফসলের জন্য তাহার এক পয়সাও ব্যয় হয়না। চাষের সমস্ত ব্যয়ই ভাগচাষীর। ১৯৪০-এ ভূমি-রাজস্ব কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, যেসব বর্গাদার লাঙল গরু ও কৃষি উপকরণ যোগায়, তাহাদের প্রজা হিসাবে গণ্য করা হউক। এবং জোতদারের ভাগ অর্ধেকের পরিবর্তে এক-তৃতীয়াংশ করা হউক, যাহাতে বর্গাদার তাহার ভাগ হিসাবে দুই-তৃতীয়াংশ পাইতে পারে। কিন্তু গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে এই সুপারিশ কার্যকর করিবার কোনো ব্যবস্থা হয় নাই। ১৯৪০-এ 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা'র চতুর্থ সম্মেলন আমাদের এই যশোহর জেলার পাঁজিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। মুজফ্‌ফর আহমদ, বঙ্কিম মুখার্জী, সৈয়দ নওশের আলী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখকে লইয়া সভাপতি পরিষদ গঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন মঃ আবদুল্লাহ রসুল। তাঁহাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পাঁজিয়া সম্মেলনেই তেভাগা আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। যশোহরের কৃষ্ণ বিনোদ রায় এ-অঞ্চলে কৃষক-সভার মাধ্যমে তেভাগা আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। কৃষক-সভার আন্দোলনকে ক্রমশঃই শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। গতকাল কৃষক-সভার অফিস হইতে এই বিষয়ক কিছু ইস্তাহার পাইয়াছি। বিলভাসানের এই বিস্তৃত কৃষি-অঞ্চলে কৃষক-আন্দোলন সংগঠিত করিবার পক্ষে আমি যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছিলাম, 'প্রাদেশিক কৃষকসভা' তাহা মানিয়া লইয়াছে এবং এই অঞ্চলে কৃষক-সমিতি গড়িয়া তুলিবার নির্দেশ দিয়াছে। শীঘ্রই এখানে আরো কিছু কর্মী এবং মহিলা-সমিতি গড়িয়া তুলিবার জন্য কয়েকজন মহিলা-কর্মী পাঠাইবার কথাও কৃষক-সভা চিন্তা করিতেছে। ইহা অবশ্যই আনন্দের কথা। সর্বোপরি, গতকল্যকার ঘটনা আমাকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। গতকাল সন্ধ্যায় আমার নিকট যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের মূঢ় ম্লান চোখে আমি যে আগুন দেখিয়াছি, তাহার তুলনা কোথায়? কঠোর পেষণ আর পীড়নে তাহাদের পঙ্গু জীবনে ধীরে ধীরে জাগরণ আসিতেছে। নিষ্ফল মাথা কুটিয়া তাহারা পথ খুঁজিতেছে। আমি তাহাদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে, তাহাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আমি সাথী হইব। জানিনা, এই প্রতিশ্রুতি আমি কতদূর পালন করিতে পারিব।...

…আমার আশ্রয়দাতা কৈলাস মণ্ডল লোকটি সত্যই অপূর্ব। একেবারেই শিশুর মতো নির্মল হৃদয়ের অধিকারী। বিষয়-বুদ্ধি যথেষ্টই আছে। তাহা না হইলে এই বিষয়-সম্পত্তি করিতে পারিত না। শুনিলাম, প্রায় ত্রিশ বিঘা জমির মালিক। নিজে মাথার উপর থাকিয়া দুই ছেলেকে দিয়া চাষ-বাস করায়। পুরাপুরি চাষী পরিবার। গরীব প্রতিবেশীদের উপর যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। লোকটি সৌখিনও বটে। বাড়ীতে মিস্ত্রী রাখিয়া দীর্ঘ একটা বাইচের নৌকা নির্মাণ করাইতেছে। কিন্তু এই অঞ্চলে কোনোরূপ কৃষক-আন্দোলন গড়িয়া উঠুক, তাহাতে বোধহয় কৈলাসের পুরাপুরি সম্মতি নাই। অবশ্য তাহার যুক্তিও বুঝি। কৃষকদের দাবী-দাওয়া লইয়া আন্দোলন শুরু হইলে জোতদার-জমিদারেরাও চুপ করিয়া থাকিবে না। তাহাদের অত্যাচারের মুখে পড়িয়া দুর্বল চাষীরা মার খাইবে। তাহার প্রতিরোধ বা প্রতিকারের কথাও অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে।………গতকাল কৈলাসের কথায় হঠাৎ রুষ্ট হইয়া ভাবিয়াছিলাম, তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও আশ্রয় লইব। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইল। কৈলাসকে আমি আগেই চিনিয়াছি। কিন্তু গতকল্য তাহার অন্তরের যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আমি অভিভূত হইয়া গিয়াছি। এই মহৎ-প্রাণ সরল বৃদ্ধের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া গেলে নিতান্তই অকর্তব্য হইবে।”—

বাঁকপুর গ্রামের পুব সীমানা থেকে খানিকটা দূরে একটা অগভীর ছোটো খাল। তার উপর দিয়ে বড়ো রাস্তাটা টানা চলে গেছে মল্লিহাটি গ্রামের দিকে। গ্রীষ্ম-কালে শুকিয়ে গেলেও বর্ষাকালে খালটায় জল জমে। জলে বেশ স্রোতের টানও হয়। খালের দুইপাশে উঁচু মাটির বাঁধ। মাঝখানে খালের উপর বাঁশের সাঁকো। এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে যেতে হ'লে বড়ো-রাস্তাটা ধ'রে এসে সাঁকো পার হতে হয়।

বিকেলের দিকে সত্যপ্রসাদ বেড়াতে বেড়াতে এসে সাঁকোটার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিলের মধ্যে ক্ষেতে ইতস্ততঃ লোকেরা কাজ করছে। বর্ষার নতুন জলে কেউ কেউ মাছ ধরছে। দূরে দূরে ছড়ানো গ্রামগুলোকে দীর্ঘ এক একটা মোটা কালো দাগের মতো মনে হচ্ছে। ক্ষেতের ধান পাটের গাছগুলো মাথায় বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। মাটির বাঁধের উঁচু জায়গাটায় দাঁড়িয়ে সত্যপ্রসাদ চারিদিকের দিগন্ত-বিস্তৃত শ্যামল সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন। অদ্ভুত একটা প্রশান্তি যেন ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। এমন সময় খালের ওপাশের মল্লিহাটি গ্রামের দিক থেকে জন-চারেক লোককে এদিকে আসতে দেখা গেলো। সাঁকোটা পার হয়ে লোক-গুলো হঠাৎ সত্যপ্রসাদকে দেখে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারজনেরই বয়স পঞ্চাশ-উত্তীর্ণ। এ-অঞ্চলের তুলনায় কিছুটা ভদ্র বেশভূষা। ওরা এসে সত্যপ্রসাদের পাশে দাঁড়াল। একজন বলল—'আপনিই তো সত্যপ্রসাদবাবু। নমস্কার হই।' —সকলে হাতজোড় ক'রে নমস্কার করল।

সত্যপ্রসাদও হাত জোড় করলেন। লোকগুলোকে চিনতে পারলেন না। এখানে মাসখানেক আছেন, কখনো চোখে পড়েছে ব'লে মনে হ'লো না।

সত্যপ্রসাদ একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন—'আপনাদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না।'

ওদের মধ্যে থেকে একজন বলল—'আজ্ঞে, আপনি হয়ত আমাদের চিন্‌তি পারবেন না। আপনার বাবা মুখাজ্জি মশায় আমাদের চেনেন। আমরা সব এই অঞ্চলেরই চাষী-বাসী লোক। আমাদের 'আপনি—আজ্ঞে' বল্‌লি লজ্জা পাবো।'

একে একে ওরা নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দিলো। বিলতিতের বদন মণ্ডল, মল্লিহাটির পুলিন রায়, বনখালির ভজন দাস, আর বাঁকপুরের অনন্ত বিশ্বাস। পুলিন রায়ের চেহারাটা ছোটো-খাটো, কিন্তু চোখ দু'টো অসম্ভব ধূর্ত। ভজন আর বদনের চেহারা এ-অঞ্চলের সাধারণ চাষীর মতো। অনন্তর চেহারাটা বিশাল, দশাসই। এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় না ঘটলেও সত্যপ্রসাদ এখানে এসে এদের নাম বহুবার শুনেছেন। এরাই হচ্ছে বিলভাসান অঞ্চলের চার স্থানীয় প্রধান জোতদার। নড়াইল, আফরা, বাসুন্দে প্রভৃতি স্থানের জমিদার আর বড়ো বড়ো জোতদারদের এজেন্ট। মনে মনে একটু সতর্ক হলেন সত্যপ্রসাদ।

সত্যপ্রসাদ সম্মানের ব্যবধানটা বজায় রেখেই বললেন—'আপনারা সবাই দল-বেঁধে কোথায় চললেন ?'

পুলিন রায় বলল—'শোন্‌লাম আপনি কিছুদিন আ'সে এখানে রইছেন। একবার যে আস্‌বো,—তা কাজ-কামের ঝামেলায় সময় করতি পারি না। তা ভাবলাম, আজ আপনার সাথে এট্টু চেনা-পরিচয় ক'রে আসি। এদেরও সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌লাম। তা আপনি উঠিছেন কোথায় ?'

সত্যপ্রসাদ বুঝলেন, এরা তাঁর সম্পর্কে সব খোঁজ-খবর নিয়েই এসেছে। এবং এদের আসার পিছনে যে একটা উদ্দেশ্য আছে, তাও বুঝতে পারলেন। ফলে কোনো জবাব দিলেন না।

অনন্ত বিশ্বাস ঘোঁৎ ক'রে একটা শব্দ ক'রে বলল—'ঐ তো, আমাদের গ্রামের কৈলেস মণ্ডলের বাড়ী রইছেন।'

পুলিন পরম আফসোসের ভঙ্গীতে জিভ কেটে বলল—'ছি ছি ছি, কি আফ-সোসের কথা বলেন দি' নি! আপনার মতো ভদ্দরলোকের কি যেখানে-সেখানে থাকা সাজে ? গাঁ-গেরাম, বিল-খ্যাতের শোভা-টোভা দেখ্‌তি কয়দিনির জন্যি আইছেন, তা আমাদের কারো বাড়ীতে তো ওঠবেন! যত্ন ক'রে ঘুরোয়ে-ফিরোয়ে আপনারে সব দ্যাখায়ে দেতাম। তা না, কোথাকার কোন্ কৈলেসের বাড়ী গিয়ে উঠিছেন! আপনার বাবা শুনলি কি ভাববেন আমাদের !'

সত্যপ্রসাদ কথাটা গায়ে না মেখেই বললেন—'আমি কিছুদিন এখানে থাকব বলেই এসেছি। তাছাড়া কৈলাসের ওখানে তো আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।'

অনন্ত অতো রেখে-ঢেকে কথা বলার লোক নয়। সে সরাসরি বলল—'আপনার অসুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু আমাদের যে এট্টু হচ্ছে। সেই কথাডাই তো আপনারে বলতি আসলাম। শোন্‌লাম আপনি বাঁকপুর গ্রামের সবাইরে ডা'কে কাল রাত্তির-বেলায় কি সব পরামর্শ দেছেন।'

সত্যপ্রসাদ অবাক হয়ে গেলেন। কালকের সন্ধ্যার ঘটনাটা এর মধ্যেই এসব

লোকের কানে পৌঁছে গেছে।

অতঃপর পুলিনও সরাসরি বলল, 'কাজডা আপনি ভালো করতিছেন না সত্য-বাবু। এভাবে নিজেদের পায়ে যদি আপনারা নিজেরাই কুড়োল মারেন, তাহলি তার ভবিষ্যৎটা কি দাঁড়াবে, একবার ভাবিছেন? আপনার বাবাও তো জমি-বাতি নিয়েই কারবার করেন। এই চাষা-ভুষোদের মাথায় ওসব কুমন্তর ঢুকোলি তার পরিণাম কি হবে জানেন?'

বদন মণ্ডল বলল—'আমরাওতো দুডো ক'রে ক'ম্মে খাচ্ছি। তা, আপনার মতন জ্ঞান-বুদ্ধিমান লোক যদি এইভাবে ওদেরমাতায়ে তোলেন, তাহলি আমরা তো আর বাঁচিনা।'

সত্যপ্রসাদ এবার একটু হেসে বললেন—'আপনারা এতো উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আমি তো অন্যায় কিছু করছি না। তাছাড়া, আমার কাজের ভালোমন্দ আমি নিজেই বুঝে চলতে পারব। আপনাদের উপদেশের দরকার হবে না।'

পুলিন এবার কুটিল চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে বলল—'ঠিক আছে, যা ভালো বোঝেন করেন। কিন্তু কোনো ঝামেলা হ'লি আমাদের বল্‌তি পারবেন না। আমাদের অনুরোধ আপনারে জানায়ে গেলাম। শোনা—না শোনা, সে আপনার ইচ্ছে।'

দলটা আবার উল্টোমুখে ফিরে চলে গেলো।

সত্যপ্রসাদ বুঝলেন—আকাশে মেঘ জমছে। ঝড় উঠবে।

বিলভাসান অঞ্চলটি যতই বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হোক না কেন, চারি-দিক থেকে নানা খবর যেন হাওয়ার মুখে ভেসে আসতে লাগল। সপ্তাহে দু'দিন ক'রে হাট বসে বাসুদ্দেয়, চাঁড়া-ভিটেয়, তুলোরামপুরে, নড়াইলে। দূর-দূরান্তরের মানুষ এসে জমে হাটে। চাষী-বাসীর সংখ্যাই বেশী। হাটে যাওয়া-আসার পথে, হাটের মাঝে, দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কথাবার্তা চলে, সংবাদ আদান-প্রদান হয়। আর এমনি নানা সূত্র ধ'রে নানা খবর আসে চারিদিক থেকে। কোন্ হাটে সওদা-পাতি-বেচা গরীব হাটুরেরা 'হাট-তোলা' দেবে না ব'লে রুখে দাঁড়িয়েছে, কোন্ হাটে কারা পেয়াদা পুলিশকে জব্দ করেছে, কোথায় জোতদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঢালী লেঠেল চাষীরা সংঘবদ্ধ হচ্ছে,—তার নানা রোমাঞ্চকর খবর ভেসে বেড়ায় বাতাসে। সেগুলো উড়ে উড়ে আসে বিলভাসানেও। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় বাঁকপুরের চাষীরা এসে এক জায়গায় জড়ো হয়। কখনো কৈলাসের উঠোনে, কখনো বা অন্য কারো বাড়ী, আবার কখনো বা বাঁকপুর স্কুলের বটতলায়। আশে-পাশের অন্যান্য গ্রাম থেকেও দশ-বিশ জন ক'রে আসা শুরু হয়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, সংবাদ আদান-প্রদান চলে। কেউ কেউ সঙ্গে দোতারা নিয়ে আসে। যারা ভালো গাইতে পারে, তারা দোতারা বাজিয়ে গান ধরে। ভাটিয়াল, বারমেসে, না হয় ভাব-গান। সব জায়গাতেই উপস্থিত থাকেন সত্য-প্রসাদ। যতীন এবং ওদের স্কুলের আরো দুজন অল্পবয়সী শিক্ষক—বনখালি গ্রামের কাশীনাথ আর শ্যামাপদও প্রায়ই উপস্থিত থাকে। সারাদিন মাঠে-ঘাটে খাটা, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষগুলো সন্ধ্যাবেলায় সত্যপ্রসাদকে ঘিরে গোল হয়ে বসে।

সত্যপ্রসাদ তাদের কাছে ইতিহাসের গল্প বলেন। নানা দেশের অসহায় দরিদ্র অত্যাচারিত শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামের কাহিনী শোনান। মহাযুদ্ধের বৃত্তান্ত, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, নীলচাষীদের লড়াই, ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে মহাজনদের পৈশাচিক আচরণ, কলকাতার রাস্তায় ধনী-বাড়ীর থেকে ফেলে দেওয়া এঁটো-পাতা নিয়ে বুভুক্ষু কুকুরে মানুষে কাড়াকাড়ি—নানা বিষয় নিয়ে একটার পর একটার কথার মালা বুনে চলেন সত্যপ্রসাদ। নিরক্ষর অজ্ঞ মানুষগুলো তাঁর মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে ব'সে থাকে। কিছু হয়ত বোঝে, আবার কিছু হয়ত বোঝে না। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। বোঝা না-বোঝার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এটুকু তারা পরিষ্কার বুঝতে পারে, কোথায় যেন একটা জগদ্দল পাথরের দেয়াল টলমল ক'রে কাঁপছে। যে কোনো মুহূর্তে তা আছড়ে প'ড়ে ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সত্যপ্রসাদের কাছে মাঝে মাঝে 'কৃষকসভা'র অফিস থেকে নানারকম ইস্তাহার আসে। তাতে দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, ময়মনসিংহ, ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার কৃষকদের নানা বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন আর সংগ্রামের ইতিবৃত্ত লেখা থাকে। সে-সব কাহিনী শুনতে শুনতে বিলভাসানের চাষীদের রক্তেও অনুপ্রেরণার জোয়ার আসে। সর্বদেশের সর্বকালের অত্যাচারিত মানুষের প্রতিরোধের সংগ্রামে তারাও যেন একাত্ম হয়ে ওঠে।

দুপুরের দিকে কী কাজে কোথায় যেন যাচ্ছিল জলধর। রাস্তায় ওকে দেখেই কৈলাস-গিন্নী একটু এগিয়ে গিয়ে হাঁক পাড়লেন—'ও বাবা জলা, এট্টু শুনে যা না বাবা।'

জলধর ভিটের উপর উঠে এসে বলে—'কি হইছে জ্যেঠি, ডাকো ক্যানো?'

কৈলাস-গিন্নী বলল—'তোরে পাইয়ে খুব ভালো হ'লো বাবা। কয়ডা নারকেল পা'ড়ে দে। মেস্তোরীরা এতোদিন কাজ করতিছে। একদিন এট্টু পিঠে আশটা খাওয়াই।'

এসব কাজে জলধরের কোনো ঘাটতি নেই। রান্নাঘরের পাশেই একটি নাতি-দীর্ঘ নারিকেল গাছ। জলধর তর-তর ক'রে গাছটায় উঠে গেলো।

জলধরের গলার শব্দ পেয়ে গাছের নিচে মার পাশে এসে দাঁড়াল চাঁপা। গোটা ছয়েক শুকনো নারকেল মাটিতে ফেলে দিয়ে নেমে এলো জলধর।

চাঁপা নারকেলগুলো কুড়িয়ে এনে জড়ো করল। কৈলাস-গিন্নী একটাকে আলাদা ক'রে রেখে বলল—'এইডা তোরা ভা'ঙে খা। আর বাবা জলা, তুই কিন্তু সন্ধ্যে-বেলায় আসিস। পিঠে খাইয়ে যাস্।' —কৈলাস-গিন্নী নারকেলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। জলধর অবশিষ্ট নারকেলটার খোসা ছাড়িয়ে শাঁসটাকে ফালি ফালি করে! চাঁপা পাশে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসে। জলধর বলে—'নে, এবার হাত পাত।' —চাঁপা বিনা বাক্যব্যয়ে দুই হাত জড়ো করে। জলধরের হাত থেকে তার ভাগের নারকেলের ফালিগুলো নেয়। তারপর দুজনে চিবোতে থাকে। খেতে খেতে চাঁপা বলে—'সন্ধ্যে-বেলায় আস্‌বা কিন্তু জলাদা। মনে থাকে যেন—।'

জলধর বলে—'ধুর! আমার কতো কাজ। আসৃতি বল্লি অমনি আসা যায় কিনা!'

চাঁপা রেগে যায়—'ভালো হবে না কলাম জলাদা! তুমি না আ'সে দেখো—কি হয়! আমি আর কোনোদিন তোমার সাথে কথা বলবো না। কত্তো কাজ! কি এতো রাজকাজ্জি তোমার, যে সন্ধ্যে ব্যালায়ও এট্টু সময় পাবা না?'

খেতে খেতে হঠাৎ প্রচণ্ড বিষম লাগে জলধরের। চাঁপা দৌড়ে ছুটে গিয়ে একঘটী জল এনে বলে—'জল খাও। শুকনো নারকেল গলায় আটকে গেছে।'

জল খেয়ে ধাতস্থ হয় জলধর। চাঁপা হেসে বলে—'হবে না! দিনরাত খালি ঝগড়া-নোড়োই ক'রে ব্যাড়াবা! দ্যাখোগে, কেউ গালাগালি দেচ্ছে।'

বিষম খেয়ে জলধরের চোখে জল এসে গিয়েছিল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে জলটা মুছে জলধর বলে—'আমারে গালাগালি দেবার লোকের অভাব নাকি? তুই তো একেবারে ফাস্টো—'

চাঁপা আবার রেগে যায়—'ভালো হবে না কলাম জলাদা!' —জলধর চাঁপার রেগে-যাওয়া সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।

একটু বাদে চাঁপা বলে—'তোমারে সত্যি সত্যি এট্টা কথা কই জলাদা। আজ-কাল তোমার কি হইছে কও দেখি! দিনরাত মুখখানা খালি প্যাচার মতোন ক'রে ঘুরে বেড়াও।'

জলধর বলে—'প্যাচার মুখ প্যাচার মতোন হবে না তো কি তোর মতোন হবে?'

চাঁপার মুখখানা থমথমে হয়ে ওঠে—'যাও, সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না।'

ঘটী থেকে আর একটু জল খেয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকে জলধর। তারপর আস্তে আস্তে বলে—'তুই ঠিকই কইছিস চাঁপা। আমার কিছু ভাল্লাগে না! আমার মনডার মধ্যি কী যে আগুন জ্বলে সব সময়! আমার বাবার কথা আমি ভুলতি পারিনারে চাঁপা! রোগ নেই, পীড়ে নেই—আমার বাঘের মতোন বাবাডারে ওরা মা'রে ফ্যাল্লো!'—

রাগে ক্ষোভে দুঃখে জলধরের চোখ দু'টো জ্বলতে থাকে—'জানিস চাঁপা, সেদিন গগন ঢং আমারে কি ব'লে গেছে? বলিছে—তোর বাপের যোগ্য ব্যাটা হইছিস তুই, —পারিস্‌নে এর শোধ নিতি? —আমার বাবারে মারার বদলা আমি নেবোই!'

জলধরের অন্তরের উত্তাপটুকু যেন সঞ্চারিত হয় চাঁপার মধ্যেও। তারও চোখে জল আসে। এগিয়ে এসে চাঁপা হাত রাখে জলধরের কাঁধে। আস্তে আস্তে বলে—

'তুমি শান্ত হও, তুমি শান্ত হও জলাদা!'

॥ নয় ॥

অবশেষে কৈলাস মোড়লের বাইচের নৌকা জলে ভাসল। ভাদ্রের শেষে বিশ্বকর্মা পূজা। কথা ছিল, বিশ্বকর্মা পূজার আগেই নৌকা-গড়া শেষ করতে হবে।

মিস্ত্রীরা কথা রেখেছে। ভাদ্রের প্রথম দিকেই কাজ শেষ ক'রে দিয়েছে। অবশ্য, দিতে পেরেছে, তাই রক্ষে। কারণ, নৌকা গড়ানো হয়ে গেলেও নৌকার পালিশ, আলকাৎরা লাগানো, সাজগোজ পরানো ইত্যাদি নানা কাজ থাকে। সেগুলোও যথারীতি শেষ। ভাদ্রের মাঝামাঝি এসব কাজ শেষ হয়ে গেলো। প্রথম দিকে অবশ্য বেশ ভাবনায় পড়তে হয়েছিল। জ্যৈষ্ঠের একেবারে শেষে পর পর বেশ কয়েকদিন বিষ্টি হয়েছিল। তারপর আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত একেবারে নির্জলা। ঐ সময় খুব ভালো কাজ এগিয়েছিল। কিন্তু তারপরে হঠাৎ কী যে বাদ্‌লা নামল। একেবারে পুরোপুরি আষাঢ়ে-ঢল। দিনরাত কামাই নেই। ফুচুৎ ফুচুৎ লেগেই আছে। মিস্ত্রীদের কাজ করা দায় হয়ে উঠেছিল। কৈলাস অবশ্য মনে মনে এসবের জন্য তৈরীই ছিলো। উলুখড় আর বাঁশ দিয়ে গোটা নৌকাখানার উপর লম্বা আচ্ছাদন তৈরী ক'রে দিয়েছিল। গোয়ালঘরের পাশে মিস্ত্রীদের সাময়িক আস্তানাটাও বাঁশের বেড়া দিয়ে পরিপাটি ক'রে ঘিরে দিয়েছিল। ভাদ্রের প্রথম দিকেই যখন বোঝা গেলো, বিশ্বকর্মা পূজার অনেক আগেই নৌকা জলে নামানো যাবে, তখন ছোন্দার-খালের বাইচ-প্রতিযোগিতার কর্মকর্তাদের কাছে প্রতিযোগী হিসেবে কৈলাস মণ্ডলের নাম দাখিল করা হ'লো। বিশ্বকর্মাপূজার দিন প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি নাগাদ মিস্ত্রীরা চলে গেলো। অনেকদিন বাড়ী ছেড়ে এসেছে। ওদেরও মন চঞ্চল। —তাছাড়া, নৌকা-গড়ার কাজ তো শেষ হয়েই গেছে। মিস্ত্রীরা চলে যাবার আগের দিন ওদের ভালো ক'রে খাওয়ানো-দাওয়ানো হ'লো। ওদের প্রাপ্য টাকা-পয়সা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিলো কৈলাস। সঙ্গে কিছু বক্‌শিশও। ওদের চলে যাবার সময় সকলেরই চোখ ছলছল ক'রে উঠল। হেড-মিস্ত্রী কৈলাসের হাতখানা ধ'রে বলল—'মাতুব্বর-দাদা, দোষ-ঘাট নিও না। কাজে-কম্মে দরকার হ'লি খবর দিও। নিজের কাজ ব'লেই আ'সে কাজ তুলে দিয়ে যাবো।'

বৃদ্ধ কৈলাসের চোখ দু'টো ভিজে উঠল। মিস্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলল—'ভাইরে। সেকথা তোমার ব'লে দিতি হবে আমারে। নিজের ব'লে কাজ না করলি কেউ কি এতো তাড়াতাড়ি এতো যত্ন নিয়ে কাজ তুলে দেয়।'

চাঁপা আর চাঁপার মা-ও কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদেরও চোখ ছল-ছল করছে। সকলের পিছনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলো কষ্টীরাম। সে হঠাৎ ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠল। মিস্ত্রীরা আজ চলে যাওয়াতে তারই ক্ষতি বেশী। কারণ তার দৈনিক মজুরীটা আজ থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই আর্থিক লোকসানটাই যে তার কান্নার একমাত্র কারণ নয়, সেটা সকলে বুঝতে পারে।

বিশ্বকর্মাপূজার দিন-সাতেক আগে নৌকা-ভাসানোর আনুষঙ্গিক পূজা-ক্রিয়া-কর্মাদি যথাবিহিত সারা হ'লো। তারপর পাড়ার জোয়ান ছেলেরা মিলে সেই নিকষ-কালো রঙের সুদীর্ঘ নৌকাখানা ঠেলে ঠেলে বিলের জলে নামাল। গ্রামের মাঝখানের উঁচু বড়ো রাস্তাগুলো ছাড়িয়ে একটু নিচে নামলেই এখন জল। আর বিলের মধ্যে তো এখন অগাধ জল। জল প্রতিদিনই একটু একটু ক'রে

বাড়ছে। আর কিছুদিন বাদে গ্রামের বড়ো-রাস্তাগুলোও জলে ডুবে যাবে। শুধু দ্বীপের মতো ভেসে থাকবে উঁচু উঁচু ভিটে-বাড়ীগুলো। একবাড়ী থেকে অন্যবাড়ী যেতে হ'লে তখন নৌকা ডোঙা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকবে না।

সত্যপ্রসাদ তাঁর নিজস্ব বাসস্থানে ব'সে একখানা বইয়ের পাতা উল্‌টাচ্ছিলেন। হঠাৎ জলধর এসে ডাকল—'সত্যদা!'

জলধরকে দেখে সত্যপ্রসাদ বই বন্ধ ক'রে হেসে বললেন—'কি ব্যাপার! এমন চমৎকার বীরবেশ।'

জলধরকে সত্যিই ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। মাল-কোঁচা ক'রে কাপড় পরা। কোমরে একখানা গামছা বাঁধা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ফোলানো বাব্‌রি চুল। মুখে সামান্য গোঁফের আভাস। মজবুত অথচ নমনীয় দেহ। হাতে দীর্ঘ একখানা বৈঠা।

সত্যপ্রসাদ একটু আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু জলধর কোনো কথাই শুনল না—'আপনি বলেন কি সত্যদা! মাতুব্বর-জ্যাঠার বা'চির নৌকো আজ জলে নামবে, আপনি না গেলি চলে?'

সত্যপ্রসাদকে একরকম জোর ক'রেই ধ'রে নিয়ে গেলো জলধর। কৈলাস আর সত্যপ্রসাদকে নৌকার মাঝখানে বসানো হ'লো। নৌকার দুই ডালিতে বৈঠা নিয়ে বসল পঁচিশ তিরিশ জন। পেছনে হাল ধরল কৈলাসের বড়ো ছেলে নবীন। নৌকার সামনের গলুইয়ে দাঁড়িয়ে জলধর বৈঠার তালে তালে ঝাঁজ বাজাতে লাগল। বিলের উপর দিকে আমন ধানের গাছ। জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। বিলের নিচের দিকে ছিলো আউশ ধান। আষাঢ়ের প্রথমেই সেগুলো কেটে নেওয়া হয়েছে। এখন সেখানে গভীর ভাসান্ জল। মাঝে মাঝে শুধু শাপ্‌লার পাতা আর শাপ্‌লার ফুল ভাসছে। ঘণ্টাখানেক ধ'রে বাইচের নৌকাখানা সারা বিল তোলপাড় ক'রে ঘুরে বেড়ালো। তারপর ওরা সত্যপ্রসাদকে ডাঙার কাছে এনে নামিয়ে দিলো। ওরা আবার নৌকা নিয়ে চলে গেলো বিলের গভীরে। আরো ঘণ্টা-খানেক নেচে-কুঁদে না বেড়ালে ওদের শখ মিটবে না।

খানা-খন্দে জল জমেছে। সেগুলো লাফিয়ে ডিঙিয়ে ধান-ক্ষেত পাট-ক্ষেতের আল ধ'রে সত্যপ্রসাদ গ্রামের মধ্যে উঠে এলেন। পাটগাছগুলো এখন লম্বায় মানুষের মাথা ছাড়িয়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেতে পাট কাটার কাজ শুরু হয়েছে। একটা পাট-ক্ষেতের আল ধ'রে এগোতে এগোতে হঠাৎ চমকে থেমে পড়লেন সত্যপ্রসাদ। সামনেই অনেকগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ। পড়ন্ত বেলায় মেঘলা আকাশে অন্ধকার ঘনিয়েছে।

সামনে থেকে কে কথা ব'লে উঠল—'আপনি চলে আসলেন যে?'

অন্যমনস্ক ছিলেন ব'লে সত্যপ্রসাদ খেয়াল করেন নি। একটু ভালো ক'রে নজর করতেই বুঝলেন, সেদিনের সেই ভিটেটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। একটা জামগাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই জলে-ডোবা মেয়েটা। কি যেন নাম? হ্যাঁ,—সৌরভী।

সৌরভী আবার জিজ্ঞাসা করল—'আপনি চলে আসলেন যে? বাচ-খেলা দেখা

হয়ে গেলো ?'

সত্যপ্রসাদ কিছুটা অবাক হলেন মেয়েটাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। তবু স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললেন—'হ্যাঁ, আর ভালো লাগছিল না, তাই চলে এলাম। তা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন ? আবার জলে-টলে ডুববে নাকি ?'

সৌরভীর ভরাট দলমলে শরীরে আজ উষ্ণ প্রাণ-চাঞ্চল্য খেলা করছে। গভীর মাদকতা-মাখা দৃষ্টিতে সত্যপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—'ডুব্‌তি পারি, যদি আপনি আবার তুলে আনেন।'

সত্যপ্রসাদ কথা না বাড়িয়ে বললেন—'ঠিক আছে, তুমি বাড়ী যাও সৌরভী !'

সৌরভী এগিয়ে এসে সত্যপ্রসাদের পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল—'আপনি দেখ্‌তিছি আমার শরীল-খানারেই শুধু উল্টে-পাল্টে দেখেননি, আমার নামডারেও জা'নে গেছেন। তা, আপনি তো শোন্‌লাম, গেরামের লোকের কতো ভালো ক'রে বেড়াচ্ছেন। তা আমারে সেদিন মরণের হাত থেকে তুলে আ'নে এইভাবে মারলেন ক্যানো ?'

মেয়েটার নির্লজ্জ গ্রাম্যতায় বিরক্ত হলেন সত্যপ্রসাদ। বললেন—'পথ ছাড়ো ! তাছাড়া, একথা তুমি কেন বলছো সৌরভী ? একটা মানুষ জলে ডুবে মরছে, চোখে দেখেও তাকে বাঁচাব না ?'

—'নাঃ, বাঁচাবেন না !'—একটা দীর্ঘশ্বাস ফু'সে উঠল সৌরভীর গলায়—'আমার মতো এট্টা কু-চরিত্তির মেয়েমান্‌ষির বা'চে থা'কে লাভ কি ? সবাই আমারে ঘেন্না করে। কেউ আমারে ভালো বাসে না। না,—কেউ না, কেউ না ! পারবেন, আপনি আমারে ভালো বাস্‌তি পারবেন ?'

কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক রেখেই সত্যপ্রসাদ বললেন—'আমি তো তোমাদের সবাইকেই ভালোবাসি। তোমাকেও ভালবাসি বইকি সৌরভী !'

সৌরভী চোখ দু'টো বুজে অস্বাভাবিক চাপা উত্তেজনায় মাথা নাড়তে নাড়তে বলল—'না, না, না—বলেন, আপনি শুধু আমারে,—শুধু আমারেই ভালোবাসেন। সেই কথাডাই আজ আমারে ব'লে যান !'—

সত্যপ্রসাদ সৌরভীর সেই অপ্রকৃতিস্থ চেহারার দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটির এই অসঙ্গত আচরণের কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না। ও যে মৃগীরোগগ্রস্তা—যতীনের কাছে তা শুনেছেন। ওর এই অস্বাভাবিক আচরণ কি সেই রোগজনিত কোনো বিকার—না অন্য কিছু ! সত্যপ্রসাদ ক্ষুব্ধ, বিরক্ত বোধ করলেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর সংযত রেখেই বললেন—"পাগলামী ক'রোনা, বাড়ী যাও সৌরভী !"

দ্রুত পাশ কাটিয়ে সত্যপ্রসাদ কৈলাসের বাড়ীর দিকে রওনা হলেন।

বিশ্বকর্মা পূজার দিন দুপুরের দিকে কৈলাসের বাইচের নৌকা ছোন্দার-খাল অভিমুখে রওনা দিলো। ভৈরব নদের একটা বাঁকের মুখে সুপ্রশস্ত ছোন্দার-খাল গিয়ে নদীতে মিশেছে। এখন ভরা বর্ষাকালে চারিদিক জলে পরিপূর্ণ। এখানেই নদীর জলে বাইচ খেলা হবে।

বাছা বাছা সব জোয়ান ছেলেদের হাতে বৈঠা দেওয়া হয়েছে। হাল ধরেছে শ্রীপতি। এ-কাজে ওর হাত পাকা। নবীন সতীশ দুই ভাইও বৈঠা হাতে নৌকায় উঠল। কৈলাস আর সত্যপ্রসাদকে এবার আর নেওয়া হ'লো না। সত্যপ্রসাদকে নেবার জন্য জলধর এবং আরো অনেকে বায়না ধরেছিল। কিন্তু কৈলাসই নিষেধ করল। এতো শুধু বাইচ-খেলা নয়, যে কোনো সময়েই এ-খেলা মরণ-খেলা হয়ে উঠতে পারে। বৃদ্ধ বা দুর্বল ব্যক্তিদের এখানে না যাওয়াই ভালো। সত্যপ্রসাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে! কৈলাসের নৌকার বাচেনরা অবশ্য তৈরী হয়েই যাচ্ছে। জোয়ান ছেলেগুলোর প্রত্যেকের হাতেই পোক্ত শাল-কাঠের বৈঠা। মারা-মারি লাগলে ওগুলো ঘুরিয়ে কাজে লাগাতে একটুও বেগ পেতে হবে না। তাছাড়া, বেনাখালি গ্রামের রঘুরাম সরদার আর তার দলের পাঁচ ছয়জন শাগরেদকেও খবর দিয়ে আনা হয়েছে। ওরা বৈঠা ধরবে না। নৌকার খোলে রামদা আর সড়কি মজুত রেখে চট দিয়ে ঢাকা দেওয়া থাকবে। তেমন প্রয়োজন হ'লে ওগুলো হাতে নিয়ে ওরা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধ'রে লাফিয়ে উঠবে। বাঁকপুর গ্রামের গণেশ লেঠেল-ও তার পাকা বাঁশের লাঠিখানা নৌকার খোলে পেতে ব'সে রয়েছে। সব দিক দিয়েই প্রস্তুতি শেষ। গতকাল রাত্রে যথারীতি গগন ঢং-ও এসে হাজির হয়েছে। গগনের সাজ-পোশাক আজ সত্যিই দেখার মতো। একেবারে লালে লাল। মাথায় লাল পাগড়ি। লাল আলখাল্লা। লাল বসন। টকটকে আলতা মেখে হাতের তালু, পায়ের তলাও লাল করেছে। কপালে পরেছে মস্ত একটা লাল সিঁদুরের টিপ। 'জয়—বিশ্‌করম ঠাকুরের জয়'—ব'লে সবাই জয়ধ্বনি দিয়ে নৌকা ছেড়ে দিলো। কৈলাস-গিন্নী—'ঠাউর, তুমি থানে ব'সে কানে শোনো—সকলেরে ভালোয় ভালোয় ফিরেয় আনো'—ব'লে ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত মানল। ঘাটে দাঁড়ানো পাড়ার সমবেত মেয়ে-বউরা উলুধ্বনি দিয়ে উঠল।

বিলের বিস্তীর্ণ জলরাশি ভেদ ক'রে মৃদু মৃদু বৈঠার টানে শাণিত ফলকের মতো সেই দীর্ঘাকৃতি বাইচের নৌকা সামনে এগিয়ে চলল। সামনের ও পিছনের গলুই ডগডগে সিঁদুর দিয়ে লেপা। সামনের গলুইয়ে দাঁড়িয়ে জলধর বৈঠার টানে টানে ঝাঁজ বাজানো শুরু করল। নৌকার মাঝখানে দাঁড়াল গগন। তার সেই বিচিত্র লাঠিখানার মাঝখানটা ধ'রে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, বৈঠা টানের তালে তালে গান ধরল—

আয়না দেবো চেরোন দেবো
দেবো ধানের সরা—
জামাই গা—তোলো রে—
জামাই গা—তোলো রে—।
আগা নৌকো আগে চলে
পাছা নৌকো পাছে,
ভালোমানুষির পুত রে জামাই
নৌকোতে হও বা'চে।
নৌকো চলে—চলেরে—

বা'চে হেলেরে—দোলেরে—
মটুক মাথায় দিয়ে জামাই
গা—তোলোরে—
জামাই গা—তোলোরে—।

ছোন্দার-খালের কাছে গিয়ে ওরা দেখল, লোকে লোকারণ্য। নদীর দুই উঁচু পাড় ধ'রে যতদূর চোখ যায়, শুধু লোক আর লোক। নদীর পাড় বরাবর বিলের জলেও শত শত নৌকা। কোনো নৌকায় রীতিমত দোকান-পাট বসে গেছে। কেনা-বেচা চলছে। ছোন্দার-খালের একেবারে মুখে বিলের জলে খান তিনেক সুসজ্জিত বৃহদাকার ভাওয়াইয়া নৌকা। মাঝের নৌকাখানার সামনের গুরোয় খাড়াভাবে পোঁতা একটা দীর্ঘাকৃতি বংশখণ্ড। তার মাথায় ঝুলছে নতুন গামছায় বাঁধা একটি সুদৃশ্য পিতলের কলসী, আর কালো সুতোয় বাঁধা দু'টো বড়ো বড়ো রুপোর মেডেল। সেগুলোতে সূর্যের আলো প'ড়ে চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করছে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী নৌকাকে পুরস্কার দেওয়া হবে এগুলি। বোঝা গেলো, ঐ তিনখানা হচ্ছে কর্মকর্তাদের নৌকা। ওরা এগিয়ে গেলো। দর্শকদের ছোটো ছোটো নৌকাগুলোর পাশ কাটিয়ে নদীর জলে পড়তেই ওদের সামনে ভেসে উঠল সারিসারি দীর্ঘাকৃতি অনেকগুলো নৌকা। সেদিকে তাকিয়ে সকলেরই বুকের মধ্যে যেন একটু কেঁপে উঠল। সবাই হাত বাড়িয়ে নদীর জল তুলে ভক্তিভরে বুকে মাথায় ঠেকালো।

নদীর জলে নৌকা পড়তেই নৌকা তীব্রভাবে দুলে উঠল। নদীতে এখন প্রবল স্রোতের টান। নৌকা সামলে ওরা আস্তে আস্তে গিয়ে বাইচের নৌকাগুলোর পাশে নিজেদের নৌকাখানা দাঁড় করালো। ওদের খানা নিয়ে মোট নৌকা হ'লো দশখানা। এতোগুলো নৌকা হ'লে হবে কি। লোকজনের নজর কিন্তু দু'খানা নৌকার দিকেই। একখানা রয়েছে মাঝখানে। আর একখানা রয়েছে একেবারে ঐ পাশে। মাঝেরখানা হ'লো তুলোরামপুরের। লোকে বলে, ওটা আসলে নড়ালের জমিদারবাবুদের নৌকা। পিছন থেকে ওঁরাই সব ব্যবস্থাপত্র করেন। গতবারের প্রতিযোগিতায় এই নৌকাখানাই জয়ী হয়েছিল। আর, একটুর জন্যে হেরে গিয়েছিল ওপাশের নৌকাখানা। ওখানা হ'লো মীরপুরের মুসলমানদের। ও নৌকার বাচেনদের সকলেরই গাট্টা-গোট্টা চেহারা। মুখে কালো চাপ দাড়ি। দু'খানা নৌকারই মাঝখানে চুপচাপ ব'সে আছে দশ বারোজন ক'রে লোক। এদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়—এরা কারা। ওদের পায়ের নিচে নৌকার খোলে রয়েছে চট-ঢাকা রামদা আর সড়কি। যমদূতের মতো ওদের এক একটার দিকে তাকালেই যেন বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে।

দৌড় শুরু হবে এখান থেকে আড়াই মাইল দূরে মুলিয়ার বাঁক থেকে। টান শেষ হবে এসে ছোন্দার খালে কর্মকর্তাদের পাশে নির্দিষ্ট স্থানে। দশখানা নৌকা আগুপিছু হয়ে একে একে চ'লে গেলো প্রথম দৌড় শুরু হবার নির্দিষ্ট জায়গায়। সেখানেও কর্মকর্তাদের লোক রয়েছে। নৌকাগুলো নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। সঙ্কেত-ধ্বনি বাজতেই টান শুরু হয়ে গেলো। মাইলখানেক যাবার

পরই দেখা গেলো, একে একে অন্য নৌকাগুলো পিছিয়ে পড়ছে। একেবারে সামনে রয়েছে তুলোরামপুর আর মীরপুরের নৌকা। কখনো এ-খানা আগে যাচ্ছে, কখনো ও-খানা। তার কিছু পরেই কৈলাসের নৌকা। কৈলাসের নৌকায় হাল ধ'রে আছে শ্রীপতি। নৌকার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তার হাতে। সে হঠাৎ বাচেনদের দ্রুত লয়ে বৈঠা টানার সঙ্কেত দিয়ে বসল। নৌকার গতি দ্রুত হ'লো। নৌকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গগন বাচেনদের উৎসাহ দিচ্ছিল। সে বুঝল, সর্বনাশ হতে যাচ্ছে। দু'পাশের সারিবদ্ধ বাচেনদের মাঝখানের সঙ্কীর্ণ জায়গাটুকু দিয়ে একছুটে চলে গেলো পিছনে শ্রীপতির কাছে। ধমক লাগাল গগন—'ও ছিরিপতি-ভাই, এ করলেডা কি ?'

শ্রীপতি শক্ত হাতে হাল ধ'রে রেখে বলল—'কি হলো ?'

গগন তেমনি গনগনে গলায় বলল—'মরতি চাও নাকি ছিরিপতিভাই ? ও দুই নৌকোর ম্যাড়াগুলো ক্যামোন কুঁদ্‌তিছে দ্যাখোনি ? এ সময় ওদের মধ্যি গেলি সব কয়ডার লাশ এই গাঙের তলায় থুয়ে যাতি হবে, তা জানো ?'—

কথা যথার্থ। শ্রীপতি হুঁশিয়ার হ'লো। নৌকার গতি কমানোর সঙ্কেত দিলো। তবে আগের দু'খানা নৌকার ঠিক পিছন পিছনই এগোতে থাকল। মাইল খানেক চলল এইভাবে। শেষের আধ মাইলে এসে প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে উঠল। তীরবেগে ছুটে চলেছে মীরপুর আর তুলোরামপুরের নৌকা। নদীর দু'পাশের লোকজন মুহুর্মুহু উৎসাহ-ধ্বনি দিচ্ছে। প্রতিযোগিতার শেষ সীমারেখায় পৌঁছাতে যখন আর প্রায় দুশো গজ মতো বাকী, তখন দেখা গেলো, তুলোরামপুরের নৌকা ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে এগোচ্ছে। আর ক্রমেই মীরপুরের নৌকা পিছনে পড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেলো, মীরপুরের নৌকার মাথাটা ঘুরে গেলো এবং সোজা উঠে গেলো তুলোরামপুরের নৌকার মাঝ বরাবর। তীব্র গতিশীল সেই নৌকার আড়াআড়ি চাপে তুলোরামপুরের নৌকা জলে ডুবে গেলো। মুহূর্তে সড়কিবাজেরা রামদা আর সড়কি নিয়ে মেতে উঠল। তুলোরামপুরের নৌকা ডুবে যাওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই ওরা একটু কাহিল হয়ে পড়ল। কিন্তু ওরই মধ্যে ওরাও ঝাঁপাঝাঁপি ক'রে মীরপুরের নৌকায় উঠতে চেষ্টা করতে লাগল। এক নিমেষেই লোকজনের চীৎকার আর আর্তনাদে জায়গাটি যেন নরকে পরিণত হ'লো।

এতক্ষণ একটুখানি পিছিয়ে ছিলো কৈলাসের নৌকা। সামনে ঐ ঘটনা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সামনে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হ'লো। প্রচণ্ড একটি হুঙ্কার ছেড়ে গগন ঢং চীৎকার ক'রে উঠল—'বাপের কিরে, চালা ভাইসব এবার— ।'

নিমেষের মধ্যে তুলোরামপুর আর মীরপুরের নৌকা দু'খানাকে পিছনে ফেলে কৈলাসের নৌকা সামনে এগিয়ে গেলো। মীরপুরের নৌকার লোকেরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ওদের দিকে ক্ষিপ্র হাতে সড়কি ছুড়তে লাগল। মাথার উপর দিয়ে উড়ে এসে পড়তে লাগল সাঁই সাঁই ক'রে সড়কির ঝাঁক। কৈলাসের নৌকায় রঘুরাম, গণেশ আর তার লোকজনেরাও তৈরী ছিলো। ওরা কেউ সড়কি ছুড়ল না। শুধু মীরপুরের নৌকা থেকে উড়ে আসা সড়কিগুলোকে নিজেদের

সড়কির বাড়ি মেরে মেরে নদীর জলে ফেলে দিতে লাগল।

হঠাৎ দুম্ দুম্ ক'রে তিন চারটে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ হ'লো! প্রতিযোগিতার কর্মকর্তাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দু'সম্প্রদায়েরই লোক ছিলো। গোলমালের আশঙ্কা ক'রে তারা আগেই থানার বড়ো দারোগাবাবুকে খবর দিয়ে রেখেছিল। দারোগাবাবু আট দশ জন সশস্ত্র কনেস্টবল নিয়ে পান্‌সি নৌকায় গোপনে বসে ছিলেন। এবার সময়মতো তাঁরা আত্মপ্রকাশ করলেন। বন্দুকের শব্দ শুনে এবং পুলিশ দেখে দু'পক্ষের দাঙ্গাবাজরাই সংযত হ'লো। ওদিকে নিপুণ হাতের বৈঠার টানে কৈলাসের নৌকার সামনের গলুই তখন প্রতিযোগিতার সীমান্তরেখা ফুঁড়ে বিজয়-গর্বে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

দুই পাড় ঘিরে উত্তেজিত জনতার সোল্লাস জয়ধ্বনি ফেটে পড়ল।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হ'লো। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। যতই সময় যেতে লাগল, কৈলাসের অস্থিরতা তত বাড়তে লাগল। পাগলের মতো অস্থিরভাবে ঘর-বার শুরু হ'লো। ভালোয় ভালোয় সবাই নৌকা নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত চিন্তার শেষ নেই। কোথা থেকে কী হয়, বলা তো যায় না।

স্কুলের ছুটির পর যতীনের সঙ্গে কাশীনাথ আর শ্যামাপদ এসেছিল। কৈলাস এবং সত্যপ্রসাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প-গুজব ক'রে ওরা চলে গেছে। রাত্রে এখানে স্কুলের সব মাস্টারদের খাবার নেমন্তন্ন ক'রে দিয়েছে কৈলাস। নৌকা জিতুক, হারুক—সেটা পরের কথা। বাড়ীতে আজ বাচেনরা পঞ্চান্ন ষাট জন লোক খাবে—মাস্টারদের কি বাদ দেওয়া যায় নাকি! এখানে কারো বাড়ীতে কোনো বড়ো কাজকর্ম হ'লে স্কুলের শিক্ষকদের নেমন্তন্ন অবধারিত।

যতীনরা চলে যাবার পর সত্যপ্রসাদ খুব নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলেন। কিছু একটা পড়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মন বসল না। কোনো কাজেই যেন আজ আর মন বসছে না। একবার ভিতর বাড়ীতে গিয়েছিলেন। চাঁপা, চাঁপার মা, বৌদি সবাই মিলে রান্নার যোগাড় করছে। বাচেনরা ফিরে এলেই তাদের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এতোগুলো লোকের রান্নার যোগাড় করা চারটিখানি কথা নয়? সত্যপ্রসাদ দেখলেন, রান্নাঘরের বারান্দার একপাশে ব'সে সৌরভী তরকারি কুটছে। সত্যপ্রসাদ মনে মনে একটু শঙ্কিত হলেন। যা মুখ আলগা মেয়েটার! লোকজনের মধ্যে হঠাৎ কোনো অসংলগ্ন কথা না ব'লে বসে। সৌরভী কিন্তু সত্যপ্রসাদকে দেখে কোনো কথা বলল না। বরং উল্টোদিকে ঘুরে ব'সে মুখ নিচু ক'রে কাজ ক'রে যেতে থাকল।

কৈলাস-গিন্নী সৌরভীকে খবর দিয়ে আনিয়েছিল। মেয়েটার যত দোষই থাকুক না কেন, এমন দুই হাত উজাড় ক'রে কাজ করতে পারে যে, প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। একবার শুধু খবর দেবার অপেক্ষা। তারপরে সব দায়িত্ব যেন ওর। আপন পর ভেদাভেদ নেই। সৌরভী এসে দাঁড়াতেই চাঁপার মা শুধু একবার বলেছিল—'দেখিস্ মা সৌরভী, এতোগুলো লোক খাবে। যেন কোনো মোন্দো ছোন্দো না হয়।'—সৌরভী কাপড়ের আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে

বলেছিল—'তুমি কিছু ভা'বে না জ্যেঠি। হাতে-বিতি সবাই কাজ তুলে ফেলবানি।'— এবং সত্যিই তাই। মেয়েটা এসেই সেই যে কাজে হাত দিয়েছে, তার আর কোনো বিরাম নেই।

এদিক ওদিক একটু ঘুরে ফিরে এসে সত্যপ্রসাদ চুপচাপ শুয়ে থাকলেন। সামনের দিকে চোখ পড়ল। যে জায়গাটা জুড়ে বাইচের নৌকাখানা এতোদিন শোয়ানো ছিল, এখন তা শূন্য। মিস্ত্রীদের কাজকর্মে, কাঠ পেটানোর শব্দে, জায়গাটা এতোদিন মুখর হয়ে ছিলো। এখন যেন কেমন একটা বোঁদা বোঁদা শূন্যতা সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে। মাথার মধ্যে আকাশ-পাতাল নানা ভাবনা এলোমেলো ঘুরে বেড়ায় সত্যপ্রসাদের। ভবিষ্যতের কোনো ছবিই সেখানে নির্দিষ্ট আকার নিয়ে রূপ পরিগ্রহ করেনা। —হঠাৎ মা-র কথা মনে পড়ল। ছেলের বিয়ে দেওয়া নিয়ে আদেশ অনুরোধ কান্নাকাটি—কোনো কিছু করতেই মা একসময় বাকী রাখেননি। অবশেষে বুঝেছেন—ওটা হবার নয়। তাই ওসব প্রসঙ্গ এখন আর সত্যপ্রসাদের কাছে তোলেন না। কয়েকদিন আগে মা-র একটা চিঠি এসেছে। চিঠি পড়লেই বোঝা যায়, নায়েবকাকা এবং এখানকার কিছু জোতদার-শ্রেণীর লোক গিয়ে তাঁদের বাড়ীতে সত্যপ্রসাদের নামে কিছু কথাবার্তা ব'লে এসেছে। তারই প্রতিক্রিয়া মার এই চিঠি। নানা কথার শেষে মা লিখেছেন— "বাবা সত্য, তোমাকে লইয়া আমার গর্বও যতখানি, দুশ্চিন্তাও ততখানি। তোমার বাবা তোমার জন্য খুবই অশান্তিতে আছেন। কিন্তু আমি জানি, তোমার দ্বারা কখনো কোনো অন্যায় কার্য হইবে না। ঈশ্বরের কাছে সর্বদাই তোমার কল্যাণ কামনা করি। পরিশেষে একটা কথা জানাই। শুনিলাম, তুমি ওখানে নীচুজাতির চাষীদের বাড়ীতে থাকিয়া তাহাদের অন্ন খাইতেছ। আমার নিজের কোনো সংস্কার নাই। তবে, বুঝিতেই তো পারো বাবা, সমাজের দশজনকে লইয়া আমাদের থাকিতে হয়। তাই বলি, কখনো কাহারো সহিত দেখা হইলে বলিও যে, তুমি স্বপাকে খাও।—অবশেষে তোমাকে আর একটা কথা জানাই। একথা আগেও বহুবার বলিয়াছি। কিন্তু আমার কথা শোনো নাই। তোমার পথ তুমি নিজেই বাছিয়া লইয়াছ। আমি আর কয়দিন আছি বলো। কিন্তু যাইবার আগে আমারও তো ইচ্ছা করে—তোমাকে সংসারী দেখিয়া যাইতে। তুমি কি এইভাবেই তোমার জীবন কাটাইয়া দিবে? আমাকেই তুমি অপরাধী করিয়া রাখিলে।"—

মার চিঠির কথাগুলো মনে প'ড়ে মৃদু বিষণ্ণ হাসি খেলে গেলো সত্যপ্রসাদের মুখে। মাকে তাঁর এই কনিষ্ঠ পুত্রটির জন্য বিরূপ আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিন্দাবাদ শুনতে হয়। মা যথাসাধ্য তার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সত্যপ্রসাদ জানেন, তার এই বাউণ্ডুলেপনা, ছোটজাত চাষীদের মধ্যে থেকে তাদের অন্নগ্রহণ করা—এটাকে মা নিজেও সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না। আজন্মের সংস্কার কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। মার জন্য দুঃখবোধ করেন সত্যপ্রসাদ। কিন্তু কী-ই বা তাঁর করার আছে! মার চিঠির শেষ পংক্তিটা মনে ক'রে কিছুটা কৌতুক বোধ করেন সত্যপ্রসাদ। মা তাহলে এখনো আশা ছাড়েননি। এখনো তাকে সংসারী বানানোর স্বপ্ন দেখেন। সত্যপ্রসাদ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কোথাও তার বিন্দুমাত্র কোনো সম্ভাবনা

অনুভব করেন না। কিন্তু তবু এই মুহূর্তে সারা মনজুড়ে হঠাৎ যেন কী এক বিষণ্নতা ছড়িয়ে পড়ে। এই নিঃসঙ্গ বিকেলের কর্মহীন অবসরে ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি মনের মধ্যে নীরবে রক্তক্ষরণ ঘটাতে থাকে।—বছর আঠারো বয়স তখন তাঁর। কলকাতার বাসা থেকে মাঝে মাঝে বাড়ী আসতেন। একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'ত। সুন্দরী। সুলক্ষণা। মেয়েটিকে বড়ো ভালো লাগত। সত্যপ্রসাদের সেই ভালো লাগাটুকু সংক্রামিত হয়েছিল জবার মধ্যেও। তাঁদের বাড়ীর বাঁধা পুরুতের মা-বাপ মরা ভাগ্নী জবা। মা-ও মেয়েটিকে বেশ পছন্দ করতেন। কিছুদিনের ব্যবধানে সত্যপ্রসাদ একবার বাড়ী এসে দেখলেন, মেয়েটি নেই। পরে সব ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলেন। পুরুতমশায় সত্যপ্রসাদের বাবার কাছে জবার সঙ্গে সত্য-প্রসাদের বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিলেন। দরিদ্র পুরোহিতের এই স্পর্ধায় বৈকুণ্ঠ মুখার্জীর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু শুধু বাবা নয়, মা-ও ব্যাপারটা সমর্থন করেননি। নিঃশব্দে তাঁরা মেয়েটিকে সরিয়ে দিয়ে-ছিলেন। অবশ্য একেবারে অবিচার করেননি। নিজেরা খরচ-পত্র দিয়ে কোথাকার কোন্ গ্রামে এক পুরুত পরিবারেই মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম যৌবনের সেই ভালো-লাগাটুকুর অকাল-সমাপ্তির পর সত্যপ্রসাদের অন্তর্মুখী মন আরো অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছিল। এর পরে বাবা একটার পর একটা সম্বন্ধ এনে-ছিলেন। কিন্তু সত্যপ্রসাদ নিঃশব্দে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ নিয়ে অশান্তিও হয়েছিল খানিকটা। কিন্তু সত্যপ্রসাদ মাথা নোয়াননি। বই আর রাজনীতির জগতে নিজের সব ভাবনাচিন্তাকে সরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু মা ব্যাপারটা ভুলতে পারেননি। সেই থেকে তাঁর মনে একটা অপরাধবোধের কাঁটা বিঁধে আছে। সুযোগ পেলেই সত্যপ্রসাদকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সত্যপ্রসাদ সংসার-জীবনের দিকে আর যেন কোনো আকর্ষণই বোধ করেন না। বরং এইসব বঞ্চিত শোষিত মানুষের দুঃখকষ্টের শরিক হয়েই যেন জীবনের সার্থকতার পথ খুঁজে পেয়েছেন। —কিন্তু তবু যেন এই মুহূর্তে কেমন আনমনা হয়ে যান সত্যপ্রসাদ। মার চিঠিকে কেন্দ্র ক'রে সেই সব পুরোনো দিনগুলোই মনের মধ্যে ভেসে ভেসে উঠতে লাগল। জবার সেই সুন্দর লাবণ্য-ভরা মুখখানা এই উদাস নির্জনতায় বড়ো মায়াবী এক স্বপ্ন রচনা ক'রে যেন তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে চাইল।

রাত্রি যখন আরো একটু বাড়ল, তখন সত্যি সত্যিই সকলে দুশ্চিন্তায় পড়ল। মেয়েদের রান্না-বান্না মোটামুটি শেষ। তারাও উৎকণ্ঠিত। কৈলাস, পাড়ার আরো কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি, যতীন, কাশীনাথ, শ্যামাপদ সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে ব'সে সম্ভাব্য নানা বিপদের কথা বলাবলি করছে। সত্যপ্রসাদও মাঝে মাঝে দু'একটা মন্তব্য করছেন।

হঠাৎ দূর থেকে সমবেত উচ্চকণ্ঠের সঙ্গীত-ধ্বনি ভেসে এলো। সবাই হন্তদন্ত হয়ে ঘাটে এসে দাঁড়াল। ভাসন্ত বিলের দিগন্তে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিগুলো আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। বিলের জল কাঁপিয়ে ওদিকে

ধেয়ে আসছে কৈলাসের বা'চের নৌকা। বৈঠার পাতা দিয়ে জল টানছে বাচেনরা, আবার বৈঠা ঘুরিয়ে তালে তালে বৈঠার হাতল দিয়ে নৌকার ডালিতে ঘা মারছে। আর সেই তালে তাল রেখে গগন ঢং গান ধরেছে—

'জয় দাওলো রামের মা
তোমার গোপাল আইছে ঘরে,
ধান-দুব্বো দিয়ে সবাই
বরণ করো তারে।'—

রাত কম হয়নি। কিন্তু গোটা পাড়া যেন ভেঙে পড়ল কৈলাসের উঠোনে। সকলেই আনন্দে বিহ্বল। আজকের জয় তো শুধু কৈলাসের একার নয়। এই অভাবনীয় বিজয়ে গোটা গ্রামটাই আজ গৌরবান্বিত। উচ্ছ্বসিত আনন্দের হুলাহুলি কোলাকুলিতে উৎসবের পরিবেশ রচিত হ'লো। বালকের মতো ধেই ধেই ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগল কৈলাস। উঠোনের মাঝখানে বড়ো একখানা জলচৌকির উপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিজয়-পুরস্কার পিতলের কলসী আর রূপোর মেডেল দু'টোকে। ধান-দুর্বো দিয়ে সেগুলো বরণ করল পাড়ার মেয়েরা।

নবীন সতীশ আর জলধর ফিরে এসেই রান্নার জায়গায় ছুটল। এতোগুলো লোকের খাওয়া-দাওয়া! সবাইকে পংক্তি-ভোজে বসিয়ে দিয়ে ওরা ছুটোছুটি ক'রে পরিবেশন করল। দশভুজার মতো খাটতে লাগল সৌরভী। নির্বিঘ্নে সকলের ভোজন-পর্ব সমাধা হ'লো। এবার খেতে বসল নবীন সতীশ জলধর আর কৈলাস। খেতে খেতে জলধর বলল—'বুঝলে নবীনদা, সড়কিগুলো যখন মাথার উপর দিয়ে সাঁই সাঁই ক'রে উড়তিছিলো, তখন পরাণডার মধ্যি কী যে করতিলো। একেবারে ধুকুৎ-পুকুৎ করতিছিলো! দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে ঝাঁজ বাজাচ্ছিলাম। না'ড়ে-গুলোর সড়কি ছোড়া দেখে শুয়ে পড়লাম নৌকোর খোলে। তা, এখন দেখ্‌তিছি, উল্টে আমাদেরও দুই একখানা ছুড়লি মন্দ হ'তো না!'

নবীন হেসে বলল—'তুই তো চা'পে ধরলি চিঁহি করিস, ছা'ড়ে দিলি লম্ফো মারিস। তুই তখন সড়কি ছুড়বি, না নৌকোর খোলে ঢুকবি! আর এখন দেখি মুখে খই ফুট্‌তিছে।'

ওদের কথাবার্তা শুনে কৈলাস হা হা ক'রে হাসতে থাকে।

জলধর একটু চুপ্‌সে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে আবার বলে,—'তা, যাই কও নবীনদা, আজ মনে খুব জোর পালাম। এট্টা কথা আজ বুঝতি পারলাম, মনে জোর রা'খে কোনো কাজে হাত দিলি, সে কাজ হবেই। মনের জোরডাই আসল জোর!'

এবার আর জলধরের কথায় কেউ উপহাস করল না। তার কথাটাকে যে সবাই মনে মনে তারিফ করল, সেটা বোঝা গেলো।

খাওয়ার পরে সকলের শেষে রান্নাঘরের পাশে আঁচাতে গেলো জলধর। হাতে জল ঢেলে দিচ্ছিল চাঁপা। খুশীর উচ্ছ্বাসে ওর মুখখানাও ঝলমল করছে। জলধরের এ'টো হাতে জল ঢালতে ঢালতে বলল—'কি গো বড়ো বা'চেন, তোমারে কেউ এট্টা মেডেল দেলো না?'

জলধর বলে—'ক্যান্? আমি কার কোন্ বড়ো কুটুম হ'লাম যে, আমারে এট্টা

আলাদা মেডেল দিতি হবে ?'

—'তবে আর তুমি ক্যামোন বা'চেন হ'লে, যে এট্টা আলাদা মেডেল পাও না ?' —খোঁচা মেরে কথা বলে চাঁপা।

মুখ হাত ধুয়ে জলধর বলল—'তা, তুই-ই দেনা এট্টা মেডেল, দেখি ক্যামোন পারিস্ ?'

চাঁপা হাতের ঘটিটা মাটিতে রেখে বলল—'হ্যা, দেবোই তো ?'

আঁচলের ফাঁক থেকে চাঁপা বের ক'রে আনল—নানারকম ফুল দিয়ে গাঁথা একটা মালা। সকাল বেলায় নৌকা সাজানোর জন্য যে সব মালা গাঁথা হয়েছিল, তারই একটা লুকিয়ে রেখেছিল। দুই হাতে মালাটা ধ'রে ডিঙি মেরে দাঁড়াল। মালাটা জলধরের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলল—'এই নাও আমার মেডেল, পছন্দ হইছে তো ?'

এই মুহূর্তে জলধর করণীয় কিছু খুঁজে না পেয়ে হঠাৎ দুই হাতে জড়িয়ে ধরে চাঁপাকে। চাঁপা এক পলক নিশ্চিন্ত আত্মসমর্পণে জলধরের বুকের উপর নিজেকে বিন্যস্ত রাখে। পর-মুহূর্তে জলধরকে মৃদু একটা ঠেলা দিয়ে বলে—'আঃ, ছাড়োনা ! কেডা কোন্‌খানে দেখবে, আমার লজ্জা করেনা বুঝি !'

জলধর ওকে ছেড়ে দেয়। ধীর-পায়ে চাঁপা চলে যায়। এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চের পুলকিত আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জলধর।

সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বেশ রাত্রি হ'লো। যাদের একেবারে না গেলে নয়, তারা বাড়ী চলে গেলো। বাকীরা যে যেখানে পারল, সেখানেই শুয়ে পড়ল। ঘর, বারান্দা, উঠোন—কোনো জায়গাই বাদ গেলো না। সারা দিনের পরিশ্রমে সকলেই ক্লান্ত। ঘুমে নেতিয়ে পড়ল সবাই।

কুহকিনী রাত নিরিবিলি নির্ভাবনায় অকাতরে গড়িয়ে যায়। সারা চরাচরে জীবকুল নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়। এমন রাতে কে জাগে ? যোগী জাগে। ভোগী জাগে। একজন চায় পরমকে। আর একজন চায় চরমকে। আরো একজন কেউ জাগে। এক না-পাওয়াকে পাবার দুরাশায় তার আর্ত হৃদয় জাগর-রাত্রির বুকে মাথা কোটে।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসেনি সত্যপ্রসাদের। শুয়ে শুয়ে খালি এ-পাশ ও-পাশ করেছিলেন। ধীরে ধীরে কখন চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে এসেছিল। তারপর একসময় সত্যপ্রসাদও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সময়ের ডানায় ভর দিয়ে রাত্রি উড়ে চলেছিল গভীর থেকে আরো গভীরে। ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে গেলেন সত্যপ্রসাদ। কিন্তু কিসের ভারে তাঁর পা দু'খানা যেন স্থির অনড় হয়ে রয়েছে। ঘুমের ঘোরেই চমকে ওঠেন। অজানা-আশঙ্কার ঝাপটা লাগে মনে। ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে চীৎকার করতে যান। কিন্তু একটি নির্বাক বিস্ময় তাঁর কণ্ঠস্বরকে নিথর ক'রে রাখে।

সত্যপ্রসাদের চঞ্চলতায় তাঁর পায়ের উপর থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঠে দাঁড়ায় একটি উদ্‌ভ্রান্ত আত্ম-নিবেদন। তারপর সেই ছায়ামূর্তিটি সতর্ক চোখে চারিদিক একবার দেখে নিয়ে চকিতে নিঃশব্দে সরে যায়। সত্যপ্রসাদ পায়ের

উপর হাত বুলান। অবিরল অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে তাঁর পা দু'খানি পিছল হয়ে রয়েছে।

ভেবে পান না সত্যপ্রসাদ, দুর্গম পথ-যাত্রায় তাঁর এই পিছল পা দু'খানি তাঁকে কতদূর নিয়ে যেতে পারবে!

॥ দশ ॥

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বিলভাসানের বুকের উপর দিয়ে আশ্বিন কার্তিক দু'টো মাস পার হয়ে গেলো। এই দু'মাসে বিলভাসানের গ্রামগুলোতে চোখে পড়ার মতো তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। জলে জলময় এখন চারিদিক। ক্ষেত-খামারের কাজ নেই। ভাসন্ত জলে মেছুড়েদের মহা স্ফূর্তি। মাছও এখন অঢেল। দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র ক'রে ঘরে ঘরে ক'দিন উৎসবের বন্যা বইল। বাঁকপুর গ্রামের স্কুলের মাঠে দশ বারোখানা গ্রাম মিলে দুর্গাপূজা হ'লো। শ্বশুর-বাড়ী থেকে মেয়েরা কয়েক-দিনের জন্য ঘোমটা খুলে বাপের বাড়ী এলো। উৎসবের দিনগুলো শেষ হয়ে যেতেই আবার সেই নিস্তরঙ্গ, একঘেয়ে দিন। যতীনের স্কুল যথারীতি চলে। সত্যপ্রসাদের সান্ধ্য বৈঠকে গাঁয়ের চাষীরা এসে প্রতিদিন নিয়মিত জমা হয়। কখনো সংখ্যা কমে। কখনো বাড়ে। নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়। আলোচনা হয়, গান বাজনা চলে। ধীরে ধীরে ওরাও নানা বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে দু'একজন বক্তৃতার ভঙ্গীতে সকলের উদ্দেশে দু'চার কথা বলেও। একটা নতুন চেতনার শিকড় ধীরে ধীরে ওদের ভাবনার গভীরে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।

এরই মধ্যে যতীনের স্কুলে একদিন ছোটোখাটো একটা উৎসবও হয়ে গেলো। ১৩৫০ সালে সারা বাংলা জুড়ে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার ত্রাণের জন্য নানা জায়গায় ফুড-কমিটি স্থাপিত হয়েছিল। সেই ফুড-কমিটির মাধ্যমে বিলভাসানেও ঐ-সময় কিছু কিছু কাপড়, কেরোসিন এবং রেঙ্গুনের চাল এসেছিল। রেশন-কার্ড ক'রে সেগুলি বিতরণ করা হয়েছিল। এখন আর সে-সব ফুড-কমিটির কোনো কাজ নেই। একদিন হঠাৎ সেই ফুড কমিটির তরফ থেকে প্রায় আধ মন চিনি পাঠানো হ'লো বাঁকপুর স্কুলের ঠিকানায়। ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এই উপলক্ষেই ছোটোখাটো একটা উৎসব হয়ে গেলো। বিলভাসানের গ্রামগুলোতে গুড় ছাড়া আর কোনো মিষ্টির ব্যবহার নেই। চিনির নাম শুনেছে। কিন্তু কখনো চোখে দেখেনি। ছোটো ছেলেমেয়েরা তো বটেই, বয়স্কদেরও অনেকেরই চিনি বা তার ব্যবহার সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই। চিনি আসা উপলক্ষে স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হ'লো। ছাত্রছাত্রীরা বাড়ীতে গিয়ে থালা বা বাটিতে ক'রে চিঁড়ে নিয়ে এলো। কারণ, শুধু শুধু চিনি খেলে নাকি পেটে পোকা হয়। যে সব ছাত্র-ছাত্রী চিঁড়ে যোগাড় করতে পারল না, অন্যেরা তাদের ধার দিলো। ছাত্রছাত্রীরা

সবাই সামনে থালা বাটি সাজিয়ে লাইন ক'রে ব'সে গেলো। দেখা গেলো, বেশ কিছু বয়স্ক অভিভাবকও ওদের সঙ্গে লাইনে ব'সে গেছে। মহা উৎসাহে সকলের মধ্যে চিনি বিতরণ করা হ'লো। সব মিলিয়ে বেশ খানিকটা আনন্দে কাটল।

অগ্রহায়ণ মাস পড়তেই চারিদিকে কর্মচাঞ্চল্য শুরু হ'লো। বিলভাসানের ক্ষেতগুলোতে এখন পাকা ফসলের সমারোহ। রাশি রাশি সুফলা আমন ধান। সেগুলোকে এখন কেটেকুটে ঝাড়াই-বাছাই ক'রে ঘরে তোলার পালা। কিন্তু এই অঢেল প্রাচুর্যের মধ্যেও বিলভাসানের শত শত চাষীর বুকে দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে লাগল। নিজেরা হাল-বলদ যুগিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রাণান্ত ক'রে যে সব বর্গাদার বা ভাগচাষী মাঠে মাঠে এই সোনার ফসল ফলিয়েছে, তার কত-টুকুই বা আজ তাদের ঘরে উঠবে! জমির মালিক জোতদার ফসলের আধাভাগ তো নেবেই, তার পরেও রয়েছে গদি-সেলামী, ঈশ্বরবৃত্তি, পার্বণী, ছেলে-পড়ানী, মাছ-খাওয়ানো, কয়ালি, খোলেন-ঝাড়ানী—হরেক রকমের আবওয়াব, সেলামী। জোতদারের সব খাঁই মিটিয়ে বর্গাদার চাষীর ঘরে যে লবডঙ্কা, সেই লবডঙ্কা।

শীতের মুখের এই ভরা-ফসলের মরসুমে ধারালো কাস্তের পোঁচে বিলভাসানের চাষীর হাতের মুঠোয় উঠে আসে রাশি রাশি ধানের গোছা। কিন্তু ফসল প্রাপ্তির পূর্ণতায় বর্গা-চাষীর বুক উদ্বেল হয়ে উঠতে পারে না। ফসলকাটা রিক্ত মাঠের শূন্যতার মতো সে বুক বঞ্চনার যন্ত্রণায় হাহাকার করে। নিষ্ফল ক্ষোভে একে অপরের মুখের দিকে তাকায়। সেই বোবা দৃষ্টিতে একটিই শুধু জিজ্ঞাসা,—এ দুঃখের কি কোনোদিনই অবসান হবে না?

শীতের মুখে রাস্তাঘাট শুকিয়ে উঠতেই বিলভাসান অঞ্চলে শুরু হ'লো এক ভিন্নতর কর্ম-চঞ্চলতা। মাঝে মাঝেই বাইরে থেকে শহুরে ভদ্রলোকদের আনাগোনা ঘটতে লাগল। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা'—নামে 'কৃষকসভা' হ'লেও তার সদস্যরা ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা। তাঁদের রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে এতদিন তাত্ত্বিক দিকটাই ছিল প্রধান। কিন্তু এখন থেকে তাঁদের কর্মপ্রয়াস গ্রামাঞ্চলের চাষীদের মধ্যে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল। সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা'র সদস্যরা বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়লেন। ন্যায্য অধিকারের দাবিতে চাষীদের সংঘবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানালেন। ১৯৪০-এ 'কৃষকসভা' যশোহর জেলার পাঁজিয়ার ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলনে সর্বপ্রথম তেভাগার ডাক দেয়। ঐ সম্মেলনে সংগ্রামী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়—"ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ পাইবার দাবি লইয়া চাষীরা আজই সংঘবদ্ধ হইয়া প্রবল সংগ্রাম শুরু করিয়া দিন।" —১৯৪৬-এ খুলনার মৌভোগ সম্মেলনে 'কৃষকসভা'র নেতৃত্বের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হ'লেও এ-বছরের মাঝামাঝি থেকে বাংলার গ্রামে গ্রামে চাষীদের মধ্যে তেভাগার ডাক স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধধ্বনিতে পরিণত হ'লো।

তেভাগা-আন্দোলন মূলতঃ বর্গাচাষীদের স্বার্থ-রক্ষার আন্দোলন হ'লেও তাতে সমস্ত শ্রেণীর কৃষকই অংশগ্রহণ করতে শুরু করল। আশু অর্থনৈতিক দাবিতে তেভাগা আন্দোলন শুরু হ'লেও ধীরে ধীরে তা গ্রামের দরিদ্র চাষীদের মধ্যে একটি

বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাল। দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলন ও টংক আন্দোলন একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হ'লো। পুলিশের আশ্রয়পুষ্ট জোতদারদের সঙ্গে বিরোধে সে আন্দোলন ক্রমেই সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হতে লাগল। 'কৃষকসভার' শহুরে শিক্ষিত নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে গ্রামের চাষীদের আন্তরিক সংযোগে তেভাগাকে কেন্দ্র ক'রে একটি বৃহত্তর আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল।

এই আন্দোলনের ঢেউ এসে এবার আছড়ে পড়া শুরু হ'লো বিলভাসানেও। বহিরাগত নেতাদের প্রায়শঃ আগমনে, তাঁদের মুখে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের কৃষক-সংগ্রামের জীবন্ত তথ্য-চিত্রের বর্ণনায়, এবং সংগঠিত কর্ম-সূচীর মাধ্যমে সোচ্চার আন্দোলনের উত্তেজক আহ্বানে বিলভাসানের কৃষি-কেন্দ্রিক জনজীবন ক্রমশঃ বিক্ষুব্ধ, আন্দোলিত হয়ে উঠতে লাগল।

সত্যপ্রসাদের সান্ধ্য-বৈঠক এখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত গড়িয়ে চলে। বিলভাসানের চাষীদেরই এখন প্রচণ্ড খাটুনি। ক্ষেতে ক্ষেতে ধান-কাটার কাজ। সে ধান খোলেনে তোলা, মলন-মলা, ঝাড়াই-বাছাই—কাজের কি এখন আর অন্ত আছে! কিন্তু সব কাজের মধ্যেও সত্যপ্রসাদের সান্ধ্য-বৈঠকে উপস্থিত হওয়া সকলের কাছে একটি জরুরী অত্যাবশ্যকীয় কাজে পরিণত হয়েছে। প্রথমে কয়েকজন কৃষককে নিয়ে সত্যপ্রসাদ 'কৃষক-সমিতি' স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেলো, উপস্থিতির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আশেপাশের দশ-এগারোখানা গ্রাম থেকেও দলে দলে চাষীরা আসছে। স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে 'কৃষক সমিতি'র সভ্য হচ্ছে। উপস্থিতির সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাওয়াতে এখন আর কারো বাড়ীতে বৈঠক বসানো সম্ভব হচ্ছে না। বাঁকপুর স্কুলের বিস্তীর্ণ মাঠটাই এখন স্থান-সঙ্কুলানের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সে সভায় এখন প্রায়ই নতুন নতুন নেতার মুখ দেখা যাচ্ছে। আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁরা সমবেত শ্রোতাদের ব্যাখ্যা ক'রে শোনাচ্ছেন।

এলেন আবদুল কাদের সায়েব, আবদুল হকসায়েব, নুটু মিত্র, অমূল্যধন রায়, রসিক বিশ্বাস। কাদের সায়েব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর এম. এ.। ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন উপেক্ষা ক'রে কৃষক-সংগ্রামের শরিক হয়েছেন। অতি সাধারণ বেশভূষা। চমৎকার আড়-বাঁশী বাজান। স্বভাবটি আরো মিষ্টি। গল্পের মতো ক'রে সুন্দর বক্তৃতা করেন। চাষীরা ওঁর কথা মুগ্ধ হয়ে শোনে। হকসায়েব, নুটু মিত্র—এঁরা দুজনে যেন দুই জীবন্ত প্রেরণা। একজন হলেন স্বচ্ছল ধনী হাজীসায়েবের ছেলে। আর একজন হলেন নড়াইলের বিশিষ্ট অর্থবান জোতদার-বাড়ীর একমাত্র বংশধর। বংশ-গৌরব, অর্থ-কৌলিন্য, বিলাসবৈভব সব কিছুই অবহেলায় পিছনে ফেলে এঁরা পথে নেমে এসেছেন। অমূল্যধন রায়, রসিক বিশ্বাস—যশোহরের কোর্টে উকিল হিসেবে এঁদের প্রচণ্ড পসার। কিন্তু আইন ব্যবসায়ের স্বচ্ছল জীবনের মোহ এঁদেরও ঘরে আটকে রাখতে পারেনি। বাংলার কৃষক-কুলের দুর্দশার অবসান এখন তাঁদের একমাত্র কাম্য। এসব নেতা মাঝে মাঝেই বিলভাসানে এসে আলাপ-আলোচনা বক্তৃতার মধ্য দিয়ে

কৃষকদের উজ্জীবিত ক'রে তুলতে লাগলেন।

'কৃষকসভা'র বিশিষ্ট নেতা কৃষ্ণবিনোদ রায় এবং মনসুর হবিব এখন কৃষক-সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সফর ক'রে বেড়াচ্ছেন। শোনা যাচ্ছে, বিলভাসানের কৃষক-আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করতে শীঘ্রই তাঁরা এ-অঞ্চলে একবার আসতে পারেন। ফলে চারিদিকে একটা সাজ-সাজ রব প'ড়ে গেছে। সত্যপ্রসাদও তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন বিলভাসানের চাষীদের নিয়ে একটি সুষ্ঠু নিয়মতান্ত্রিক শক্তিশালী কৃষক-সংগঠন গড়ে তোলার জন্য।

এরই মধ্যে একজন তরুণ নেতা এসে বিলভাসানের চাষীদের একেবারে মাতিয়ে দিয়ে গেলেন। নাম—নিখিল রায়। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স। নেতৃত্ব দেবার সমস্ত গুণই যেন ওঁর মধ্যে বর্তমান। যেমন বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, তেমনিই সপ্রতিভ চেহারা। কথা-বার্তায় যেন আগুন ছড়াচ্ছে। নিখিল রায়ের ব্যক্তি-পরিচয় কিছুই জানা যায় না। কিন্তু যেখানেই কৃষক-আন্দোলন, সেখানেই তিনি ঘূর্ণি ঝড়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সম্প্রতি কিছুদিন কাটিয়ে এলেন দিনাজপুরের কৃষকদের জঙ্গী আন্দোলনের পুরোভাগে। সেই সব অভিজ্ঞতার কথা, প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা—নিখিল রায় অগ্নিক্ষরা ভাষায় তাঁর বক্তৃতার মধ্যে তুলে ধরলেন।

বিলভাসানের চাষীরা, বিশেষ ক'রে যারা তরুণ, তারা নিখিল রায়ের এই চমকপ্রদ উত্তেজক বক্তব্যে ভীষণভাবে আকৃষ্ট হ'লো। জলধর, জগেন, বাঘা এবং ওদের বয়সী তরুণ চাষীরা নিখিলের একান্ত বশম্বদ হয়ে উঠল। কোনো একটা কিছু করার জন্য একটা হিংস্র মরিয়া ভাব তাদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। নিখিল রায়ের কথায় তারা যেন প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। অতি-উৎসাহী এই তরুণ নেতাটির আচরণ সত্যপ্রসাদ সমর্থনও করতে পারলেন না, আবার তাকে নিরস্তও করতে পারলেন না। ফলে, মনের মধ্যে অস্বস্তি জমা হয়ে উঠল। বিলভাসানে পাঁচ ছয় দিন থেকেই নিখিল অন্য কোথাও চলে গেলেন। যাবার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন, অতি সত্বর আবার বিলভাসানে ফিরে আসবেন। নিখিল চলে গেলেও, তাঁর উত্তেজক বক্তৃতায় যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল, তা ক্রমশঃই বিল-ভাসানের গ্রামে গ্রামে চাষীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যেতে থাকল।

এই সঙ্গে একটা নতুন জিনিস দেখা গেলো। তা হ'লো, লেখাপড়া শেখার আগ্রহ। গ্রামে গ্রামে নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হ'লো। অল্পবয়সী চাষীদের সঙ্গে বয়স্ক চাষীরাও সেখানে ভিড় করল। মোটামুটি অক্ষর-পরিচয় লাভ ঘটল সেখানে অনেকেরই।

বিকেলের দিকে ফুলমতির বারান্দায় পাড়ার মহিলাদের একটা জটলা বসেছিল। সংখ্যায় জন কুড়ি বাইশ হবে। প্রায় সকলের কোলেই একটা দু'টো ক'রে এণ্ডিগেণ্ডি। চ্যাঁ—ভ্যাঁ—লেগেই আছে। এটা থামছে তো ওটা কাঁদছে। অল্প-পরিসর বারান্দায় বাচ্চা-কাচ্চা সমেত এতগুলো মহিলার স্থান-সঙ্কুলান কঠিন হ'লো। ফলে জায়গা-দখল নিয়ে প্রথমে কথাকাটাকাটি, তারপর ঝগড়া এবং পরিশেষে ধাক্কাধাক্কি শুরু হ'লো। একপাশে কোণের দিকে বসেছিলেন

সুচেতা বসু। বছর পঁয়তাল্লিশের রোগাটে চেহারা। কিছুটা সন্ত্রস্ত, কিছুটা কৌতূহলী চোখে ওদের কোন্দল দেখছিলেন।

সুচেতা বসু আজ দিন পাঁচেক হ'লো বিলভাসানে এসেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী। বিভিন্ন স্থানে মহিলা-সমিতি গ'ড়ে তুলতে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পার্টির নির্দেশেই বিলভাসান অঞ্চলে মহিলা-সমিতি গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। রেল-স্টেশন এখান থেকে মাইল সাতেক দূর। ট্রেন থেকে নেমে লোকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে একা একাই চলে এসেছিলেন বাঁকপুর গ্রামে। গ্রামে ঢোকার মুখে একটি বছর দশ এগারোর ছেলেকে দেখে কাছে ডাকলেন। হাতের টিনের সুটকেশটায় সামান্য কিছু জামা-কাপড়, লেখার সরঞ্জাম, এবং খানকতক বই। তারই ভারে হাত যেন ছিঁড়ে পড়ছে। এতখানি রাস্তা টানা হেঁটে আসা। শীতের দিনেও সুচেতার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। বেশ জল-তেষ্টা পেয়েছে। ছেলেটাকে ডাকতেই সপ্রতিভ ভঙ্গীতে কাছে এসে দাঁড়াল। সুচেতা জিজ্ঞাসা করলেন—'কি নাম তোমার ?'

—'আজ্ঞে, শ্রী বিষাণ কুমার দাস।'

—'বিষাণ ? বেশ নামটি তো তোমার ! আচ্ছা বিষাণ, আমাকে একগ্লাস জল খাওয়াতে পারো ?'—ক্লান্ত গলায় বলেছিলেন সুচেতা।

—'তা পারব না কেন ? আসেন না আমার সঙ্গে। এই তো সামনেই আমাদের বাড়ী।'—ব'লেই বিষাণ সামনের দিকে পা বাড়াল। কয়েক পা এগিয়েই কী ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—'ওটা দেন আমারে।'

সুচেতা একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। কিন্তু বিষাণ হাত বাড়িয়ে বলল—'দেন না আমারে। কিছু হবে না।'

সুচেতা একটু হেসে বললেন—'ঠিক আছে, নাও।'—বিষাণ ওঁর হাতের সুটকেশটা নিয়ে হাঁটা শুরু করল।

বাড়ীতে এসে বিষাণ ওদের ছোটো ঘরখানার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকবার 'মা—মা' ব'লে ডাকল। কিন্তু মা'র সাড়া না পেয়ে ঘর থেকে একটা মাদুর এনে বারান্দায় বিছিয়ে দিয়ে বলল—'আপনি বসেন।'

তারপর নিজেই রান্নাঘর থেকে ঘষা-মাজা একটা পরিষ্কার কাঁসার গ্লাসে জল এনে সুচেতার সামনে দাঁড়াল।

সুচেতা হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিয়ে এক চুমুকে জলটুকু শেষ ক'রে ফেললেন। মুখে একটা পরিতৃপ্তির শব্দ হ'লো।

সুচেতা বললেন—'বাঃ, বেশ ছেলে তুমি।—তা, লেখাপড়া কিছু করো নাকি ?'

—'আজ্ঞে, আমাদের গ্রামের স্কুল বাঁকপুর জুনিয়ার হাইস্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ি।'—বিষাণ এবার একটু লাজুক হেসে বলল—'আজ্ঞে, আমি বরাবর ক্লাসে ফাস্ট হই।'

শ্যামলা রঙের ঈষৎ দুর্বল চেহারার মেধাবী এই ছেলেটির কথা-বার্তায় মুগ্ধ হলেন সুচেতা। হেসে বললেন—'বাঃ, ভেরি গুড্ বয় !'

বিষাণের মা ফুলমতি পাড়ায় কোথায় বেরিয়েছিল। খবর পেয়েই ছুটতে

ছুটতে হাজির হ'লো। বছর চল্লিশ বয়স। পরিশ্রমী চেহারা। বছর পাঁচেক হ'লো স্বামী মারা গেছে। এখন মা ছেলের সংসার। অচেনা একটি শহুরে মহিলাকে দেখে ফুলমতি বিস্মিত হ'লো। কিছু ঠাহর করতে না পেরে একবার বিষাণের, আর একবার সুচেতার মুখের দিকে তাকায়।

বিষাণ সুচেতাকে বলে—'আমার মা।' —সুচেতা ঈষৎ হাত জোড় করার ভঙ্গী ক'রে বলল—'আমি কিন্তু ভাই তোমার বাড়ীতে অতিথি। ছেলে আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে।'

সুচেতার কথার সহজ ভঙ্গীতে ফুলমতিরও সঙ্কোচের ভাবটা কেটে গেলো। বলল—'ছেলে মাসীরে ডা'কে আনিছে, সে তো ভালো কাজ করিছে দিদি! আর, অতিথের কথা কি বল্‌তিছেন! আপনার মতন মানুষির পায়ের ধুলো আমার ঘরে পড়িছে, সে তো আমার ভাগ্যি দিদি!'

সংবাদ পেয়েই সত্যপ্রসাদ যতীনকে সঙ্গে ক'রে ছুটে এলেন। 'কৃষক সভা'র অফিস থেকে সুচেতার আসার বিষয়ে সত্যপ্রসাদকে আগেই চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল। 'কৃষক সভা'র মাধ্যমে দু'জনেই দু'জনার কাছে নামে পরিচিত। সত্যপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন—'কোনো অসুবিধা হয়নি তো, সুচেতাদি?'

সুচেতা বললেন—'না ভাই।'

বিকেলের দিকে সত্যপ্রসাদ সকলের সঙ্গে সুচেতার পরিচয় করিয়ে দিলেন। এ-অঞ্চলের সাম্প্রতিক কৃষক-আন্দোলনের চেহারা সম্পর্কেও সুচেতাকে মোটামুটি একটা আভাস দিলেন। সুচেতার খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক হ'লো যতীনের বাড়ী। কিন্তু বিষাণ এবং তার মার একান্ত অনুরোধে থাকার ব্যবস্থা হ'লো বিষাণদের বাড়ী। সুচেতাও তাতে সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন।

সুচেতা খুব বেশীদিন এ-অঞ্চলে থাকতে পারবেন না। কিন্তু যাবার আগে মহিলা-সমিতির মোটামুটি একটি সংগঠন এখানে দাঁড় করিয়ে যেতে চান। পার্টি থেকে সে-রকমই নির্দেশ আছে। ফুলমতির বাড়ীতে সুচেতা ঘরোয়া মিটিং-এর আয়োজন ক'রেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিন মাত্র কয়েকজন এলো। দ্বিতীয় দিনেও প্রায় একই অবস্থা। বাধ্য হয়ে সরমা এবং ফুলমতি সুচেতাকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ায় প্রচারে বের হয়েছিল। ফলে আজ মহিলাদের সমাগম কিছু বেশী। এবং অনিবার্যভাবে ফুলমতির অল্প-পরিসর বারান্দাটুকুতে স্থানাভাব-হেতু কোন্দলটা বেশ জমে উঠল। ফুলমতি এবং সুচেতা বার কয়েক ওদের থামানোর চেষ্টা ক'রে বিফল হয়ে বসে রইলেন।

একজন বলল—'আমি আগে আ'সে জায়গা রাখিছি। তুই আমার মাইয়েডারে ঢ্যাক্কা মা'রে ফেলে দিলি ক্যানো লো?'—প্রতিপক্ষের চুলের গোছা তখন ওর হাতের মুঠিতে।

প্রতিপক্ষও কম যায় না। সে উল্টো প্যাঁচে এর হাতখানা মুচড়ে ধ'রে বল্‌ল—'ওরে আমার জায়গা আউলি রে,—তোর কোন্ বাপের কোন্ জায়গা এডা?'

ঝগড়া-ঝাঁটি দেখে সৌরভী একপাশে স'রে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের মারামারি করতে দেখে এবার দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। দু'জনকে দু'দিকে ঠেলে

সরিয়ে দিয়ে বলল—'ও খুড়ী, তোমরা আরম্ভ করিছো কি কও দেখি ? এই করতি আইছো নাকি সব ?'

খুড়ী তখন তার প্রতিপক্ষকে ছেড়ে সৌরভীকে নিয়ে পড়ল। খরখরে গলায় বলল—'ওরে আমার রে ! আমার সাত-ভাতা'রে সাবিত্‌তিরি, তুই কহানে ছিলিরে এতোক্ষণ—'

ফলে পারস্পরিক কোন্দলটা ক্রমশঃই উচ্চগ্রামে উঠতে লাগল। সুচেতা অসহায়ের মতো এ-দিক ও-দিক তাকাতে লাগলেন। এ-রকম একটা পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনবার মতো কোনো কৌশল তাঁর জানা ছিল না।

হঠাৎ উঠোনের ও-প্রান্ত থেকে একটি গমগমে পরুষ মহিলা-কণ্ঠ ভেসে এলো—'কি রে ঢেম্‌নীরা, একেবারে যে মা'ছো হাট বানায়ে ফেলিছিস্। তোদের ঝগড়ার জ্বালায় যে বাড়ীর কাউও-চিল পলায়ে গ্যালো ? হইছে কি তোদের ?'

আচম্বিতে সমবেত কুন্দুলে মহিলাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হ'লো। পিছন থেকে একজন চীৎকার ক'রে উঠল—'ওরে মন্দা ফুলি আইছে রে—বাঁচিস্ তো চুপ কর্ সব।'

নিমেষেই অভাবনীয় পরিবর্তন। যে যেখানে পারল, মাটি আঁকড়ে ব'সে পড়ল।

অতঃপর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটল ফুলির। পরনে সাদা থান। বয়স চল্লিশ ছাড়িয়েছে বোঝা যায়। কিন্তু তার পরে যে আর কতদূর এগিয়েছে, অনুমান করা কঠিন। মেদহীন দীর্ঘ সুঠাম চেহারা। নিকষকালো গায়ের রং। সমস্ত শরীরে এমন একটি দার্ঢ্য প্রকাশ পাচ্ছে, যা কোনো শক্তিশালী পুরুষ-দেহের একান্ত উপযুক্ত। ফুলি সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুচেতার কাছে এসে বলল—'শোন্‌লাম নাকি কিসব মিটিন্ হচ্ছে, তাই দেখ্‌তি আস্‌লাম।'

সুচেতা যেন নিজের অজ্ঞাতেই উঠে দাঁড়ালেন। এই মহিলাটির আকস্মিক আবির্ভাব এবং সামগ্রিক পরিস্থিতিতে এ-রকম একটি অভাবনীয় পরিবর্তনে সুচেতার বিস্ময়-বোধ যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো। সুচেতা একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন—'তুমি—মানে—আপনি যদি মহিলা-সমিতির সভ্য হ'ন—'

কথার মাঝখানেই তাঁকে থামিয়ে দিলো ফুলি—'ফুলি সিঙ্গির সাথে ওসব আপনি-টাপনি কওয়া লাগবে না। 'তুমি' বলতি কি দোষ হ'লো ? তা, ওসব ভদ্দরতাই ছা'ড়ে আসল কথাখানা কও দেখি শুনি।'—

ফুলি বারান্দার এক পাশ ঘেঁষে বসল। সুচেতা সামান্য একটু ভেবে নিয়ে ঘরোয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে মহিলা-সমিতির সাংগঠনিক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। মিনিট কয়েক যাবার পরই ফুলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'তুমি বল্‌তি থাকেন, এরা সবাই শুনুক। আমি একবার ও-পাড়াডা ঘুরে আসি।'—

ফুলি প্রস্থান করল। বোঝা গেলো, একনাগাড়ে এতক্ষণ সভ্য-ভব্য হয়ে ব'সে থেকে বক্তৃতা হজম করার মতো ধৈর্য তার নেই।

ফুলি চলে যেতেই আবার সমবেত মহিলাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। সকলেরই আলোচনা ফুলিকে কেন্দ্র ক'রে। ঝগড়া-কোন্দল আর লাগল না বটে, কিন্তু

যেভাবে কথাবার্তা শুরু হ'লো, তাতে সুচেতার পক্ষে আর সভা চালানো সম্ভব হ'লো না। সুচেতা একটু হেসে ফুলমতিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মহিলাটি কে ?'

ফুলমতি বলল—'ওর নাম ফুলি। বিলতিতের পাল বাড়ীর মেয়ে। বাঘ-সিঙ্গির মতোন গায়ের জোর। লোকে তাই কয়—'ফুলি সিঙ্গি।' আড়ালে-আবডালে কয় 'মদ্দা ফুলি।' দ্যাখ্‌লেন না, ক্যামোন মদ্দা-মানষির মতোন চলন-ফেরন। তা, ফুলি সিঙ্গি মানুষটা খারাপ না। ছেলে কোলে নিয়ে বিধবা হইছিলো। তা, কেউ কোনো-দিন ওর নামে কোনো আকথা কু-কথা বল্‌তি পারেনি। ছেলে নিয়ে দেওরের সংসারে থাকে। সে ছেলেও এখন জোয়ান-মদ্দ হইছে। কারো বিপদ-আপদের কোনো কথা শুন্‌লি ফুলিসিঙ্গি সকলের আগে আগোয়ে যায়।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আজকের মতো সুচেতার মহিলা-সভার কাজ শেষ হ'লো।

ফুলমতির বাড়ী থেকে বেরিয়ে ফুলি গ্রামের মধ্যেকার বড়ো-রাস্তা ধ'রে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। ওর বাড়ী বাঁকপুরের ওপাশে বিলতিতে গ্রামে। ফুলি মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়ে। আশে-পাশের দশ বারোখানা গ্রাম ওর পায়ের তলায়। বাঁকপুর গ্রামে বেশ কিছুদিন আসা হয়নি। আজ এসেছে যখন, সারা গ্রামটা একবার চক্কর দিয়ে যাবার ইচ্ছে।

কৈলাস মাতব্বরের বাড়ীর সামনে গিয়ে দেখল, কৈলাসের 'খোলেনে' বেশ একটা জটলা। বিঘেখানেক সমতল জায়গা লেপে-পুঁছে পরিষ্কার ক'রে 'খোলেন' বানানো হয়েছে। কৈলাসের ক্ষেতের ধান কেটে এনে এখানেই পালা দিয়ে সাজানো হয়। মলন-ডলনের কাজও এখানে হয়। খোলেনের দুই পাশে দু'টো বড়ো বড়ো ধানের পালা। এখনো কুড়ি পঁচিশটা ধানের আঁটি ছড়ানো রয়েছে। দশ বারোজন কিষাণ কাজ করছে। সঙ্গে নবীন আর সতীশ। কৈলাস ঘুরে ফিরে তদারক করছে। আজকে কিষাণদের বেগার নেওয়া হয়েছে। এ বেগারের মধ্যে কোনো জোর-জুলুম নেই। নবীন-সতীশ এতদিন যাদের সঙ্গে গাতার-দলে কাজ করেছিল, তারাই আজ স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে কৈলাসের বাড়ী বেগার দিচ্ছে। গাতার দলের অন্য কারো বেগারের দরকার হ'লে তার বাড়ীতেও দেওয়া হবে। তবে বেগারে যেটা করতে হবে, সেটা হ'লো পেট-চুক্তি মাংস ভাত। কৈলাস-গিন্নীর হাতের হাঁসের মাংস রান্না বিখ্যাত। ফলে কৈলাসের বাড়ী বেগার-দেওয়া কিষাণদের কাছে পরম আকর্ষণীয়।

কিষাণদের নিয়ে নবীন আর সতীশ সারাদিন ক্ষেতে ধান কেটেছে। বিকেল হ'তে ধানের আঁটি বয়ে এনে খোলেনে জমা করেছে। তারপর সেই ধানের আঁটি পরপর সাজিয়ে বিরাট দু'টি স্তূপ বানিয়েছে। গম্বুজাকৃতি সেই বিশাল ধানের পালা প্রায় তিরিশ হাত উঁচু হয়েছে। আর সেই দুই পালার উপর দাঁড়িয়ে আছে দু'জন জোয়ান কিষাণ। পরপর ধানের আঁটি সাজাতে সাজাতে পালা যত উঁচু হয়ে গেছে, ওরাও তত উঁচুতে উঠে গেছে। নিচের কিষাণেরা এক একটা আঁটি ছুঁড়ে দিয়েছে, ওরা পালার উপর দাঁড়িয়ে একটার পর একটা আঁটি লুফে নিয়েছে। কিন্তু এইবারই নিচের কিষাণদের আসল শক্তি-পরীক্ষা। মাটিতে দাঁড়িয়ে

পাঁচশ-তিরিশ হাত উপরে ধানের পালার উপরে ভারী ধানের আঁটি ছুঁড়ে তুলে দেওয়া সোজা কথা নয়। বাহুতে রীতিমতো সামর্থ্য থাকা চাই। শক্তি-পরীক্ষা নিয়ে এ-সময় কিষাণদের মধ্যে বাজি ধরাধরি চলে। কৈলাসের খোলেনে এখন সেই পর্যায় চলছে। এখনো কুড়ি-পাঁচশটা আঁটি তুলতে বাকী। নিচের কিষাণগুলো গলদ্ঘর্ম হয়ে যাচ্ছে। ধানের আঁটি ছুঁড়ে দিচ্ছে, কিন্তু পালার শীর্ষস্থানে পৌঁছানোর অনেক আগেই পালার গায়ে ধাক্কা খেয়ে নিচে ছিটকে পড়ছে। আর সেই সুউচ্চ পালার উপর দাঁড়িয়ে ওখানকার দু'জন কিষাণ নিচের কিষাণদের ব্যঙ্গ করছে। কৈলাস, সত্যপ্রসাদ এবং পাড়ার আরো অনেকে একপাশে দাঁড়িয়ে কিষাণদের এই প্রতিযোগিতা দেখছে এবং মজা পাচ্ছে।

অবশেষে প্রবল বিক্রমে এগিয়ে এলো জলধর আর বাঘা। কিষাণদের মধ্যে ওরাই দু'জন অপেক্ষাকৃত কম-বয়সী। দু'জনের গায়েই বেমক্কা জোর। কিন্তু বার কয়েক চেষ্টা ক'রে ওরাও হার মানল।

সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ ব্যাপারটা দেখছিল ফুলি। হঠাৎ ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলো। জলধর আর বাঘাকে ধাক্কা দিয়ে দু'পাশে সরিয়ে দিয়ে বলল—'সরে যা ছ্যামড়ারা! ভাত খাস্—না ঘাসের বিচি খাস্?'

তারপর ধানের পালার উপরের কিষাণ দু'টির দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল—'ধর তোরা ছ্যামড়ারা—সামলা—'

ব'লেই একটার পর একটা ধানের আঁটি অবলীলায় উপরের দিকে ছুঁড়তে শুরু করল। পর্যায়ক্রমে আঁটিগুলো গিয়ে পড়তে লাগল দুই পালার উপর। উপরের কিষাণ দু'টোর তখন প্রাণান্ত অবস্থা। আঁটি-গুলোকে ধ'রে ধ'রে সাজিয়ে রাখবে কি—তখন ওদের ধানের আঁটির নিচে চাপা প'ড়ে মরার মতো অবস্থা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই খোলেন পরিষ্কার হয়ে গেলো। সব ধানের আঁটি উঠে গেলো পালার উপরে।

ফুলির গায়ে মাথায় অনেকগুলো শুকনো খড় জড়িয়ে ছিল। সেগুলোকে ঝেড়ে ফেলে কৈলাসের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল—'কি মাতুব্বরদাদা, ক্যামোন আছো?'

কৈলাস হেসে বলল—'তোর মদ্দা-পানা আর গ্যালো না ফুলি! কি যে করিস! তা যাই কই, গায়ে তোর জোর আছে, এ-কথা মানতি হবে।'

সত্যপ্রসাদ কৈলাসের পাশে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে এই শক্তিমতী মহিলাটির ক্রিয়া-কলাপ দেখছিলেন। হঠাৎ ফুলির দৃষ্টি পড়ল ওঁর উপর। সত্যপ্রসাদকে একবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে বলল—'এই বুঝি সত্যবাবু!' —তারপর সত্যপ্রসাদের দিকে এগিয়ে নিঃসঙ্কোচে ওঁর কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে বলল—

—'তোমার কথা আমি অনেক শুনিছি ভাইডি! আমার ছেলে চন্দর আসে তোমার মিটিন্ শুন্‌তি। তা ভাইডি, তুমি তোমার কাজ চালায়ে যাও। তোমারে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি পারবা। এই সব মরা-মানুষগুলোর ধড়ে তুমি পরাণ ফিরোয়ে আনতি পারবা।'—ফুলির কর্কশ হেঁড়ে গলা আবেগে গম-গম করে।

অশিক্ষিতা গ্রাম্য এই রমণীটির এই কথাগুলো হয়ত সাময়িক আবেগের বশে

নিতান্তই কথা-প্রসঙ্গে বলা। কিন্তু অসীম শক্তিমতী মহিলাটির এই সরল বিশ্বাসের উক্তি শুনে নিজের অজান্তেই সত্যপ্রসাদের মাথা শ্রদ্ধায় আনত হ'লো।

কৈলাস বলল—'তা, তুই আছিস ক্যামোন ? অনেকদিন আসিস না এদিকি—'

ফুলির গলার স্বর হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। বলে—'আস্‌তি তো ইচ্ছে করে দাদা ! কিন্তু পারি কই ; সংসারের সাত ক্যাচালে জড়ায়ে থাকি। তা, তোমারে সাত্যি কথা কই মাতুব্বরদাদা, সংসারে আমার মন বসেনা। কেডা যেন আমারে সদা-সব্বোদা ডাকে আর কয়—ফুলি চলে আয়, ফুলি চলে আয়। কেডা আমারে এইভাবে ডাকে, ক'তি পারো দাদা !'

ফুলির কথায় কৈলাসের চোখেও বিষণ্ণতার ঘোর লাগে। কিন্তু একটু হেসে বলে—'ওসব কথা ছাড় দেখি। খালি তোর পাগ্‌লামি। আর শোন্। সময়-মতোন আসে যখন পড়িছিস, এট্টা কাজ কর। বাড়ী যা তোর বৌদির কাছে। আজ কিষেণরা সবাই বেগার খাবে। তুই বৌদির সাথে এট্টু হাতে-বিতি কাজ ক'রে দিগে। রাত্তিরে এখানেই খা'স্ দুডো। রাত্তিরে থাকতি চাস্, থাকিস। আর না থাকতি চাস্ তো খা'য়ে দা'য়ে চলে যাস্। এট্টু রাত হয়ে যাবে, তা ভয় করবে না তো তোর ?'

ফুলির কণ্ঠস্বরে আবার সেই আগের তেজ ফিরে আসে—'না দাদা, ভয় আমার করে না। ভয় করব কারে ? কেনই বা ভয় করব ? তা, তোমারে কই দাদা ! ভয় এট্টু মনে মনে করতাম গঙ্গাপদরে। গঙ্গাপদরে চিন্‌তি পারিছো ? আমার দ্যাওর গঙ্গাপদ— !'

কৈলাস মাথা নাড়ে। গঙ্গাপদকে অনেকদিন দেখেছে ক্ষেতে মাঠে কাজ করতে। পাড় জোয়ান ব'লে গঙ্গাপদর খ্যাতি আছে। অত্যন্ত ভোজন-পটু। কোন্ এক নেমন্তন্ন-বাড়ীতে নাকি পরিবেশনে একটু দেরি হয়েছিল। গঙ্গাপদ রেগে গিয়ে পরিবেশনকারীর হাতের ভাতের ধামা কেড়ে নিয়ে তার মধ্যে মাংসের বাল্‌তি উপুড় ক'রে ঢেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সবটা খেয়ে ফেলেছিল। আবার অন্য কোথায় কার সঙ্গে বাজি ধ'রে সের-খানেক করাত-কাটা কাঠের গুঁড়ো গুড় দিয়ে মেখে খেয়ে ফেলেছিল। এবং তা হজমও করেছিল। সুতরাং গঙ্গাপদর দৈহিক শক্তিও যে অসাধারণ হবে, তাতে আর সন্দেহ কি! সেই গঙ্গাপদ হচ্ছে ফুলির দেওর। গঙ্গাপদ ফুলির থেকে বয়সে অনেক ছোট। ফুলিই দেখে-শুনে গঙ্গাপদর বিয়ে দিয়েছে। ছেলেকে নিয়ে ফুলি গঙ্গাপদর সংসারে থাকে। গঙ্গাপদর সংসারই ফুলির সংসার।

ফুলি আগের কথার সূত্র ধ'রে বলে—'বুঝলে দাদা, ভয় কারো করলি ঐ গঙ্গারেই এট্টু করতাম। তা সেদিন ওডারেও এমন থাপ্পড় মারিলাম যে, ঘুরে কাত হয়ে পড়ে গিছিলো ?'

কৈলাস একটু ধমক দেয়—'তুই গঙ্গার গায়ে হাত তুললি—তোর তো সাহস কম না ?'

ফুলি কিন্তু ধমক খেয়ে দমল না। বলল—'হাঁ দাদা, মারলাম। রাগডা আমার চণ্ডাল। আর সে চণ্ডালডা ক্ষেপে গেলি আমার আর কিছু মানামানি থাকে না,—সে কথাডা ঠিক। তা, তুমি বিচের করো দাদা,—রাগডা কি আমার সাধে হয় ?'

কৈলাস বলে—'কি হইছিলো, তা তো ক'বি আগে!'

ফুলি বলে—'বুঝলে দাদা, গঙ্গা এমনিতে মানুষ ভালো। কিন্তু, কথা নেই বাত্তা নেই—বউডারে ধ'রে ধ'রে মারবে। এডা কি এট্টা মানুষির কাজ? তুই পুষ্যো (পুরুষ) মানুষ, তোর গায় জোর আছে। তা সে গা'র জোর কি তুই ফলাবি ঘরের মাইয়ে-মানুষ মা'রে? চোখের সামনে সেদিন দেখে আর সহ্য করতি পারলাম না। আমিও ক'ষে মারিছি এক থাপ্পড় গঙ্গারে। মার খাইয়ে গুম্ মা'রে রইছে। আমার সাথে কয়দিন কথা কয়না। তা, না কলি, আমার বয়ে গ্যালো।'

সে রাত্রে ফুলির আর বাড়ী ফেরা হ'লো না। খাওয়া-দাওয়ার পর কৈলাসের বাড়ীতেই থেকে গেলো। অনেক রাত পর্যন্ত সত্যপ্রসাদ এবং সুচেতা ফুলির সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বললেন। দুজনেই বুঝলেন, এই শক্তিমতী তেজী রমণীটিকে কাজে লাগাতে পারলে তাঁদের সংগঠনের একটা প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াবে। সংসারের নানা অশান্তিতে বিক্ষুব্ধ ফুলির অশান্ত হৃদয়েও যেন এ'দের সান্নিধ্যে একটি মুক্তির দরজা খুলে গেলো।

॥ এগার ॥

পৌষ মাসের মাঝামাঝি। বিলভাসানের ক্ষেতে আমন ধান কাটার কাজ প্রায় শেষ। কিষাণদের মাথায় মাথায় বা গোরুর গাড়ীতে ক'রে সে সব ধানের আঁটির বোঝা যার যার নিজস্ব খোলেনে জমা হচ্ছে। যে সব চাষীর নিজের জমি আছে, এবং নিজেরাই চাষ করেছে, তাদের ধান তাদের নিজেদের খোলেনেই উঠাচ্ছে। কিন্তু যারা বর্গাচাষী, তারা কাটা-ধান জোতদারের খোলেনে তুলতে বাধ্য হচ্ছে। সেটাই জোতদারের হুকুম। বিলভাসানের বেশীর ভাগ চাষীই কিছু না কিছু বর্গাচাষ করে। যাদের নিজস্ব জমি ব'লে কিছু নেই, তারা তো জোতদারের জমি বর্গায় চাষ করতে বাধ্য হয়ই। অন্য যে সব চাষীর নিজস্ব কিছু জমি আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার পরিমাণ এত অল্প যে, সংসারের মুখে অন্ন দিতে গেলে বর্গাচাষ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অবশ্য কিছু বর্গাচাষ করলেই যে সম্বৎসরের উদরান্নের সংস্থান হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। জোতদারের খোলেনে ধান তোলার পর জোতদারের নানাবিধ প্যাঁচ-পাকের পরে বর্গাচাষীর হাতে যে ফসল আসে, তার পরিমাণ অতি সামান্য।

বিলভাসানে কিছু জমি আছে, সেগুলো স্থানীয় জোতদারের নয়। এ'রা থাকেন নড়াইল, আফরা, বাসুন্দে, যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলে। এ'দের মধ্যে যেমন অগাধ বিষয়-সম্পত্তির মালিক ধনীরা আছেন, তেমনি সাধারণ মধ্যবিত্ত চাকুরি-জীবী উকিল মোক্তার শিক্ষক ব্যবসায়ীরাও আছেন। চাষের জমিতে টাকা খাটানো লাভজনক ভেবে এ'রা বিলভাসানে কিছু কিছু চাষের জমি কিনে স্থানীয় চাষীদের কাছে বর্গা দেন। এ'রা সবাই উচ্চবর্ণের। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ইত্যাদি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ'রা ধান কাটা হয়ে যাবার পর টানাটানির ঝামেলায় ক্ষেতে ফেলেই ধান ভাগ ক'রে ফেলেন এবং নিজে উপস্থিত থেকে বা লোক পাঠিয়ে নিজেদের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেন। আর রয়েছেন, ধনী জোতদারেরা।

ধান ভাগের ব্যাপারে বাবু-রা যেটা বলবেন, সেটাই বেদবাক্য। ভাগ-চাষীদের কোনো কথা সেখানে টি'কবে না। ধান ভাগ হয়ে যাবার পর বাবুর ভাগটা চাষীকেই বাবুর বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হয়। এ-নিয়ম দূরের জোতদার-দের ক্ষেত্রে। কিন্তু স্থানীয় জোতদারদের ক্ষেত্রে ক্ষেতের কাটা-ফসল সবই জোতদারদের খোলেনে তোলা একান্ত বাধ্যতামূলক। ভাগবাঁটোয়ারা হিসাব-নিকাশ সবই জোতদারের খোলেনে ব'সে হবে। বিলভাসানে স্থানীয় জোতদারের আওতার বর্গাচাষীর সংখ্যাই সর্বাধিক। এই জোতদারদের নিজস্ব প্রচুর জমি তো আছেই, দূরবর্তী জমিদার বা বড়ো জোতদারদের জমি ইজারা নিয়েও এরা বর্গাচাষ করায়। ধার-দেনার ফাঁদে জড়িয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে, কিম্বা মামলা-মকদ্দমার প্যাঁচ ক'ষে এসব জোতদার স্থানীয় ছোটো চাষীদের নিজস্ব সামান্য জমিটুকু কেড়ে নিতেও বেশ দক্ষ এবং এ-বিষয়ে সর্বদাই তৎপর।

মল্লিহাটির জোতদার পুলিন রায়ের খোলেনে ভাগচাষীরা কাটাধান এনে জমা করছিল। যে যার ধান আলাদা পালায় সাজিয়ে রাখছিল। সব ধান এনে জমা হবার পর ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে। চার পাঁচ দিন ধ'রে খোলেনে ধান এনে জমা করার কাজ চলছে। প্রায় একশ' মতো চাষী পুলিন রায়ের জমিতে বর্গাচাষ করে। সকলের ভাগে অবশ্য জমির পরিমাণ সমান নয়। বর্গাচাষের জন্য প্রাপ্ত জমির পরিমাণটা নির্ভর করে একান্তভাবে পুলিন রায়ের ব্যক্তিগত সন্তোষ বা অসন্তোষের উপর। পুলিন রায়ের স্তাবকতা ক'রে তার ফাই-ফরমাশ খাটতে পারলে, চাষের জন্য কিছু বেশী জমি পাওয়া যেতে পারে। আর একবার কু-নজরে পড়লে পুলিন পুরো জমিটুকু কেড়ে নিতেও দ্বিধা করে না। এ-ব্যবস্থা শুধু পুলিন রায়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, স্থানীয় অন্য সব জোতদারও এ-নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রে চলে।

হুঁকো হাতে পুলিন রায় সারা খোলেন ঘুরে ঘুরে চাষীদের আনা ধানের তদারক করছিল। কার ক্ষেতে কি রকম ফসল হয়েছে, সব তার নখ-দর্পণে। সুতরাং কারো কোনো রকম ফাঁকি দেবার উপায় নেই। ফসল কাটার মরসুমে পুলিনের দুই ছেলেও বাড়ীতে আসে। পুলিনের ছেলেরা নড়াইলের কাছে ওদের মামাবাড়ী বাঁশবেড়েয় থেকে পড়াশুনো করে। একজন কলেজে পড়ে, একজন স্কুলে। বড়ো মেয়ে দু'টির বিয়ে দিয়েছে। এখনো আরো দু'টি মেয়ে বিয়ে দিতে বাকী। পুলিনের বুড়ী মা এখনো বেঁচে। বাড়ীতে দুই দু'টো পাকাপাকি জোয়ান চাকর রাখা আছে। বাড়ীর গোরুবাছুর দেখাশোনা করা, তরি-তরকারি চাষ করা, ফলপাকুড় ফলানো, পুকুরে মাছের বন্দোবস্ত করা—এসব ওদের কাজ। বর্গাচাষীদের ক্ষেতে ঘুরে ঘুরে ফসলের খবরও ওরাই এনে দেয় পুলিনের কাছে। এসব ছাড়াও এদের কাজ হচ্ছে পুলিনের দেহরক্ষীর কাজ করা। দূরে কোথাও যেতে হ'লে পুলিন ওদের কারো একজনকে সঙ্গে না নিয়ে পথে বের হয় না। ভরা-ভরতি সংসার পুলিনের। চারিদিকে প্রাচুর্য উপচে পড়ছে। প্রচুর জমির মালিক। নিজেদেরও

চাষী পরিবার। কিন্তু পরিবারের কেউ কখনো ভুলেও এখন আর লাঙ্গলের মুঠি ধরে না। ধরতে হয়ত ভুলেই গেছে। কিন্তু নিজেরা লাঙ্গল না ধরলে কি হয়। বর্গাচাষীদের কাছ থেকে পাওনা-গণ্ডা আদায় ক'রেই যা পাওয়া যায়, তার পরিমাণও তো কম নয়। পুলিন এখন যশোহর, বাসুন্দে, নড়াইলের ভদ্রলোকদের মতো 'বাবু' হবার স্বপ্ন দেখছে।

পুলিন প্রত্যেকটি ধানের পালা তীক্ষ্ণ চোখে নজর ক'রে দেখছিল। মাঝে মাঝে তার দুই ছেলেও বাপের কাজে সাহায্য করছিল। চাষীরা ধানের পালা সাজিয়ে বিমর্ষ মুখে অপেক্ষা করছিল। জলধর, জগেন, বাঘা, ভরত, কণ্ঠীরাম, রণপতি ছাড়াও আশে-পাশের অন্যান্য গ্রামের বহু চাষীও রয়েছে। সকলেই এখানে বর্গাচাষী। এদের মধ্যে অনেকে আবার পুলিন রায় ছাড়াও বাঁকপুরের অনন্ত বিশ্বাস, বনখালির ভজন দাস, বিলতিতের বদন মণ্ডল বা অন্য জোতদারের জমিও বর্গা-চাষ করেছে।

পুলিনের খোলেনে ধান ভাগ হওয়া শুরু হতেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। পুলিনের দুই চাকর সব ধান আধা-ভাগ করল। তারপর সব অন্যান্য হিসেব। চাষের সময় কেউ কেউ বীজধানের অভাবে পুলিনের কাছ থেকে ধান কর্জ নিয়েছিল। কেউ কেউ বীজধান ছাড়াও খোরাকির ধানও কর্জ করেছিল। সেই ধান এখন চাষীদের শোধ দিতে হবে। সবই পুলিনের কাছে খাতায় লেখা রয়েছে। শোধ দেবার নিয়ম হ'লো, যে পরিমাণ ধান কর্জ নিয়েছিল, এখন তার দেড়া পরিমাণ শোধ দিতে হবে। এছাড়া, নানা রকমের সেলামীর আদায় তো আছেই। পুলিনের দুই যণ্ডামার্কা চাকর মোটামুটি একটা পরিমাণ হিসাব ক'রে চাষীদের ভাগের অংশ থেকে একটা একটা ক'রে ধানের আঁটি সরিয়ে নিয়ে আসতে লাগল। ভাগের এই হিসাবটা, বলা বাহুল্য, একেবারেই এক তরফা। পুলিন আর তার দুই ছেলে সমস্ত ব্যাপারটার উপর নজর রাখতে লাগল।

এদিকে চাষীদের ভাগের ধানের আঁটিগুলো যখন একটার পর একটা পুলিন রায়ের দখলে চলে যেতে লাগল—ওদের বুকের মধ্যে যেন ভেঙ্গে চুরে দুমড়ে যেতে থাকল। কিন্তু নিরুপায় ক্ষোভে শূন্যদৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে চোখের জল গোপন করতে চাইল।

হঠাৎ রণপতি পুলিনের কাছে এগিয়ে এসে ডাকল—'বাবু'—।

আড়ালে যাই বলুক, রণপতি এখন বুঝেছিল, কিছু সুবিধে পেতে গেলে পুলিনকে একটু তোষামোদ করা দরকার। 'বাবু' ডাকটা শুনলে পুলিনের মেজাজটা যে বেশ প্রসন্ন হয়ে ওঠে, সেটাও রণপতি জানে।

রণপতির অনুমানে ভুল হ'লো না। বয়স্ক রণপতির মুখে 'বাবু' সম্বোধন শুনে পুলিন এদিকে ফিরে দাঁড়াল। ঈষৎ তেরছা চোখে একটু কোমল-কণ্ঠে বলল—'কি রণপতি, কিছু বলবা নাকি ?'

রণপতি আশেপাশের চাষীদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল—'এইভাবে যদি ধান ভাগ করো বাবু, তাহলি তো আমাদের ভাগে আর কিছু থাকে না। তা, তুমি বাবু এট্টা ন্যায্য বিচের ক'রে ধান ভাগ করো।'

পুলিন যেন বিস্ময়ে একেবারে গাছের থেকে পড়ল—'তুমি কল্সতিছো কি রণপতি ? বাপ ঠাউর্দার আমল থেকে এইভাবে ধান ভাগ হয়ে আস্‌তিছে, আর এখন কি এট্টা নতুন নিয়ম কর্‌তি হবে নাকি ? তা, তোমার ন্যায্য বিচেরডা কি কও দেখি শুনি।'

জলধর একপাশে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসছিল। সে এবার চীৎকার ক'রে উঠল—'আমাদের তেভাগা দিতি হবে। আর, যে যা ধার-কজ্জো করিছে, সেইটুকুই শুধু নিতি হবে। তার এক আঁটি ধান তুমি বেশী নিতি পারবা না।'

জলধরের আশপাশ থেকে আরো অনেকে উত্তেজিত গলায় চীৎকার ক'রে উঠল—'জলধর ঠিক কথা কইছে। আমাদের তেভাগা দিতি হবে। আর ওইসব সেলামী-টেলামীর জন্যি ধান আদায় করতি পারবা না।'

পুলিন কিন্তু একটুও চটল না। যেন খুব একটা মজার কথা শুনেছে। একগাল হেসে বলল—'বেশ ভালো কথা কইছিস্ তোরা! আজ কচ্ছিস, সেলামী দেবো না—তেভাগা চাই, কাল বলবি—তোমার পুকুরডা চাই, পরশু বলবি—তোমার বাড়ীডা চাই। তা তোদেরই তো রাজত্বি দেখ্‌তিছি এখন।' —হঠাৎ পুলিনের ছোটো ছোটো ধূর্ত চোখে বিষাক্ত সাপের ক্রুর দৃষ্টি ঝলসে উঠল—'ব্যাটারা, তোদের বড়ো বাড় বাড়িছে দেখতিছি। এসব রোগের ওষুধ আমার জানা আছে। তোদের একটারেও আর সামনের বার জমির সীমানায় ঢুকতি দেবো না। তা, তোদের দলের নাটের গুরুডা কেডা ক' দেখি। এসব কলকাঠি নাড়তিছে কেডা ? ঐ বৈকুণ্ঠ মুখাজ্জির ছেলের কাজই এসব। বাওনের বাড়ী বলদ জন্মিছে এট্টা।'

বাঘা, জলধর, জগেন—সবাই ফুঁসে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু দেখা গেলো—ওদিকে পুলিনের সেই ষণ্ডামার্কা চাকর দু'টো দু'খানা পাকা বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে পুলিনের দু'পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

যে কোনো মুহূর্তে একটা মারামারি লেগে যেতে পারে। এবং তাতে রক্তারক্তি খুনোখুনি অনিবার্য। রণপতি তাড়াতাড়ি ওদের সামনে এগিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—'তোরা থাম্ সবাই, মাথা ঠাণ্ডা কর।'

পুলিন কড়া গলায় হুকুম দিলো—'আজকের মধ্যি যার যা ধান তুলে নিয়ে আমার খোলেন পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যাবি। কাল যদি কেউ ধানের আঁটিতে হাত দিতি আসবি তো, কারো মাথা আস্ত থাকবে না।'

অতঃপর সেই নিরুপায় অসহায় চাষী মানুষগুলো বাধ্য হয়ে তাদের ভাগের ভাগ যৎসামান্য ধানের আঁটিগুলো বোঝা বেঁধে বেঁধে নিজেদের বাড়ী বয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু করল।

ধূর্ত পুলিন রায় বুঝল, আজকের ঘটনাটা একটা বৃহত্তর ঘটনারই পূর্বাভাস। আকাশে যে মেঘ জমছে, এবং ঝড় যে উঠবেই, এটা তার বুঝতে বাকী রইল না। আগে থেকে সামাল না দিলে, বিপদ অনিবার্য। এবং একথা ঠিক যে, এটা একার কাজ নয়। সংঘবদ্ধভাবে এগোতে হবে। সুতরাং পুলিন কয়েক দিনের মধ্যেই অনন্ত, ভজন, বদন এবং স্থানীয় অন্যান্য জোতদারদের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

শোনা গেলো, পুলিনের খোলেনে যে ঘটনা ঘটেছে, ধান-ভাগের সময় ওদের খোলেনেও কমবেশী একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অর্থাৎ দুর্যোগের ঘনঘটা ক্রমশঃই চারিদিকে প্রবল আকারে ঘনিয়ে উঠছে।

সবাই সলা-পরামর্শ ক'রে একদিন অনন্ত বিশ্বাসের বাড়ী মিটিং ডাকা হ'লো। মিটিংটা একটু গোপনে রাতের দিকে হ'লো। স্থানীয় ওরা তো থাকলই, করিম-পুরের খালেদ মিয়া এবং নুরহাটের ইব্রাহিম খাঁকেও খবর দেওয়া হ'লো। ওদের স্থানীয় অঞ্চলে দু'জনেই বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। প্রচুর জমি-জোতের মালিক এবং সেগুলো মুসলমান চাষীদের দিয়ে বর্গায় চাষ করায়। দু'জনেই মুসলিম লীগের কট্টর সমর্থক। আজকাল শহর-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে গেলেই চোখে পড়ে, মুসলমানদের মধ্যে যেন সাজো-সাজো রব পড়ে গেছে। 'পাকিস্তান—হাসিল্ করো', 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'—এ ধরনের জিগির আজকাল প্রায়ই কানে আসে। মুসলিম লীগই এর প্রধান উদ্যোক্তা।

খালেদ মিয়া আর ইব্রাহিম খাঁকে সভায় ডাকা নিয়ে ভজন দাসের কিছুটা আপত্তি ছিল। কারণ, ভজন কংগ্রেসের সমর্থক। কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে ভজন যোগাযোগ রাখে। একটু-আধটু কাজকর্মও করে। সুতরাং তার পক্ষে মুসলিম লীগের লোকদের সঙ্গে একসঙ্গে ব'সে মিটিং করায় আপত্তি ছিল। কিন্তু অন্য সকলের প্রবল সমর্থনে ভজনের আপত্তি টিকল না। ওসব কংগ্রেস, মুসলিম লীগ—পরে দেখা যাবে। আপাততঃ যে গুরুতর সমস্যায় পড়া গেছে, সেটার সমাধানই আগে দরকার। এটাই সকলের অভিমত। সুতরাং পরম সমাদরের সঙ্গে খালেদ মিয়া এবং ইব্রাহিম খাঁর কাছে আমন্ত্রণ পাঠানো হ'লো। হিন্দু বাড়ীতে এ-রকম আমন্ত্রণ পেয়ে ওরাও বিশেষ আপ্যায়িত বোধ করল। সাজ-গোজ ক'রে দু'জনেই এলো ঘোড়ার পিঠে চেপে। দু'জনেরই বন্দুকের লাইসেন্স আছে। ঘোড়ার পিঠে জাজিমের সঙ্গে বন্দুক ঝুলিয়ে আনতে দু'জনেই ভুলল না।

এ অঞ্চলে হিন্দু বা মুসলমান দু' সম্প্রদায়ের লোকেরাই সাধারণতঃ কেউ কারো বাড়ীতে গিয়ে অন্ন গ্রহণ করে না। নিতান্তই অন্নগ্রহণের প্রয়োজন হ'লে রান্নার উপকরণাদি যোগাড় ক'রে দেওয়া হয়। রান্নাটা নিজেদের হাতেই ক'রে নিতে হয়। কিন্তু সম্মানিত মেহ্‌মানদের তো আর রান্না ক'রে খেতে বলা যায় না। তাই অনন্ত বিশ্বাসের বাড়ীতে খালেদ মিয়া আর ইব্রাহিম খাঁর জন্য অন্ন-পাকের ব্যবস্থা করা হ'লো না। কিন্তু জলযোগের আয়োজন করা হ'লো বিস্তর পরিমাণে।

যথারীতি আদাব-নমস্কারাদি বিনিময়ের পর অনন্তর বাইরের আটচালা বসবার ঘরে মিটিং শুরু হ'লো। কোনো দিক থেকে কোনো উটকো লোক যাতে এসে না পড়ে, সেজন্য পাহারাদারেরও ব্যবস্থা থাকল। পুলিন ওদের কাছে একে একে বিলভাসানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিবৃত করল। বাঁকপুর গ্রামে সত্যপ্রসাদের অবস্থান, মাঝে মাঝেই বাইরের নেতাদের আগমন এবং স্থানীয় বর্গাচাষীদের সাম্প্রতিক বিক্ষুব্ধ মনোভাব—এসব বিষয় বিস্তৃতভাবে বিবৃত ক'রে পুলিন বলল—

'মিয়াসায়েবরা, আপনারা ভা'বে বুঝে এর একটা বিহিতের কথা বলেন।'

অনন্ত বলল—'দ্যাখেন মিয়া সায়েবরা, ঘরে আগুন লাগ্‌লি শুদ্দুর-মুচি বাওন-কায়েতে ফারাক থাকে না। বিপদ আমাদেরও। বিপদ আপনাদেরও। আমাদের বিপদ হয়ত আজ হইছে, কাল হবে আপনাদের।'

খালেদ মিয়া আর ইব্রাহিম খাঁ এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। এবার খালেদ মিয়া বলল—'ভাইসায়েবরা, আপনারা যে মেহেরবানি ক'রে আমাদের ডাকিছেন, এতে আমরা খুব খুশি হইছি। অনন্ত-ভাই এই মাত্তর যে কথা বললেন—সে খুব হক কথা। বিপদ আমাদের সবারই। পুলিন-ভাই যে সব ঘটনা বললেন, এর মোকাবিলা করতি হলি আমাদের একজোট হতি হবে। হিন্দু-মোছলমান আমাদের যার যা জাত হোক না কেন, এক জায়গায় তো আমরা এক। আপনাদেরও জোত-জমি নিয়ে কারবার, আমাদেরও তাই। আপনাদের স্বার্থ আর আমাদের স্বার্থের মধ্যি কোনো ফারাক নেই। আমরা ভাই ভাই মিল-মিশ হয়ে চলব। আমরা আপনাদের বাঁচাব, আপনারা আমাদের বাঁচাবেন।'

খালেদ মিয়ার এ-প্রস্তাবে উপস্থিত সকলেরই মুখ বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ইব্রাহিম খাঁর চেহারা পাঠানদের মতো মজবুত। সে এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'দ্যাখেন ভাইসায়েবরা, আমি কারো ডরাই না। পাঁচ দশজন দুশমনের মহড়া আমি একাই নিতি পারি। নিজের বন্দুক আছে। বন্দুকের দেওড় আমার ফস্‌কায় না। আটজন লা'ঠেলও আমার মজুত থাকে সব সময়। নিজের তাকতে বাঁচার হিম্মত আমার আছে। তবে এট্টা কথা আমিও বুঝি, সব কাজ তাকত দেখায়ে হয় না। তার জন্যি কৌশল চাই, ফিকির চাই।'

বলিষ্ঠ ইব্রাহিম খাঁর জোরালো ভাষণে সকলেই খুব উৎসাহিত হ'লো। উৎসুক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইব্রাহিম খাঁ আবার বলতে শুরু করল—'জী হাঁ ভাইসায়েবরা, আমাদের সেই ফিকির বা'র করতি হবে। সে ফিকির হ'লো,—থানা-পুলিশ সব আমাদের হাত করতি হবে। তেমন অবস্থা হ'লি লাশ দুই চারডে পড়বেই। তখন যাতে থানা-পুলিশের কোনো হুজ্জোতিতে না পড়তি হয়, সে ব্যবস্থা আগেই পাকা ক'রে নিতি হবে। আর যদি পুলিশ দিয়ে বেয়াড়া-বজ্জাতগুলোরে থানায় আটক ক'রে ধোলাই দেয়ার ব্যবস্থা করা যায়, তবে তো বহুত আচ্ছা!'

অতঃপর, সভায় সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো,—থানার বড়োবাবু এবং মেজবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তাঁদের কাছে নিজেদের বিপদের কথা জানাতে হবে, এবং তাঁদের কাছ থেকে যাতে সমস্ত রকম সাহায্য পাওয়া যায়, তার জন্য যথাকর্তব্য করতে হবে।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি আমন ধান ঘরে তোলার কাজ শেষ হ'লো। কাটাকুটি তো আগেই হয়ে গিয়েছিল। এবার মলন-ডলন ঝাড়াই-বাছাইও শেষ হ'লো। গত. দু'সনের তুলনায় এবার ফসলের ফলন ভালো। ফলে সব চাষীর ঘরেই কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। জোতদারের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে, ধারদেনা কিছুটা শোধ

ক'রে বর্গাচাষীদের ঘরেও কয়েকমাসের খোরাকি উঠেছে। ফলে বিলভাসানের চাষীদের মুখে কিছুটা হাসির আভাস ফুটল। নিজস্ব জমির বাকী-বকেয়া খাজনা-পত্রগুলোও এবার মিটিয়ে দেবার কথা সবাই চিন্তা করতে লাগল। পরপর কয়েক বছর ভালো ফসল হয়নি। প্রায় সকলেরই দু'তিন বছর ক'রে খাজনা বাকী পড়েছে। এবার যখন ভগবান একটু মুখ তুলে চেয়েছে, তখন তাদেরও তার মূল্য দিতে হবে বইকি! জমিদার মা-বাপ। তাঁদের জমি চাষ ক'রে ফসল তুলেছে। ছেলেপুলের মুখে অন্ন দিচ্ছে। এখন সে জমিদারের পাওনা-গণ্ডাও মিটিয়ে দিতে হবে বইকি। ধর্মভয় নেই? আর, ধর্মভয় না থাক, নিলামের ভয় তো আছেই। বেশীদিন জমির খাজনা বাকী প'ড়ে থাকলে জমিদার জমি নিলামে তুলে দখল ক'রে নেবেন।

ফলে বিলভাসানের চাষীরা মাঝে মাঝেই দল বেঁধে নড়াইল, বাসুন্দে, আফ্রার জমিদার-বাড়ীর কাছারিতে গিয়ে খাজনা জমা দিয়ে আসতে লাগল। বাঁকপুর গ্রামের রণপতি, জগেন, জলধর, পণ্ডা, নবীন ইত্যাদি মিলিয়ে জন পনেরোর একটা দল একদিন বাসুন্দের জমিদার বৈকুণ্ঠ মুখার্জীর বাড়ী রওনা হ'লো। বাড়ীর কাছা-কাছি গিয়ে কারোরই আর ভয়ে পা ওঠে না। সেসব কথা তো আর কেউ ভুলে যায়নি। আগের বার তারা খাজনা মকুবের জন্য এসেছিল। বৈকুণ্ঠবাবু তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর, মাঝখান থেকে বাপ-ছেলের ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। তারপরের ঘটনা তো আরো চিত্তির। নায়েববাবু খাজনা আদায় করতে তাদের গ্রামে গিয়েছিলেন। পাইক ওদের কয়েকজনকে ধ'রে নিয়ে বেঁধে রেখেছিলো। কিন্তু সত্যবাবু গিয়ে ওদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই না। নায়েববাবুকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে অপমানের কথা কি জমিদারবাবু কিম্বা নায়েববাবু ভুলে গেছেন? আজ কপালে কি আছে কে জানে!

দুপুর নাগাদ সবাই গিয়ে পৌঁছালো বৈকুণ্ঠবাবুর কাছারি বাড়ীতে। শিব-মন্দিরের পাশের বেলগাছের ছায়ায় গামছা পেতে ওরা ব'সে অপেক্ষা করতে লাগল। ওদের মতো আরো অনেক প্রজা আগে এসে ব'সে রয়েছে। ওরাও খাজনা দিতে এসেছে। কাছারি ঘরে ব'সে নায়েবমশায় একজন একজন ক'রে নাম ডেকে খাজনার টাকা বুঝে নিয়ে খাতায় জমা করছেন। রণপতিরা ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কোন্ সময় জানি বাঘ ডেকে ওঠে, অর্থাৎ জামদারবাবুর হুঙ্কার শোনা যায়। কিন্তু তেমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটল না। ফলে রণপতিরা একটু আশ্বস্তও হ'লো, আবার কৌতূহলীও হ'লো। জমিদারবাবুর পুরোনো চাকর ফ্যালা কামার কী কাজে বাড়ীর বাইরে এসেছিল। ফ্যালাকে দেখেই রণপতি হাত ইশারা ক'রে কাছে ডাকল। ফ্যালা কাছে এসে রণপতিকে দেখে চিনতে পারল। একগাল হেসে বলল—'কি রে, কেমন আছিস তোরা?'

রণপতি বলল—'সে দাদা তোমাদের আশীর্বাদে একরকম চ'লে যাচ্ছে! তা দাদা, বড়োবাবুরে দেখ্‌তিছি না। তিনি বাড়ী নেই নাকি?'

ফ্যালা বলল—'হ্যাঁ রণপতি,—বড়োবাবুর খুব অসুখ। যশোরে টাউন-বাড়ীতে বড়ো ছেলের কাছে রইছেন। ডাক্তার দেখাচ্ছেন।'

রণপতি আর কোনো কথা বলল না। বাড়ীর ভিতরে চলে গেলো ফ্যালা।

আগে-আসা প্রজাদের খাজনা দেওয়া হয়ে গেলে এবার ওদের ডাক পড়ল। সবাই গিয়ে বসল কাছারি ঘরের বারান্দার নিচে। ওদের দেখে নায়েববাবু খানিক-ক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। সব কটাকেই চিনতে পেরেছেন। ভয়ে সকলের বুকের মধ্যে আবার শুরু হ'লো ধুক্‌পুকানি। কিন্তু না, নায়েববাবু ধমক-ধামক বকুনি-ঝাঁকুনি কিছুই লাগালেন না। পাইককেও ডাকলেন না। যে যা খাজনার টাকা এনেছিল, সেগুলো খাতায় জমা ক'রে নিলেন। তহুরি নজরানার দু'একটাকা কারো কাছে কম পড়ল। কিন্তু সেগুলো নিয়েও তিনি কোনো তর্জন-গর্জন করলেন না।

হঠাৎ বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো ফ্যালা। ওদের কাছে এসে বলল—'এ্যাই, তোদের কাজ হয়ে গেলি কেউ চলে যাবি না। একটু দেরি ক'রে যাবি!'

প্রমাদ গণল সবাই। এতক্ষণের ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাবটার কারণ বোঝা গেলো এবার। ঝড় ওঠার আগে যেমন বাতাসটা ঝিম্ মারে, তেমনি আর কি। খাজনার টাকাকড়ি সব আদায় ক'রে নিয়ে এবার পাইক ডেকে রাম-ধোলাই লাগাবে। ভয়ে সকলের মুখ শুকিয়ে গেলো। কিন্তু উপায়ই বা কি! পালানোর তো কোনো পথ নেই।

নায়েববাবুর কাছে কাজকর্ম সব মিটে গেলে ফ্যালা ওদের সবাইকে এনে বসাল বেলতলায়। ওরা মনে মনে ঠাকুর-দেবতার নাম জপতে জপতে মাথা নিচু ক'রে বসে থাকল।

একটু বাদে ফ্যালা এক ধামা মুড়ি আর বড়ো এক হাঁড়ি বাতাসা এনে হাজির করল। সকলকে শুনিয়ে বলল—'গামছা পাত্ সবাই!'

ওরা চাষী মানুষ। যেখানেই যাক, কোমরে বা মাথায় একখানা গামছা জড়ানো থাকবেই। ফ্যালার কথায় অগত্যা সবাই গামছা খুলে মাটিতে ঘাসের উপর পাতল। ফ্যালা সকলের গামছার উপর একগাদা ক'রে মুড়ি আর বাতাসা ঢেলে দিলো।

এসব কাণ্ড দেখে রণপতিদের বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো। ধমক না, প্রহার না,—জমিদারবাবুর বাড়ী থেকে মুড়ি-বাতাসা দিচ্ছে, এ একটা বিষম আশ্চর্য ব্যাপার বইকি! ওরা কিছুই বুঝতে না পেরে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল হাঁ ক'রে।

ওদের অবস্থা দেখে হেসে ফেলল ফ্যালা—'কি রে, হাঁ ক'রে তাকিয়ে র'লি ক্যানো সব? খা—। গিন্নীমা তোদের খেতে দেছেন।'

অগত্যা ওরা ভয়ে ভয়ে মুড়ি-বাতাসা খাওয়া শুরু করল।

ওদিকে দোতলার জানলা দিয়ে জমিদার-গিন্নী অপলকে তাকিয়ে ওদের খাওয়া দেখতে লাগলেন। বিলভাসানের বাঁকপুর গ্রামের চাষীদের আসার খবর তিনি ফ্যালার কাছে আগেই পেয়েছিলেন। খবরটা পেয়েই ওদের জন্য মুড়ি-বাতাসার ব্যবস্থা করেছিলেন। শান্ত নিরীহ-প্রকৃতির চাষী মানুষগুলো নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজে মুড়ি-বাতাসা চিবোচ্ছে। মানুষের সামান্য মর্যাদাটুকুও ওরা কখনো

এ-বাড়ীতে পায়না। অথচ ওদেরই কারো বাড়ীতে হয়ত তাঁর একান্ত আদরের কনিষ্ঠ সন্তানটি আশ্রিত হয়ে রয়েছে। ওদেরই কারো অন্ন খেয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে।

সত্যপ্রসাদের মায়ের বুকের ভিতরটা হু হু ক'রে উঠল। নিজের সন্তানকে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে নিজের কাছে বেঁধে রাখতে পারলেন না। অথচ ঐ অচ্ছুৎ মানুষগুলো তাঁর সেরা ছেলেটিকে কিসের টানে এমন ক'রে টেনে নিয়ে গেলো।

বাঁধ-ভাঙ্গা অশ্রুধারায় সত্যপ্রসাদের মা'র দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এলো।

॥ বারো ॥

মাঘের শেষ। কয়েকদিন কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছিল। সঙ্গে উত্তুরে হাওয়া। এখন সেই ঠাণ্ডার ভাবটা কেটে গিয়ে একটু একটু ক'রে গরমের আমেজ শুরু হয়েছে।

দুপুরবেলায় সত্যপ্রসাদ শুয়ে শুয়ে ডায়েরী লিখছিলেন। কিন্তু লেখার কথাগুলো যেন কিছুতেই গুছিয়ে লিখতে পারছেন না। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। বিলভাসানের ক্ষেত-প্রান্তর দিয়ে যতদূর তাকানো যায়, দৃষ্টি কোথাও বাধা মানে না। আমন ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। ধান গাছের গোড়ার দিকের দীর্ঘ খড়গুলো পড়ে রয়েছে। ওগুলোকে বলে 'নাড়া'। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেতে চাষীরা নাড়া তুলছে। ধান-কুড়োনী ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা কাঁখে ধামা নিয়ে ঝরা ধানের-বাইল খুঁজছে নাড়ার মধ্যে। দূর থেকে মানুষগুলোকে আবছা আবছা দেখাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেতে খেসারি ডাল বোনা হয়েছে। ঘন পুরু সবুজ জাজিমের মতো খেসারি ডালের গাছগুলো সে সব ক্ষেত ঢেকে রেখেছে। পর পর তিন চারখানা ক্ষেতে গুঁজি-তিল চাষ করা হয়েছে। ফুল এসেছে গুঁজি-তিলের গাছে। সূর্যমুখী ফুলের মতো গাঢ় হলুদ রঙের ছোটো ছোটো ফুল। সূর্যের আলো প'ড়ে ওদের রং যেন আরো ঠিকরে বেরুচ্ছে।

শীত শেষের উদাস মধ্যাহ্নে বিলভাসানের ক্ষেত-প্রান্তরের এইসব ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য অন্যমনস্ক সত্যপ্রসাদের মস্তিষ্কে যেন একটি সম্মোহিত চিত্রকল্প রচনা করছিল। এবং এই সম্মোহিত মানসিকতায় নানাবিধ চিন্তা স্মৃতির সূত্র ধ'রে একটি নিজস্ব পরিমণ্ডল রচনা করছিল। বার বার ভেসে উঠছে সেখানে মা'র মুখখানা।

জমিদারবাবুর বাড়ী থেকে ফিরে এসে সেদিন জলধর সাড়ম্বরে এবং সালঙ্কারে তার অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছিল সত্যপ্রসাদের কাছে। খাজনা দেবার পর ফ্যালা কামার তাদের অপেক্ষা করার কথা বলায় কী রকম ভয় পেয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত ভয়-ডর তো দূরের কথা, কীভাবে গিন্নীমা তাদের মুড়ি-বাতাসা খাইয়েছিলেন, সে সবের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছিল। গিন্নীমার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল জলধর। সত্যপ্রসাদ কোনো কথা বলেননি। জলধরের

কথা শুনছিলেন আর শুধু হাসছিলেন।

এই মুহূর্তে বারবার মায়ের কথা মনে পড়তে লাগল সত্যপ্রসাদের।

তাঁর মা নিঃসন্দেহে স্নেহ-পরায়ণা। কিন্তু অকারণে বিগলিত হয়ে প্রজাদের ডেকে জলখাবার খাওয়ানোর মতো ঘটনা তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্যের বিরোধী। সুতরাং মা'র এই আচরণ তাঁর এই কনিষ্ঠ সন্তানটির প্রতি কতখানি স্নেহ থেকে উৎসারিত হয়েছে, সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করলেন সত্যপ্রসাদ।

বাবার ছবিও কয়েকবার ভেসে এলো মনে। বাবা খুব অসুস্থ। যশোহরে দাদার কাছে থেকে চিকিৎসা হচ্ছে—এসব খবরও তাঁকে দিয়েছে জলধর।

মার্কসবাদী চিন্তা-ধারায় দীক্ষিত হবার পর থেকে সত্যপ্রসাদ তাঁর বাবার সঙ্গে বাংলার আর দশটি দাম্ভিক প্রজা-শোষক অত্যাচারী জমিদারের কোনো পার্থক্য খুঁজে পাননি। তাঁর গৃহ-ত্যাগের তাৎক্ষণিক কারণও খানিকটা তাঁর বাবাই। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই দাম্ভিক রাশভারী মানুষটির জন্য সত্যপ্রসাদের মনের মধ্যে যেন একটি বিষণ্ন বেদনার মেঘ-খণ্ড জমে উঠল। বাবা অসুস্থ, এ চিন্তাটাকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছেন না। সত্যপ্রসাদ আজ যে পথ বেছে নিয়েছেন, সে পথে এইসব মানসিক দুর্বলতা একান্তই অবান্তর। অর্থহীন। ক্ষেত্র-বিশেষে তা তাঁর নির্দিষ্ট চলার পথে প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করতে পারে। তা জেনেও, বিলভাসানের দিগন্ত-বিস্তৃত অবাধ ক্ষেত-প্রান্তরের রৌদ্রালোকিত উদাস মন্থর পরিমণ্ডল তাঁর মনের মধ্যে যে আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করল, তাতে কিছুতেই এ-সব চিন্তা থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখতে পারলেন না।

সত্যপ্রসাদের এই মানসিক আচ্ছন্ন অবস্থাটি কাটতে বেশী দেরি হলো না। কুড়ি পঁচিশজন মহিলার একটি দল দ্রুত তাঁর ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কয়েকজনকে বেশ একটু উত্তেজিত দেখা গেলো। আবার কয়েকজন ওদের কথায় হাসছে। আসলে, এখানে আসার পথে রাস্তায় ধনু পাগল ওদের কাকে ভয় দেখিয়েছে। সেটা নিয়েই চলছে উত্তেজিত আলোচনা।

মহিলাদের দলটি সত্যপ্রসাদের ঘরের পাশে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। সকলের সামনে রয়েছে ফুলি সিঙ্গি। তার পাশে যতীনের স্ত্রী সরমা, আর মল্লি-হাটির বিনতা। বিনতার বাপের বাড়ী বাঁকপুরে। বিয়ে হয়েছে মল্লিহাটিতে। সরমা এবং বিনতা দু'জনেই কিছুটা লেখাপড়া জানে। সুতরাং মহিলাদের দলটির যা বক্তব্য, তা ওরাই তিনজন সত্যপ্রসাদের কাছে উপস্থিত করবে।

বিলভাসানের চাষীদের মধ্যে নিজেদের বঞ্চিত জীবনকে ঘিরে যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটছিল, ধীরে ধীরে তার ছাপ পড়তে শুরু করে কৃষক-রমণীদের মধ্যেও। পরনিন্দা, পরচর্চা, ঝগড়া-কোন্দল ছাড়াও ভিন্নতর একটি আলোচনা মাঝে মাঝেই তাদের কথাবার্তার মধ্যেও উচ্চারিত হতে থাকে।

সবথেকে বেশী প্রভাব পড়ল ফুলির ক্ষেত্রে। সুচেতা বসু বিলভাসানে কয়েক-দিন থেকেই কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কথাবার্তা ফুলির মনে যে প্রভাব বিস্তার করে, ফুলি তাকে সর্বাত্মকভাবে গ্রহণ করে। আর, সত্যপ্রসাদ তার সহজ সুন্দর আলোচনার মধ্য দিয়ে আগামী দিনের বাংলার চাষীদের শোষণমুক্ত

এমনই একটি জীবনের ছবি ফুলির সামনে তুলে ধরলেন, যা এই বলিষ্ঠ একরোখা সরল প্রকৃতির চাষী-রমণীটির জীবনে প্রকাণ্ড একটি বাঁক সৃষ্টি করল। ছেলে এবং দেওরকে কেন্দ্র ক'রে তার যে সংসার, বড়জোর পাড়া-প্রতিবেশীর নিঃস্বার্থ সেবা, কিম্বা কারো কোনো অন্যায় আচরণ দেখলে পুরুষালী বলিষ্ঠতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, কিম্বা হঠাৎ হঠাৎ কোনো উদাস বৈরাগ্যের বিষন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া,— এ-সবের মধ্যে তার যে জীবন সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে হঠাৎই যেন একটা জানালা খুলে গেলো। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সেখানে বৃহত্তর আকাশের একাংশ। সেই উদ্ভাসিত আকাশের স্বরূপ সম্পর্কে তার মনের মধ্যে স্বচ্ছ কোনো ধারণা গড়ে উঠল না। কিন্তু তার হাতছানি ফুলির সমগ্র সত্তাকে একমুখী করে তুলল। সংসারের ঘর-কন্নার ছকে-বাঁধা জীবনের মধ্যে ফুলি আগেও তেমন আসক্ত ছিল না। সময়-সুযোগের অপেক্ষা না ক'রেই যখন যেদিকে খুশি মন চাইত, বেরিয়ে পড়ত। এখন সেই অভ্যাসটা আরো প্রবল হয়ে উঠল। গ্রামে গ্রামে মহিলাদের কাছে ঘুরে ফুলি তার এই নতুন চিন্তা-ধারার কথা সকলের কাছে ব্যক্ত করতে লাগল। শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে পুরুষ মানুষেরা সংঘবদ্ধ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। তারা মেয়েমানুষ ব'লে কি তাদের কিছুই করার নেই ? ফুলির বক্তব্য, এই আন্দোলনে বিলভাসানের মেয়ে-বউদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

বিলভাসানের চাষী-বউয়েরা পৌষ মাসের শেষ সপ্তাহে কুলুই-চণ্ডীর ব্রত করে। চলতি কথায় বলে—'কুলো-জাগানো।' একটা নতুন কুলোয় তেল-সিন্দুর মাখিয়ে তাতে পুজোর ঘট এবং পুজোর নানা উপকরণ বসিয়ে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে 'মাঙ্গন' মেগে বেড়ায়। পৌষ-সংক্রান্তির দিন 'মাঙ্গন' থেকে সংগৃহীত চাউল বা পয়সা দিয়ে কুলুই-চণ্ডীর পুজো দেওয়া হয়। নদী বা পুকুরের জলে কুলো ভাসান দেওয়া হয়। সব আপদ-বালাই দূর হয় তাতে। এই কুলো-জাগানোর ব্রতে প্রত্যেক গ্রাম থেকেই চার-পাঁচটা দল বের হয়। এবং এ পুজোয় মেয়েদেরই একচ্ছত্র আধিপত্য।

অন্য বছর 'কুলো-জাগানো' মেয়েদের দল সাধারণতঃ ব্রতের গান, কিম্বা নিজে-দের সাংসারিক দুঃখকষ্ট, ঝগড়াঝাঁটি বা অভাব-অভিযোগের আলোচনা ইত্যাদি নিয়েই মশগুল থাকত। এবারও থাকল এ সব কিছুই। কিন্তু সেই সঙ্গে বিল-ভাসানের সামগ্রিক চাষী-জীবনে যে নতুন চিন্তাধারা সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে, তারও প্রতিফলন ঘটল। ফুলি সিঙ্গির গ্রামে গ্রামে পর্যটন এবং তার নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী তার উপলব্ধির কথাগুলো মহিলাদের সামনে তুলে ধরায় তারও একটি জোরালো প্রতিক্রিয়া ঘটল।

আজকে সত্যপ্রসাদের কাছে স্থানীয় গ্রামগুলি থেকে এতগুলি মহিলার দল বেঁধে আগমন তারই ফলশ্রুতি।

ওদের দেখে সত্যপ্রসাদ তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। ফুলি এগিয়ে এসে কোনো-রকম ভণিতা না ক'রেই বলল—"ভাইডি, আমরা সবাই আইছি তোমার কাছে। তুমি কও, কি আমাদের করাতি হবে। আমরাও কাজ করাতি চাই।'

সত্যপ্রসাদ সকলকে দেখলেন একবার। মাত্র কয়েকজনকে ছাড়া বেশীর

ভাগকেই চেনেন না। সকলের পিছনে দেখলেন, দাঁড়িয়ে আছে সৌরভী। একটু অস্বস্তি বোধ করলেন সত্যপ্রসাদ। কিন্তু তা কাটিয়ে উঠে হেসে বললেন—'ফুলিদি, তুমি দেখি বিরাট বাহিনী নিয়ে এসেছ। তোমাকে একেবারে জেনারেলের মতো দেখাচ্ছে।'

ফুলিও হেসে বলে,—'কি যে ভাইডি তুমি ইর্নাজরি-মিন্‌জিরি কও—তোমার ফুলিদি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। অতো-শতো বোঝে না।'

ফুলির কথায় অন্য বউগুলোও হাসতে থাকে। এদের আসার খবর পেয়ে চাঁপা আর ওর মা ছুটে আসে। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসতে দেয় সকলকে।

সবাই চুপচাপ ক'রে বসলে সরমা বলে—'সত্যদা, আমাদের যা বলার, সে তো ফুলিদি আপনারে আগেই বলিছে। আমরাও কাজ করতি চাই। সুচেতাদিকে দেখে আমাদের চোখ খুলে গেছে। শহর থেকে এসে আপনারা যদি আমাদের জন্যি এতোটা ভাবতি পারেন, তাহলি আমাদের নিজেদের ভাবনা আমরা নিজেরা কিছুটা ভাবতি পারব না কেন?'

সত্যপ্রসাদ বললেন—'অবশ্যই তোমরা এ-কথা বলতে পারো। আর সত্যি বলতে কী, আমরা বাইরে থেকে এসে যে যতই কাজ করি না কেন, সে কাজের কোনো দাম থাকবে না, যদি তোমরাও তাতে অংশ গ্রহণ না করো। এ আন্দোলন বিলভাসানের প্রতিটি কৃষকের। আর শুধু বিলভাসানই বা বলছি কেন, এ আন্দোলন বাংলার প্রতিটি বঞ্চিত নির্যাতিত কৃষকের। তাই এই আন্দোলনে সেই কৃষকদেরই একজোট হয়ে সকলের আগে এগিয়ে আসতে হবে। চিরকাল যে মার তারা খেয়েছে, তার প্রতিবাদ করতে হবে। প্রতিরোধ করতে হবে। আর তোমরা ঘরের মেয়েরা পুরুষদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এ আন্দোলনকে শক্তিশালী ক'রে তুলবে। আমি বিশ্বাস করি, তোমরা বিলভাসানের সমস্ত কৃষক নারী-পুরুষ মিলে যদি সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারো, তাহলে এখানে এমন কোনো জোতদার জমিদার নেই, যারা বিলভাসানের চাষীদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে।'

মহিলারা উৎকর্ণ হয়ে সত্যপ্রসাদের কথা শুনতে থাকে। সত্যপ্রসাদ খুব সহজ ক'রে ওদের কাছে বিভিন্ন দেশের নারী-জাগরণের গল্প বলেন। ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাঈ, জোয়ান অব আর্ক প্রভৃতি স্বদেশ-প্রেমিক বীর রমণীদের বীরত্বের ইতিহাস শোনান। যুগে যুগে মেয়েরাও কীভাবে নতুন ইতিহাস রচনায় নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তার জ্বলন্ত কাহিনী তুলে ধরলেন।

সত্যপ্রসাদের বলার ভঙ্গীতে যেন যাদু আছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই কৃষক-রমণীগুলো তাঁর কথা শুনতে শুনতে বসে রইল আবিষ্ট হয়ে। সকলের পিছনে থেকে সৌরভীর দু'টি প্রদীপ্ত নির্নিমেষ চোখও সারাক্ষণ সত্যপ্রসাদের মুখের উপর নিবদ্ধ হয়ে রইল।

সত্যপ্রসাদ বললেন—'তোমরা সবাই আমার কাছে জানতে এসেছো—কি তোমাদের কাজ। আমি যতটুকু বুঝি, তোমাদের বললাম। এরপর তোমরা কাজ শুরু করো। দেখবে, নিজেদের চলার পথ নিজেরাই খুঁজে পাবে।'

সত্যপ্রসাদ একটু থেমে ফুলির দিকে তাকিয়ে বললেন—'ফুলিদি, তুমি এদের সকলকে নিয়ে 'নারী বাহিনী' গড়ে তোলো। তোমার মতো শক্তিমতী করে তোলো সবাইকে—।'

'নারী-বাহিনী' কথাটার অর্থ বুঝতে একটু সময় লাগল ফুলির। সত্যপ্রসাদের মুখের দিকে একটুক্ষণ ভ্রূ-কুঁচকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎই যেন কথাটার অর্থ অনুধাবন ক'রে বলল—'ও, বুঝিছি! তার মানে, তুমি বিটিদের দল বানাতি কচ্ছো। পুষ্যো-মানুষরা যেমন 'কৃষক-সমিতি' বানাইছে, তেমনি আমরা বানাবো নারী বাহিনী,—তাইতো?'

ফুলি সত্যপ্রসাদের সম্মতির কোনো অপেক্ষা না রেখেই সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—'এ্যাই, সবাই শোন্ তোরা। আমার ভাইডি বিটিদের দল—মানে 'নারী বাহিনী' বানাতি কইছে। 'নারী বাহিনী'র দল ক'রে এবার আমাদের কাজে ঝাঁপায়ে পড়তি হবে।'

ফুলি ফিরে দাঁড়িয়ে সত্যপ্রসাদের কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে বলল—'ভাইডি, তোমারে ছুঁয়ে এই আমি কলাম, তুমি যে নারী-বাহিনীর কথা বল্লে, সে নারী-বাহিনী আমি গড়বোই। তুমি আমার বয়েসে ছোটো। কিন্তু তুমি বেরাম্মনের ছেলে, আমাদের মনিব। কতো জ্ঞান-বুদ্ধি তোমার। —তুমি আশীর্বাদ করো ভাইডি, যেন তোমার ফুলিদি তার কথা রাখতি পারে!'

হঠাৎ সেই সমবেত মহিলাদের পিছন থেকে কে একজন তীব্র খরখরে শব্দে উলুধ্বনি দিয়ে উঠল।

বাজখাঁই গলায় চীৎকার ক'রে উঠল ফুলি—'কেডারে—জুয়োড় (জোকার) দেচ্ছে কেডা? কথা-বার্তা হচ্ছে, তার মধ্যি আবার জুয়োড় দেয়ার কি হলো?'

কিন্তু দেখা গেলো, ফুলির ধমকে উলুধ্বনি তো বন্ধ হ'লোই না, বরং একজনের মুখ থেকে আর একজনের মুখে তা ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আসলে, বিলভাসানের চাষী-বউদের জিভটা ছোটোবেলা থেকেই উলুধ্বনি দিতে বিশেষভাবে রপ্ত হয়ে ওঠে। পাল-পার্বণ বা কোনো মঙ্গল-অনুষ্ঠানে উপচার-উপকরণের যতই অভাব থাকুক না কেন, জয় জোকার উলুধ্বনি আর নানা মেয়েলী আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তা পুষিয়ে যায়। ভালো উলুধ্বনি দিতে পারাটা মেয়েদের একটা বড়ো গুণ ব'লে বিবেচিত হয়। এ-নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা হয়। পাল-পার্বণ, বিয়ে-শাদিতে ভালো উলু-দিতে-পারা মেয়েদের একটা বিশেষ কদর থাকে। আর, উলু দেওয়া ব্যাপারটা যেন সংক্রামক। একজন উলু দিলো তো আর রক্ষে নেই। অমনি সকলের জিভ চুলবুল্ ক'রে উঠবে। তাই দলের পিছন থেকে একজনকে উলু দিতে দেখেই কার্য-কারণ কোনো কিছুর অপেক্ষা না রেখেই অন্য সকলে সমবেতভাবে উলু দিয়ে যেতে লাগল। বারকয়েক ধমক দিয়ে চুপ ক'রে থাকল ফুলি।

অবশেষে উলুধ্বনি থামল। খানিকক্ষণ কানের মধ্যে সেই ধ্বনির রেশ লেগে রইল। ফুলি এবার হেসে বলল—'বুন্ডিরা, তোদের পরে রাগ করবো ভাবিলাম। তা, দেখাতিছি কাজডা তোরাই ঠিক করিছিস। জুয়োড় দিয়ে তোরা ঠিক কাজই

করিছিস। যে কাজে আমরা হাত দিতি যাচ্ছি, তা তো পুজো-পাব্বোণের কাজের থেকে কিছু কম না। এ-রকম এট্টা কাজ আরম্ভ করার আগে জয়-জোকার উলু দিয়েই তো আরম্ভ করতি হবে।'

ফুলির কথায় উৎসাহিত হয়ে মহিলারা সমবেতভাবে আর একবার উলু দিয়ে উঠল।

নিস্তব্ধতা ফিরে এলে ফুলি বলল—'বুনডিরা, যে জুয়োড় তোমরা দিলে, এই জুয়োড় আমাদের কাজে লাগাতি হবে। নারী-বাহিনীর যখন সভা করবা, এই জুয়োড় দিয়ে সভা আরম্ভ করবা। সব গেরামেই এই নিয়ম চালু করবা। জুয়োড় শুন্‌লিই চলে আসবা সবাই। আর, কোনোদিন কোনো গেরামে যদি কোনো বিপদ হয়, সকলে মিলে তিনবার জুয়োড় দেবা। যার কানে এই জুয়োড় যাবে, সে তিনবার দেবা। এইভাবে সে খবর ছড়ায়ে দেবা গেরামে গেরামে। তারপরে সবাই এক জায়গায় আ'সে মেল্‌বা।'

সকলের মনের মধ্যে একটা নতুন উত্তেজনার হাওয়া লাগল। বিলভাসানের চাষীদের জীবন-যাত্রা স্বভাবতঃই নিস্তরঙ্গ। তার মধ্যে চাষী-বউদের জীবন আরো বেশী একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন। সংসারের পাঁচ-রকম, কাজ, রান্না-বান্না ইত্যাদির বাঁধা-ধরা ছকের মধ্যেই তাদের জীবনের চাকা আবর্তিত। আজকের এই ঘটনা তাদের নির্দিষ্ট ছকে-বাঁধা জীবনের মধ্যে একটি ভিন্নরকম স্বাদ এনে দিলো। কোনো বৃহত্তর চেতনা না হোক, একটা নতুনত্বের মোহ ছড়িয়ে পড়ল তাদের মনের মধ্যে।

আর এক প্রস্থ উলুধ্বনি দিয়ে সভাভঙ্গ হ'লো।

সন্ধ্যের দিকে কৈলাস-গিন্নী কৈলাসকে একটু একান্তে পেয়ে বলল—'ও মাতুব্বর, এট্টা কথা বলতাম।'

কৈলাস জিজ্ঞাসু চোখে গিন্নীর দিকে তাকায়। কৈলাস-গিন্নী বলে—'দিনরাত তো খালি পাড়ার মাতুব্বরী ক'রে ব্যাড়াচ্ছো। তা, তোমার বাড়ীর মাতুব্বরীডা কেডা করে কও দেখি ?'

কৈলাস হেসে বলে—'ওঃ, তোর বুঝি মাতুব্বর হওয়ার শখ হইছে। তা, ফুলি তো শোনলাম, নারী-বাহিনী না কী সব বানাচ্ছে। ফুলিরে বলবানি, তোরে এট্টা মাতুব্বর বানায়ে দিতি।'

প্রৌঢ়া কৈলাস-গিন্নীর চোখে ছোটো একটা কটাক্ষ ঝিলিক মারে,—'ন্যাও, বুড়ো বয়েসে আর ঢং করতি হবে না। মাতুব্বর হই আর যাই হই না ক্যানো, তোমার পরেও মাতুব্বরী করতি হবে নাকি ?'

কৈলাস হাসিটা ধ'রে রেখেই বলে—'করলি না হয় এট্টু মাতুব্বরী। আজকাল কতো মাইয়ে-মানুষ জজ-বারেস্টার হচ্ছে, আর তুই না হয় এট্টু মাতুব্বর হলি !'

কৈলাস-গিন্নী হেসে ঝামটা মেরে বলে—'হবোই তো ! তোমার মতো ঢ্যালা-কানা মাতুব্বর নিয়ে সংসার করতি হ'লি মাতুব্বর না হয়ে উপায় আছে কি কও ?'

কৈলাস গম্ভীর হবার ভাণ ক'রে বলে—'বুঝিছি, আজকাল তো ধরা-টরা তেমন আর দিনা, তাই বুঝি ঢ্যালা-কানা মাতুব্বর হ'য়ে গিছি। তো আয় দেখি একবার—'

ব'লেই কৈলাস দুই হাতে গিন্নীকে জড়িয়ে ধরতে যায়।

কৈলাস-গিন্নী সভয়ে দু'পা পিছিয়ে যায়। আশে-পাশে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে আর একটা কটাক্ষ হেনে বলে—'মরণ আর কি! অমনিই মাথায় বাই চ্যাগায়ে ওঠ্‌লো!'

কৈলাস এবার ভদ্র-সভ্য হয়ে বলল—'নে, তোর কথাডা কি তাড়াতাড়ি ক। একবার পূব-পাড়ায় যাতি হবে।'

কৈলাস-গিন্নী একটুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। ওর চোখের সামনে ভাসতে থাকে দুপুরের সেই দৃশ্যটা।

সবাইকে নিয়ে ওদের বারান্দায় ব'সে সভা করছিল ফুলি। সে নিজেও একপাশে ব'সে সত্যপ্রসাদের কথা শুনছিল। তার পাশে ব'সে ছিল চাঁপা। মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছিল। চাঁপার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিল চাঁপার মা। নিজের মেয়েকেই হঠাৎ কেমন যেন অচেনা ব'লে মনে হ'লো। কত বড়ো হয়ে গেছে চাঁপা। এই তো সেদিনও কেমন সারা গায়ে ধুলো মেখে ঘর-বারান্দা দিয়ে হামা টেনে বেড়াত। এরই মধ্যে এতটা বড়ো হয়ে গেলো! চোখের সামনে দিয়েই একটু একটু ক'রে বড়ো হ'তে হ'তে ছেলেমেয়েরা এমনি করেই কখন বোধহয় অচেনা হয়ে যায়। চাঁপার মা'র চোখের সামনে চাঁপার সেই উপবিষ্ট বাড়ন্ত চেহারার ছবিটা ভাসতে থাকে। বলে—

'মাইয়ে স্যাক্‌না হইছে, বিয়ে দেয়ার কথা ভাবতিছো কিছু?'

কৈলাস হেসে বলে—'ওঃ, তোর দেখি বিয়েই-বাড়ী যাওয়ার জন্যি পরাণ হাকুর-পুকুর করতিছে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে গম্ভীর হয়ে কৈলাস বলল—'দ্যাখ্‌ চাঁপার মা, চাঁপা আমার এট্টা মাত্তর মাইয়ে। আমি এট্টু দেখে-শুনেই ওর বিয়ে দেবো। সম্বন্ধ তো কতো আসেরে! তা, যেখানে-সেখানে তো আর রাজী হতি পারি না। গগনরে ক'য়ে দিছি। নানান জায়গায় ঘোরা মানুষ। ভালো ছেলের খোঁজ পালি জানাতি কইছি। ভাবতিছি, জনার্দন ঘটকরেও একবার ব'লে দেবো।'

চাঁপার মা ফস্‌ ক'রে ব'লে ওঠে—'অতো রাজ্যি চ'যে ব্যাড়ানোর কি হলো ক্যানো, আমাদের জলধর কি খারাপ ছেলে নাকি?'

কৈলাসকে একটু চিন্তিত দেখায়—'দ্যাখ্‌ চাঁপার মা, জলধরের কথাডা যে আমিও না ভাবিছি, তা নয়। ছ্যামড়াডারে আমারও বেশ পছন্দ হয়। কিন্তু কি জানিস, জলধরের মাথার পরে কোনো গারজেন নেই। সেও না হয় বোঝলাম। কিন্তু জলধরের সংসারের কথা তো জানিস। জমি-যাতি বল্‌তি প্রায় কিছুই নেই। ভাগে-বর্গায় কোনোভাবে চালায়। আমার চাঁপার বড়ো কষ্ট হবে রে—!'

—'তা, তুমি যাই কও মাতুব্বর, মাইয়ের মন কিন্তু তোমার জলধরের পরে পাড়ছে।'

—'কি যে কো'স্‌ তুই, যতো সব অসৈলো কথা!' —বিস্ময় অবিশ্বাস আর কৌতূহল মেশানো গলায় বলে কৈলাস।

—'হুঁ, আমি তো যতো অসৈলো কথা কই! সাধে কি আর তোমারে ঢ্যালা-কানা

মাতুব্বর কই। চোখ থাকলি দেখ্‌তি পারতে! আমি মাইয়ে মানুষ, আমার চোখ ফাঁকি দেয়া অতো সোজা না। আমার নিজির প্যাটের মাইয়েরে আমি চেনবো না তো কি তুমি চেনবা? তা, তোমারে ক'য়ে রাখলাম মাতুব্বর, মাইয়ের মনে ব্যথা দিয়ে তুমি কিন্তু কোনো কাজ করতি পারবা না।'

কথাটা আর বেশীদূর এগোতে পারল না। উঠোনের ও-পাশ থেকে কেউ একজন কৈলাস-মাতব্বরের নাম ধরে ডাকাডাকি করছিল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো কৈলাস।

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের স্বাভাবিক গাঁট-ছড়ায় বাঁধা জীবনের অন্তহীন প্রবাহ। তার দোলায় বিলভাসানের চাষীদের মধ্যেও কত স্বপ্ন, কত কামনা-বাসনার কুঁড়ি গজায়। কোনোটা বা তার ফুল হয়ে ফোটে। কোনোটা অকালেই ঝ'রে যায়।

॥ তেরো ॥

ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে বাঁকপুর গ্রামে হঠাৎই পুলিশের আবির্ভাব ঘটল।

বিলভাসান অঞ্চলে সাধারণতঃ পুলিশের যাতায়াত খুবই কম। সাধারণ চুরি-ধ্যারি বা মারামারির কেস হ'লে চৌকিদার দফাদারই তার মোকাবিলা করে। তাদেরও দাপট কম নয়। বড়ো রকমের রক্তপাত বা খুনোখুনি না ঘটলে বিল-ভাসানে পুলিশের আগমন ঘটে না। সুতরাং বিশেষ কোনো কারণে কোনো গ্রামে পুলিশের আগমন ঘটলে সেটা রীতিমত একটা ঘটনা ব'লে পরিগণিত হয়। চারি-দিকে ভীষণ একটা সাড়া পড়ে যায়। বন্দুকধারী কনস্টেবলদের দেখে ভয়ে প্রাণ খাঁচা-ছাড়া হয়ে যায় সকলের। কে কোথায় লুকোবে তার পথ পায় না।

কিন্তু এবার বাঁকপুরে পুলিশের আগমন ঘটল একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে। মেজ দারোগা নিজে এলেন। সঙ্গে জনা পাঁচেক কনস্টেবল। প্রথমেই তাঁরা এসে উঠলেন অনন্ত বিশ্বাসের বাড়ী। অনন্ত বিশ্বাসের বাড়ী জল-খাবারাদি খেয়ে বন্দুক রেখে খালি হাতে সবাই এসে উঠলেন বাঁকপুর স্কুলের বটতলায়। দারোগা পুলিশ দেখে স্কুল ছুটি দিয়ে দিলো যতীন। স্কুল ঘর থেকে চেয়ার বেঞ্চ বের ক'রে সবাইকে বসতে দেওয়া হ'লো।

পুলিশের সঙ্গে এসেছেন বেশ কয়েকজন প্রবীণ মৌলবী। তাঁরাও আসন গ্রহণ করলেন। মেজদারোগা মুসলমান। মুখে বাহারি নুর। ঘিয়ে-দুধে নাদুস-নুদুস চেহারা। বাঁকপুরের নিমাই চৌকিদার কোমরে বেল্ট আঁটকে এসে স্যালুট ক'রে দাঁড়াল। দারোগাসায়েব গ্রামের মাতব্বর-স্থানীয় লোকদের ডাকার জন্য হুকুম করলেন।

চৌকিদারের ডাকে একে একে গ্রামের প্রবীণ বয়স্ক লোকেরা এসে বটতলায় সমবেত হতে লাগল। দারোগাসায়েবের গ্রামে আসার কারণটা বুঝতে না পেরে সকলে তাকাতে লাগল এ ওর মুখের দিকে। বেশ ভিড় জমে গেলো চারিদিকে।

আগের দিন রাত্রে বাঁকপুরে এসেছিলেন কাদের সায়েব এবং নিখিল রায়। ওঁরা এখন জেলায় জেলায় চাষীদের মধ্যে তেভাগা আন্দোলনকে তীব্রতর ক'রে তোলার জন্য উল্কার মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন। বাঁকপুরে এসে দু'জনে দুই চাষীর বাড়ীতে উঠেছিলেন। দু'পুরে খেতে বসেছিলেন। হঠাৎই খবর পেলেন, বাঁকপুর স্কুলে পুলিশ এসেছে। খাওয়া ফেলে ছুটলেন দু'জনেই। কৈলাসকে খবর দিতে গিয়েছিল চৌকিদার। সত্যপ্রসাদও খবরটা পেলেন। কাদের সায়েব, নিখিল আর সত্যপ্রসাদ স্কুলের বটতলায় এসে ভিড়ের মধ্যে পিছনে দাঁড়িয়ে ঘটনার গতি লক্ষ করতে লাগলেন।

দারোগাসায়েব উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে একবার দেখে নিয়ে বললেন—'আমি একটা বিশেষ কাজে আজ এখানে এসেছি। আমার সঙ্গে মাননীয় হাজী সায়েব এবং মৌলবী সায়েবরাও আছেন। এনাদের সামনে আমি ব'লে যাচ্ছি, এখানে কোনো-রকম গোলমাল হাঙ্গামা বা বেয়াদবি বরদাস্ত করা হবে না। কোনোরকম শান্তিভঙ্গ করা চলবে না। গ্রামের মোড়লদের একথা আমার সামনে কবুল করতে হবে।'

ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলেন কাদের সায়েব। পিছনে নিখিল। লোক-জনেরা দু'পাশে একটুখানি সরে ওঁদের পথ ক'রে দিলো। কাদের সায়েব এগিয়ে এসে দারোগার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন—'এ অঞ্চলে আপনি শান্তিভঙ্গের কি ঘটনা দেখতে পেলেন দারোগা সায়েব?'

দারোগা কাদের সায়েবের সুদর্শন বুদ্ধিদীপ্ত মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে বললেন—'আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।'

কাদের সায়েব বললেন—'অধীন এমন কিছু লায়েক আদ্‌মী নয় যে, জাঁহাপনার নজরে আসতে হবে।'

কাদের সায়েবের ব্যঙ্গে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল দারোগার ফর্সা মুখ। চুপ ক'রে থাকলেন।

কাদের সায়েব আবার বললেন,—'দারোগাসায়েব কিন্তু শান্তিভঙ্গের ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে এখনো কিছু বললেন না।'

নিখিল পাশ থেকে তাঁর বলিষ্ঠ গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন—'ওসব শান্তিভঙ্গ-টঙ্গ আমরা বুঝি না। আপনার যদি কিছু বলার থাকে, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ওয়ারেন্ট নিয়ে আসবেন। ওসব বুলি ছাড়িয়ে নিরীহ মানুষকে ভয় দেখাবেন না।'

দারোগা আর একবার চমক খেলেন। চারপাশের চাষী মানুষগুলো তো একে-বারে তাজ্জব। দারোগাবাবুর মুখের উপর যে এভাবে কথা বলতে পারা যায়, এটা তারা বাপের জন্মে এই প্রথম দেখল।

দারোগা কিন্তু কাদের সায়েব কিম্বা নিখিলের কথা তেমন গায়ে মাখালেন না। তাঁর দৃষ্টি ঘুরছিল এদিক-ওদিক। হঠাৎ সত্যপ্রসাদের দিকে চোখ পড়তেই বললেন—'আপনিই তো সত্যপ্রসাদবাবু?'

সত্যপ্রসাদ সংক্ষেপে জবাব দিলেন—'হ্যাঁ।'

দারোগা কণ্ঠস্বরটি যথাসম্ভব অমায়িক ক'রে বললেন—'আপনি মশাই কেমন লোক বলুন দেখি! আপনি বৈকুণ্ঠ মুখার্জীর ছেলে। ব্রাহ্মণ, মানী মানুষ। —আপনার

কি এইসব চাষা-ভূষোদের মধ্যে এইভাবে পড়ে থাকা মানায় নাকি ?'

দারোগার সাঙ্গোপাঙ্গ মৌলবীরাও মাথা নেড়ে তাঁকে সমর্থন জানালেন।

সত্যপ্রসাদ শান্তকণ্ঠে বললেন—'উপদেশের জন্য ধন্যবাদ ! তবে আমার ব্যক্তি-গত ব্যাপারে মাথা গলাতে না এলেই সুখী হবো।'

দারোগা এবার চেয়ারে নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসলেন—'দেখুন সত্যবাবু, এটা শুধু আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার হ'লে আমি মাথা গলাতে আসতাম না। কিন্তু এটাকে আমি আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার ব'লে মনে করি না। কয়েকমাস ধ'রে আপনি এখানে চাষীদের মধ্যে এসে রয়েছেন। এদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়াচ্ছেন। আপনার উদ্দেশ্যটা কি ?'

সত্যপ্রসাদ বললেন—'দারোগাসায়েব, আপনি যদি সব কিছুতেই উদ্দেশ্যের গন্ধ খুঁজে বেড়ান, তাহলে আমার কিছু করার নেই। ওটা আপনার একটা মানসিক ব্যাধি। আপনি বরং এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।'

দারোগাসায়েব এবারও নিঃশব্দে অপমানটা হজম ক'রে নিলেন। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'আমি কিন্তু আপনাদের সাবধান ক'রে দিয়ে যাচ্ছি। অন্য জায়গায় গিয়ে আপনারা যা খুশি ক'রে বেড়ান, আমি কিছু বলব না। কিন্তু আমার এরিয়ায় শান্তিভঙ্গ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না। থানায় গিয়ে আমি ও. সি. সায়েবের কাছে আপনাদের সমস্ত ব্যাপারটাই রিপোর্ট করব।'

নিখিল বললেন—'দারোগাসায়েব, আপনার দৌড় তো ঐ রিপোর্ট করা পর্যন্তই। তা, কাজটা তো আপনি থানায় ব'সেই করতে পারতেন। কষ্ট ক'রে এই ধুলো-কাদার রাস্তা মাড়িয়ে আবার এতদূরে আসা কেন ?'

দারোগা নিখিলের দিকে রোষ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দলবল নিয়ে চলে গেলেন। অনন্ত বিশ্বাসের বাড়ী আর একবার জলযোগাদি সেরে ফিরে গেলেন থানায়।

দারোগার চলে যাবার পর চাষীদের মধ্যে নানারকম গুঞ্জন উঠল। দারোগার এই আগমনের পিছনে যে অনন্ত বিশ্বাস প্রমুখ জোতদারদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে, তা তারা অনুমান করতে পারল।

বিলভাসানের চাষীদের সংঘবদ্ধ জাগরণে দারোগাও যে কিঞ্চিৎ ভীত হয়েছেন, তা তাঁর কথাবার্তা এবং আচরণ দেখলেই বোঝা যায়। তিনি একা আসতে সাহস পাননি। বন্দুক লুকিয়ে রেখে এসেছেন। আর থানার আশপাশ থেকে কিছু বয়স্ক মোল্লা-মৌলবীদের সঙ্গে ক'রে এনেছেন। ইদানীং, এ-অঞ্চলের ধর্মান্ধ মুসলমানদের মধ্যে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' জিগির ক্রমশঃই সোচ্চার হয়ে উঠছে। এই জিগিরের পৃষ্ঠপোষক কিছু ব্যক্তিকেই সঙ্গে ক'রে এনেছেন দারোগাসায়েব।

বিলভাসানের চাষীরা আরও একটা জিনিস বুঝল। বিলভাসানের চাষীদের মধ্যে বাইরের নেতাদের আগমনকে পুলিশ ভালো চোখে দেখছে না। কিন্তু তবু তাঁরা যাহোক মাঝে মাঝে আসছেন, আবার চলে যাচ্ছেন। কিন্তু সত্যপ্রসাদের স্থায়ী বসবাসটাই পুলিশের সর্বাপেক্ষা দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। এবং তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে অনন্ত পুলিন প্রভৃতি জোতদার। বিলভাসানে সত্যপ্রসাদের বসবাস যে যে-কোনো সময়েই বিঘ্নিত হতে পারে, এটা তাদের সহজ বুদ্ধিতেও ধরা পড়ল।

সুতরাং সত্যপ্রসাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন হ'লো। কিন্তু সত্যপ্রসাদকে এ-বিষয়ে কিছু বলতেই তিনি হেসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন এবং অচিরেই চাষীদের অনুমান সত্য হ'লো।

চৈত্র মাসের সপ্তাহখানেক থাকতে সারা বিলভাসান অঞ্চল চড়ক-পুজোয় মেতে উঠল। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় 'দেল' বা 'পাট' জাগানো হ'লো। নিম-কাঠের তৈরী তেল-সিন্দুর মাখা 'পাট' মাথায় নিয়ে গাজন-সন্ন্যাসীরা গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা মেঙ্গে বেড়ালো। 'অষ্টকে'র দলের হরগৌরী আর অষ্টসখীর রাধা-কৃষ্ণলীলার গানের বিলম্বিত সুরে বিলভাসানের বাতাস হয়ে উঠল মন্থর। বেহালার সুরে জাগল করুণ মূর্ছনা। সঙ্গে ঢাকের শব্দ। বিলভাসানের চাষীদের হাতে এখন কাজ-কাম কম। ফলে চৈত্র-শেষের শীতল সকাল, উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন, প্রশান্ত সন্ধ্যা—সমস্ত সময়টা জুড়ে তারা বাবা মহাদেবের অনুচর সেজে আমোদিত হয়ে রইল।

চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন দুপুরের দিকে হঠাৎ বাঁকপুর গ্রামে পুলিশ এলো। গ্রামের মধ্যেকার সোজা রাস্তা দিয়ে এলোনা। গ্রামের বাইরের ঘুর-পথ দিয়ে এসে পুলিস উঠল কৈলাসের বাড়ীতে। গ্রামের জোয়ান ছেলেরা, বয়স্ক চাষীরা—সবাই তখন বাবা বুড়োশিবের থানে চৈত্র সংক্রান্তির অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। বিলভাসানের অন্য সব গ্রামেও আজ একই প্রস্তুতি চলছে। কৈলাসের বাড়ীতে যখন পুলিশ এলো, তখন বাড়ীতে পুরুষ মানুষ বলতে সত্যপ্রসাদ একা। আজও এসেছেন মেজদারোগাসায়েব। সরাসরি এসে সত্যপ্রসাদকে বললেন—'সত্যবাবু, আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।'

সত্যপ্রসাদ বললেন—'আমার অপরাধ?'

—'অপরাধ নিশ্চয়ই আছে। আপনি থানায় চলুন, বড়োবাবু আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।'

সত্যপ্রসাদ বললেন—'আমার নামে কি ওয়ারেন্ট আছে?'

দারোগা বললেন—'আপনার নামে কোনো গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা নেই। কিন্তু বড়োবাবুর হুকুম, থানায় আপনাকে একবার যেতেই হবে।'

সত্যপ্রসাদ দেখলেন—দারোগার পিছনে সাত আটজন কনস্টেবল। আজ তারা কেউ নিরস্ত্র নয়। সকলেরই হাতে বন্দুক। সত্যপ্রসাদ বুঝলেন, গ্রেফতার এড়ানো সম্ভব নয়। একটুক্ষণ চিন্তা ক'রে বললেন—'ঠিক আছে, চলুন।'

এত সহজে সত্যপ্রসাদের সম্মতিতে বিস্মিত হলেন দারোগা। বললেন—'আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিছু সঙ্গে নিতে চাইলে নিতে পারেন।'

—'ধন্যবাদ। কিছু প্রয়োজন হবে না। চলুন।' —গ্রামের দিকে বেড়াতে বেরোনোর জন্য সত্যপ্রসাদ আগেই ধুতি জামা পরেছিলেন। সেই পোষাকেই রওনা হলেন পুলিশের সঙ্গে। এবারও পুলিশ গ্রামের বাইরে দিয়ে থানার অভি-মুখে অগ্রসর হ'লো।

বিকেলের দিকে খবরটা চারিদিকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। চড়ক-পুজোর কাজকর্ম ফেলে সবাই এসে ভেঙে পড়ল কৈলাসের উঠোনে। আশপাশের

গ্রাম থেকেও যে যেমন খবর পেলো, ছুটে এলো। ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই দিশেহারা, মোহ্যমান। এ-রকম একটি পরিস্থিতিতে কী তাদের করণীয়, কোন্ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সঙ্গত, কিছুই স্থির করতে না পেরে আরো বিহ্বল হয়ে ব'সে রইল। বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বজ্রাহতের মতো বসে রইল কৈলাস। নির্বাক বেদনায় চারিদিকে একটি অসহনীয় পরিবেশ।

হঠাৎ মাঠ-ক্ষেত ভেঙ্গে ক্ষিপ্ত চিতার মতো ঝড়ের বেগে ছুটে এসে হাজির হ'লো ফুলি। অস্বাভাবিক চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করল—'ভাইডিরে নাকি পুলুশে ধরে নিয়ে গেছে?'

ফুলির কথায় কেউ কোনো জবাব দিলো না। শুধু ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সবাই মাথা নিচু করল।

ফুলি আবার গর্জন ক'রে উঠল—'কথা কচ্ছিস না যে হারামজাদারা? মুখে কথা নেই ক্যানো তোদের? ওরে তোরা কথা ক—।'

আগ্নেয়গিরির মতো ফুঁসতে লাগল ফুলি। হঠাৎ জলধরকে দেখে ছুটে গিয়ে শক্ত হাতে তার ঘাড়টা চেপে ধ'রে বলল—'সব চুপ মা'রে থাক্‌লি যে! কথার জবাব দে হারামজাদারা, নয়তো কোনোডার ছাড়ান্ নেই আজকে!'

জলধরও শোক-বিহ্বল। তার উপর ফুলির এই আক্রমণ। কাঁদো কাঁদো মুখে বলল—'আমরা আগে কিছু জান্‌তি পারিনি মাওই। শিব-ঠাউরির থানের কাজ করতিছিলাম সবাই—'

আবার ফুঁসে উঠল ফুলি—'শিব ঠাউর? কিসির শিব ঠাউর? প্যাটে যখন ভাত থাকে না, কোন্ শিবঠাউর আগোয়ে আসে রে তোদের কাছে? আর এই যে মানুষটা, রাজার সংসার ফেলে থুয়ে তোদের জন্যি ভিখেরী সাজলো, এর কথাডা তোরা একবারও ভাবলি না? এমন ভ্যাড়ার ভ্যাড়া তোরা যে, তোরা থাকতিও আমার ভাইডিরে পুলুশে আ'সে ধ'রে নিয়ে গেলো?'

কারোরই কিছু বলার নেই। নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজে সবাই ফুলির বাক্যবাণ সহ্য করতে লাগল।

খবরটা পৌঁছেছিল সৌরভীরও কানে। এমনিতেই তার নারী-সুলভ লাজ-লজ্জা কম। তার উপর সত্যপ্রসাদের এই গ্রেফ্‌তারের সংবাদে যেন একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হ'লো কৈলাসের বাড়ীতে। এসে দেখে, সবাই মাথা নিচু ক'রে ব'সে আছে। আর, ফুলি তর্জন-গর্জন করছে।

খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকল সৌরভী। হঠাৎ তার মনে হ'লো, যতীনকে তো দেখছে না। যতীন কি জানে না? সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে হাজির হ'লো যতীনের বাড়ী। সৌরভীকে এভাবে ছুটতে দেখে এগিয়ে এলো সরমা—'কি রে, এতো ছুট্টতিছিস্ ক্যানো?'

—'যতীনদা কই?'

সরমা একটু হেসে বলল—'তোর দাদা সব্যরে নিয়ে বেড়াতি গেছে সব্যর মামা-বাড়ী। সব্য বায়না ধরিছিলো মামা-বাড়ী যাবে বলে। তা, তোর দাদারও তো এখন চত্তির-সংক্রান্তির জন্যি স্কুল ছুটি।'

সৌরভী তাড়াতাড়ি বলল—'তুমি কিছু খবর পাওনি বৌদি ?'

সরমা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'না তো, কিসির খবর ?'

সৌরভী এক নিশ্বাসে বলে গেলো—'বৌদি, সত্যদারে পুলিশ ধ'রে নিয়ে গেছে।'

—'বলিস কি রে ? এদিকে আয়তো দেখি সব শুনি।' —সৌরভীর হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গিয়ে বারান্দায় একটা মাদুর বিছিয়ে ওকে বসতে দিলো সরমা।

সৌরভী বলল—'আমি বেশী কিছু বলতি পারবো না বৌদি। খবর পা'য়েই কৈলাস-জ্যাঠাদের বাড়ী আ'সে দেখি, সবাই ব'সে আছে। যতীনদারে না দেখে, তাড়াতাড়ি তোমাদের বাড়ী আসলাম।'

খবরটা শুনে সরমাও বিস্ময়ে ক্ষোভে মাথায় হাত দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকল।

বিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল সৌরভী—'কি হবে বৌদি ?'

সরমা শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলল—'কি আর হবে ? পুলিশ কতদিন আর ওনারে আটকায়ে রাখবে ? উনি তো কোনো দোষ করেন নি ?'

হঠাৎ সরমার কোলের উপর আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল সৌরভী—'কবে উনি ফিরে আসবেন বৌদি ?'

সরমা যতই ওকে টেনে তুলবার চেষ্টা করে, সৌরভী ততই আরো জোরে সরমাকে জড়িয়ে ধ'রে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে থাকে।

বিলভাসানের সকলের একান্ত প্রিয়জন সত্যপ্রসাদকে আকস্মিকভাবে পুলিশ ধ'রে নিয়ে যাওয়ায় সকলেই আজ বিমর্ষ। সকলেরই চোখ অশ্রুসিক্ত। কিন্তু সরমার কোলের উপর আকুল কান্নায় লুটিয়ে থাকা সৌরভীর দিকে তাকিয়ে সরমা বুঝল, —সব কান্না আর এ-কান্না এক নয়। এ-কান্নার ভাষা আলাদা। এত দুঃখেও হেসে ফেলল সরমা—

—'তুই মরিছিস্ পোড়ারমুখী !'

সরমার কোলের মধ্যে মুখ গু'জে সৌরভী গুমরে গুমরে বলে—'এ-কথা তুমি কাউরে ব'লে না বৌদি। কিন্তু ওনারে না দেখে যে আমি একদিন থাকতি পারিনা। আমি আর কিছু চাইনা বৌদি, শুধু দিন গেলি এট্টু চোখের দেখা দেখতি চাই। তাও কি আমি পাবো না বৌদি ?'

সৌরভীর এ ভালবাসার কী মূল্য আছে, বুঝতে পারে না সরমা। একথা কাউকে বলার নয়। কোনোদিনই কাউকে বলবারও নয়। স্বামী-ত্যক্তা উচ্ছৃঙ্খল এই মেয়েটিকে সরমা মনে মনে বরাবরই একটু অপছন্দই করে। সত্যপ্রসাদকে জড়িয়ে এখন তার এই আচরণকেও সরমা সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু তবু এই মুহূর্তে সৌরভীর উপর সে কঠোরও হতে পারে না। সৌরভীর একমাথা আলুথালু চুল, চোখের জলে প্লাবিত মুখ, কান্নার দমকে ফুলে ফুলে ওঠা দেহকে কোলের কাছে জড়িয়ে সরমার সারা অন্তর পরম স্নেহে, নিমগ্ন সহানুভূতিতে মেদুর হয়ে ওঠে।

সরমা আস্তে আস্তে সৌরভীর পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দেয়।

॥ চৌদ্দ ॥

পরের দিন ছিল চৈত্র-সংক্রান্তি। চড়কপুজোর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিন। হাজরা-সন্ন্যাস, কাঁটা-সন্ন্যাস ইত্যাদি জরুরী কাজগুলোই এখনো বাকি। সন্ধ্যেবেলায় 'আড়ং' বা মেলার আয়োজন। ঠাকুর দেবতার কাজ। কোনোটাই ফেলে রাখা যায় না। সুতরাং বিলভাসানের চাষীরাও সব কাজই টেনে তুলল। কিন্তু কিছুতেই যেন তাদের মন বসল না। সব কাজই শেষ হ'লো দায়-সারা ভাবে। সত্যপ্রসাদের আকস্মিক গ্রেফতারে তাদের মনের মধ্যে যে নিরুপায় বিষণ্ণতার ভার চেপে বসেছিল, দিনে রাতে খেতে শুতে কাজকর্মে কোনো সময়েই তা থেকে তারা সহজ হতে পারল না।

দিন সাতেক বাদে সত্যপ্রসাদ ফিরে এলেন। বিলভাসান থেকে সত্যপ্রসাদের প্রস্থানটা যেমন ছিল আকস্মিক, ফিরে আসাটাও তেমনি। বৈশাখের শুরুতেই বেশ এক পসলা বৃষ্টি হওয়াতে ক্ষেতে বেশ 'জো' এসে গিয়েছিল। ফলে চাষীদের নিশ্বাস ফেলার ফুরসত ছিল না। এরই মধ্যে একদিন বিকেলের দিকে ফিরে এলেন সত্যপ্রসাদ। নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারায় থানার কর্তৃপক্ষ কিছু উপদেশ আর সাবধান-বাণী শুনিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

এই ক'দিনে সত্যপ্রসাদের চেহারাটা একটু কৃশ হয়েছে। বেশ-ভূষাও কিছুটা মলিন। কিন্তু বিলভাসানে ফিরে আসতেই বিলভাসানের চাষীদের একান্ত প্রিয় সত্যপ্রসাদ যেন নিমেষেই দেবতার স্তরে উন্নীত হলেন। থানা থেকে ছাড়া পাবার পর ছয় সাত মাইল রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে বিকেলের দিকে বাঁকপুর স্কুলের বটতলায় এসে হাজির হয়েছিলেন সত্যপ্রসাদ। খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই বিলভাসানের ক্ষেত-প্রান্তর, ঘর-বাইরের কাজ-কর্ম ফেলে চাষীরা এসে ঘিরে ধরেছিল সত্যপ্রসাদকে। ফুলিও তার নারী-বাহিনীর অনেককে নিয়ে এসে হাজির হ'লো।

প্রিয়-মিলনের সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সবাই নেচে-কুঁদে, হেসে-গেয়ে পরিবেশটাকে মাতিয়ে তুলল। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেলো, চাষীদের মনে সত্যপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সূক্ষ্ম একটি অলৌকিকতার সংযোগ ঘটেছে। রাখাল ছেলেদের মেঠো গানের মধ্যে তার সোচ্চার প্রকাশ ঘটল। সত্যপ্রসাদ যে অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন, থানার দু'চারটে তুচ্ছ পুলিশ-দারোগার ক্ষমতা নেই তাঁকে আটকে রাখার—এ-জাতীয় বিশ্বাস সরল সহজ-বিশ্বাসী চাষীদের মনে ক্রমশঃই দৃঢ়মূল হয়ে উঠল।

এরপর আরো জোরালো হয়ে উঠল সত্যপ্রসাদের সান্ধ্য বৈঠক। প্রতিদিন তাঁর সভায় উপস্থিত থাকাটা চাষীদের কাছে একটি অতি আবশ্যকীয় কর্মে পরিণত হ'লো। ফুলির নারী-বাহিনীও দিনে দিনে সুসংগঠিত হয়ে উঠল। সকলেই যেন কিসের এক প্রত্যাশার স্বপ্নে বিভোর।

ইদানীং ধনু পাগল সত্যপ্রসাদের খুব অনুগত হয়েছে। বাঁকপুরে আসার কিছুদিন বাদে একদিন যতীনদের বাড়ী থেকে ফেরার পথে এই ধনু পাগলকে

দেখে কী ভয়ই না পেয়েছিলেন সত্যপ্রসাদ। অন্ধকারে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আচমকা লোককে ভয় দেখানোর স্বভাব ধনুর এখনো পুরো মাত্রায়ই আছে। মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে তুল-কালাম কাণ্ডও ক'রে বসে। কেউ ভাত খেতে দিলে কখনো চুপচাপ ব'সে খায়। আবার কখনো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একশা করে। এসব পুরোনো অভ্যাস সবই তার পুরোমাত্রায় বজায় রয়েছে। তবে নতুন যেটা যুক্ত হয়েছে, সেটা হচ্ছে, আচমকা উপস্থিত হয়ে সত্যপ্রসাদের পাশে চুপ ক'রে বসে থাকা। বিশেষ ক'রে, সত্যপ্রসাদ যখন দরদ দিয়ে কোনো কিছু চাষীদের কাছে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝান, তখন ধনু নিবিষ্ট হয়ে সত্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। বদ্ধ উন্মাদ। কোনো কথা যে একবর্ণ বুঝতে পারে, তা মনে হয় না। তবু চুপচাপ বসে থাকে। আচমকা হয়ত আবার উঠে দাঁড়িয়ে একছুটে কোথাও পালিয়ে যায়।

বিলভাসানের এসব সভা-সমিতির খবর বাতাসে বাতাসে ঘোরে। লোকের মুখে মুখে চারিদিকে ছড়ায়। ভিন্ গাঁয়ের হাটুরে চাষীরা হাটের মাঝে সওদা-পাতি কেনার ফাঁকে বিলভাসানের চাষীদের চোখে চোখ রেখে কী যেন জানতে চায়। একজন বঞ্চিত মানুষের দুঃখ বেদনা শপথ অঙ্গীকার অন্য আর একজন বঞ্চিত মানুষের চোখের আলোয় স্ফুলিঙ্গ হয়ে জ্বলে উঠতে চায়।

একদিন বাঁকপুরে হঠাৎ এসে হাজির হ'লো গগন ঢং। সেই একই রকম বিচিত্র বেশভূষা। এসেই কৈলাসকে জড়িয়ে ধ'রে বলল—'আমি আবার আস্‌লাম গো দাদা।'

কৈলাস পরম পুলকিত হয়ে তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল। গগন বলল—'আমারে কিন্তু এবার একটু ঠাঁই দিতি হবে দাদা। ঘর বাঁ'ধে বাস করব।'

কৈলাস হাসে—'বুনো টিয়ে খাঁচায় ঢোক্‌বে! এ যে তাজ্জব কথা কও গগন ভাই! তোমারে বাঁধবে এমন ঘর কোনো বিশ্‌করম ঠাউরেরও সাধ্যি নেই যে গ'ড়ে দেয়। তা, তোমার মতলবডা কি কও দেখি? তুমি হ'লে খ্যাপা গোসাঁই। তোমার আবার থিতু হবার সাধ জাগলো ক্যানো?'

গগন ঢংয়ের চারপাশে আগের মতোই পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের ভিড় জমেছে। কিন্তু আজ যেন গগনের ঢং-টং আর মস্‌করা একটু কম।

কৈলাসের কথায় গগন দূরের মাঠের দিকে একটু-কাল চুপ ক'রে তাকিয়ে থেকে বলে—'তুমি ঠিকই কইছো কৈলাস দাদা। খ্যাপা গোসাঁই এবার ঘর নিতি চায়।' —গগনের কণ্ঠস্বর থমথমে, ভরাট হয়ে ওঠে—'আমার মনে এক নতুন সাড়া পাচ্ছি দাদা। তোমাদের এই বিলভাসানে এক মহাযজ্ঞ শুরু হতি যাচ্ছে। যজ্ঞের আগুন কেবল ধোঁয়াচ্ছে। এরপর ধিকিধিকি জ্বলবে। তা, সে যজ্ঞের আগুনে আমিও দুই একখানা কাঠ গুঁজে দিতি চাই দাদা!'

গগনের হেঁয়ালি-ভরা কথাগুলো কৈলাস সব অনুধাবন করতে পারল না। কিন্তু কৈলাসের ভিটে-বাড়ীর নিচে যে উলুখড়ের ক্ষেত, তার এক কোণে একটু-খানি জায়গা ছেড়ে দিলো। গগন কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে বাঁশ উলুখড় দিয়ে চমৎকার বাহারী একখানা চৌরী ঘর তৈরী করে ফেলল। এক-পাশে তার শোবার

জন্য বাঁশের মাচা। আর একপাশে করল কামারশালা। হাপর, লোহা, যন্ত্রপাতি নিয়ে রীতিমতো জমজমাট কামারশালা।

এ অঞ্চলে চাষীদের গ্রামে কোনো কামারশালা নেই। দা বঁটি খোন্তা কুড়ুল কাস্তে ইত্যাদির দরকার হ'লে বাসুন্দের হাট ছাড়া গতি নেই। গগনকে কামারশালা করতে দেখে আশেপাশের লোকজনেরা তেমন গুরুত্ব দেয়নি প্রথমে। ভেবেছিল, এটা বোধহয় গগনের আর একটা কোনো নতুন ঢং মস্‌করা হবে। কিন্তু গগনের কামারশালা যখন সত্যি সত্যি চালু হ'লো, তখন তাকে বাহবা দিলো লোকেরা ; এ অঞ্চলে একটি কামারশালা সত্যিই দরকার ছিল। চাষী-বাড়ীতে দা বঁটি কাস্তে খোন্তা কুড়ুল—এগুলো সব সময়েই দরকার। আর, গগনের পাকা হাত যে এসব জিনিসও নিপুণভাবে গড়তে পারবে, এ বিষয়ে কারো সন্দেহ রইল না। বিলভাসানের অনেক দিনের একটা অভাব মিটল।

গগন কৈলাসের জমিতে আলাদা ঘর বেঁধে কামারশালা করল বটে, কিন্তু তার খাওয়া-দাওয়ার ভারটা কৈলাস নিজের বাড়ীতেই রাখল। অবশ্য গগন তার প্রতিদিনের খোরাকির খরচটা কৈলাসকে নিতে বাধ্য করালো।

গগন ধীরে ধীরে তার কামারশালায় ব'সে মেতে উঠল এক অদ্ভুত খেলায়। সারাদিন ধ'রে সে চাষীদের ঘর-গেরস্তালির নিত্য প্রয়োজনীয় লৌহজাত জিনিস তৈরী করে। চাষীদের কাছে সেগুলি ন্যায্য দামে কেনাবেচাও করে। কিন্তু সন্ধ্যে হ'লেই শুরু হয় তার আসল কাজ।

এক অতন্দ্র সাধকের মতো গগন হাপর টানে। শক্ত হাতে গন্‌গনে লোহায় হাতুড়ি পেটায়। তারপর সেই লোহায় শাণ দেয়। ধীরে ধীরে এক একটি লৌহ-খণ্ড তার নিজস্ব আকৃতি ছেড়ে কখনো হয়ে ওঠে শাণিত বল্লমের ফলা। কখনো রামদা। কখনো সূচীমুখ তীরের ফলক। বাঁশের মাচার নিচে চট দিয়ে সেগুলি সতর্ক যত্নে ঢেকে রাখে গগন।

কোনোদিন কোনো চাষী হয়ত দা কুড়ুল গড়াতে এসে মুখ ফস্‌কে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলে—'ও গগন দাদা, এসবগুলো আবার কি বানাচ্ছো ?'

গগন খিঁচিয়ে ওঠে—'ফ্যাচোর-ফ্যাচোর বকিস্ না তো। যে কাজে আইছিস, কাজ সা'রে চলে যা। আমার কাজের হিসেব দিয়ে তোর কাজডা কি?'

গগনের সেই তাতানো লোহার মতো গন্‌গনে মুখের দিকে তাকিয়ে আর কেউ কোনো কথা বলতে সাহস পায় না।

এক কান দু'কান হয়ে কথাটা সত্যপ্রসাদেরও কানে উঠল। এই বিচিত্র রহস্যময় মানুষটির সঙ্গে সত্যপ্রসাদ নিজে কখনো গায়ে প'ড়ে ভাব জমানোর চেষ্টা করেননি। যদিও তাঁরা দু'জনে খুব কাছাকাছিই থাকেন। গগনও সত্যপ্রসাদের মুখোমুখি পড়লে একটু হেসে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। অবশ্য তার আচরণের মধ্যে সব সময়েই সত্যপ্রসাদের প্রতি একটি সম্ভ্রমের ভাব লক্ষ করা যায়।

সত্যপ্রসাদ একদিন হঠাৎ সন্ধ্যেবেলায় গগনের কামারশালায় এসে হাজির হলেন। গগন তখন নেহাইয়ের উপর উত্তপ্ত একটা লৌহ-খণ্ডকে সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধ'রে ঠাই ঠাই ক'রে হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে। সারা গা দিয়ে দর-দর ক'রে

ঘাম নামছে। হাতুড়ি পেটানোয় সহকারী হিসেবে তাকে সাহায্য করছে কণ্ঠীরাম। কৈলাসের কাছে কণ্ঠীরামের সব বৃত্তান্ত শুনে গগন তাকে কামারশালার কাজে সহকারী বানিয়ে নিয়েছে। কণ্ঠীরামও গগনের খুব অনুগত হয়ে পড়েছে। কাজ-কর্মও করে বেশ মন দিয়ে।

সত্যপ্রসাদকে আচমকা কামারশালার মধ্যে ঢুকতে দেখে গগন একটু অবাক হ'লো। গামছা দিয়ে বুক পিঠের ঘাম মুছল। কণ্ঠীরামকে বলল—'যা কোষ্ঠে, আজকের মতো তোর ছুটি।'

তারপর হাপরের আগুন নিভিয়ে দিয়ে বলল—'চলেন সত্যবাবু, বাইরে গিয়ে বসি। ঘরে বড়ো গরম।'

ঘরের বাইরে কয়েক আঁটি শুকনো উলুখড় পড়ে ছিল। তার একটাকে আসনের মতো বিছিয়ে দিয়ে গগন বলল—'বসেন এটার পরে।' তারপর নিজেও পাশে ব'সে বলল—'বলেন, এবার আগমনের হেতু কি!'

গগনের শুদ্ধ বাংলা শুনে একটু হেসে সত্যপ্রসাদ বললেন—'আগমনের হেতু একটা কিছু আছে বইকি।'

গগন জিজ্ঞাসু চোখে সত্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সত্যপ্রসাদ বললেন—'তোমার কামারশালাটা নাকি অস্ত্র-শালায় পরিণত হচ্ছে। দাগুলো সব রামদা হয়ে যাচ্ছে। তাই একটু দেখতে এলাম।'

সত্যপ্রসাদের কথায় গগনও এবার হেসে ফেলে—'দা যদি রামদা হয় সত্যবাবু, তাহলে আপত্তিটা কিসির? আপনারে শাস্তরের কথা কী আর কবো! জানেনই তো, কেষ্ট ঠাকুরও বাঁশী ছেড়ে অসি ধরিছিলেন; অসি না হোক, রথের রশি তো ধরিছিলেন। তা, আমার কামারশালা যদি অস্তরশালা হয়, আমার দা যদি রামদা হয়, তাহলি এতো দোষ নেন ক্যানো?'

সত্যপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বললেন—'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এর উদ্দেশ্য কি? কি হবে তোমার এসব অস্ত্র দিয়ে?'

গগনের চোখে মুখে যেন এ-কথায় ভিন্ন ধরনের একটা উদ্দীপনা খেলা ক'রে গেলো—'জেগে ঘুমোয়ে লাভ নেই সত্যবাবু! যে আগুন আপনি আজ এখানে চাষীদের মধ্যি জ্বেলে দেছেন, এ আগুন অনেকদূর ছড়াবে!'

সত্যপ্রসাদ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—'কিন্তু আমি তো চাই মানুষের জাগরণ। মানুষের একতার শক্তিই সেখানে বড়ো কথা। জোট বেঁধে যদি চাষীরা একবার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, তাহলে সেটাই হবে আন্দোলনের আসল শক্তি। সেখানে অস্ত্র-বলের তো কোনো দরকার নেই।'

—'একথা ভুল সত্যবাবু। আপনার ঐ চাষীরাই দেখবেন একদিন অস্তর চাইবে। আপনি ওদের জাগায়ে দেছেন। চিরকাল ওরা প'ড়ে প'ড়ে মার খাইছে। আর খাবে না। এবার ওরা মার ফিরোয়ে দিতি চাইবে।'

কিছুক্ষণ বাদে সত্যপ্রসাদ উঠে পড়লেন। একটা জটিল চিন্তার জাল ও'র মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকল। তাহলে কি গগনের কথাই ঠিক? চাষীদের দিয়ে জোতদার জমিদারের বিরুদ্ধে যে গণ-প্রতিরোধ তিনি গ'ড়ে তুলতে চাইছেন,

শেষ পর্যন্ত তা কি সত্যিই সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হবে ?

এই ক'মাসে তিনি বিলভাসানের চাষীদের যতটুকু দেখেছেন, বা বুঝেছেন, তাতে তাঁর মনে হয়েছে, এমনিতে এরা নিরীহ, শান্তিপ্রিয়। এদের মধ্যে অবশ্য মাঝে মাঝেই দু'চারজনকে দেখা যায়, যারা অতি দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। লেঠেল সড়কি-বাজ হিসেবে খ্যাতি আছে। কা'জে-দাঙ্গার নাম শুনলে তারা উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে। কয়েকদিন আগে বনখালির রঘুরাম সর্দারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। রঘুরামকে প্রথমে দেখেছিলেন কৈলাসের নৌকা-বাইচের দিনে। এখন রঘুরাম মাঝে মাঝেই কৈলাসের বাড়ী আসে। সত্যপ্রসাদের সঙ্গেও নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়। প্রৌঢ় বয়স। কিন্তু এখনো কী বলশালী তেজী চেহারা ! রঘুরাম গর্ব ক'রে বলছিল, তার কোন্ এক পূর্ব-পুরুষ নাকি রাজা সীতারামের সৈন্যবাহিনীতে সর্দারের পদ লাভ করেছিল। রঘুরাম সর্দারের চেহারাখানা দেখলে তার এ উক্তিকে অমূলক আস্ফালন ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এখনো রঘুরাম সড়কি হাতে রুখে দাঁড়ালে তার মহড়া নিতে অতি বড়ো সাহসীরও বুক কাঁপে। কা'জে-দাঙ্গা ভালও বাসে রঘুরাম।

রঘুরামের মতো যুদ্ধপ্রিয় লোক এদিকে মাঝে মাঝেই দু'চারজন পাওয়া যায়। কিন্তু বিলভাসানের চাষীদের সঙ্গে মিশে দেখেছেন সত্যপ্রসাদ, রঘুরামের মতো লোকের সংখ্যা এখানে খুব বেশী নেই। মূলতঃ এখানকার চাষীরা নির্বিরোধী ভালো মানুষ। বরং দীর্ঘদিনের নানা বঞ্চনা আর উৎপীড়ন সহ্য ক'রে এদের মধ্যে এক ধরনের সহনশীলতা জন্মলাভ করেছে। জোতদার, জমিদার আর নানা দেব-দেবতা— এদের বিরুদ্ধে যে কোনো কথা বলা যেতে পারে, এ তারা দূরতম কল্পনাতেও মনে আনতে পারে না। গ্রামে নায়েব বা পুলিশ এলে এদের ভয়ের অন্ত থাকে না।

এদের দেখে সত্যপ্রসাদের একটা তুলনাই মনে আসে। এখানে বাঁচ্ড়া জমিতে মাঝে মাঝে রাখাল ছেলেদের এঁড়া গরু চরাতে দেখেছেন। বারো কি চোদ্দ বছরের এক একটা ছেলে। বিশালাকৃতি দশ বারোটা ষণ্ডা দামড়াগরু চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সেগুলোর পাশে ঐ একরত্তি রাখাল ছেলেটার কী-ই বা সামর্থ্য ! কিন্তু কোনো কারণে সেই ক্ষুদে রাখাল ছেলেটি যদি কোনো অবাধ্য দামড়া গরুকে শাসন করার জন্য একটুখানি লাঠি নিয়ে তাড়া ক'রে আসে, তাহলে গরুটি অবিলম্বে ভয় পেয়ে সোজা পথে ফিরে আসে। এত শক্তিশালী, কিন্তু ঐটুকু পুচকে ছেলের ভয়ে কাবু। বিলভাসানের জোয়ান-মদ্দ চাষীগুলিকে দেখলে ঐ বলদগুলোর কথাই মনে পড়ে সত্যপ্রসাদের। দৈহিক শক্তি এদের যতখানি, মানসিক জোর সে পরিমাণে নিতান্তই নগণ্য। একটা মজ্জাগত ভয় সব সময় যেন এদের জড়-সড় করে রেখেছে। ধীরে ধীরে এদের মধ্যে একটা চেতনার বিকাশ ঘটছে, সংঘবদ্ধতা দানা বেঁধে উঠছে, এটা লক্ষ করেছেন সত্যপ্রসাদ। কিন্তু অস্ত্রহাতে এরা জোতদারের অত্যাচারের মোকাবিলা করবার জন্য রুখে দাঁড়াবে, এটা যেন কিছুতেই সত্যপ্রসাদ বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারলেন না। কিন্তু গগনের কথাগুলোকেও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না মন থেকে।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেলো, গগনের কথাই ঠিক। প্রতিদিন সত্যপ্রসাদের সান্ধ্য-বৈঠক যেমন জমজমাট হয়ে উঠতে লাগল, তেমনি একটু গভীর রাতে গগনের

কামারশালাতেও লোকজনের আনাগোনা বেড়ে গেলো। এদের মধ্যে অধিকাংশই তরুণ যুবক। চোখে চোখে কথা হয়। দরদাম ঠিক হয়। তারপর পরনের কাপড়ের আড়ালে রামদা, সড়কির ফলা, কিম্বা অন্য কোনো অস্ত্র পাচার হয়ে যায়। প্রতি গ্রামেই অস্ত্র-শিক্ষার এক একটা গোপন মহড়া-কেন্দ্র গ'ড়ে ওঠে। সব গ্রামেই দু'একজন ওস্তাদ আছে। তারাই এগিয়ে আসে শিক্ষাদানের কাজে।

বিলভাসানের চাষীদের মধ্যে মানসিক চেতনার সঙ্গে ভিন্নতর এই ব্যাপক প্রস্তুতিও কিছুদিনের মধ্যে বেশ লক্ষণীয় হয়ে উঠল।

॥ পনেরো ॥

শ্রাবণ মাসটি বিলভাসানের চাষীদের কাছে একটি বিশেষ গুরুত্ব বয়ে নিয়ে এলো। যে উত্তেজনার আগুন তাদের মনে ধিকি ধিকি ক'রে ধোঁয়াচ্ছিল, তার থেকে হঠাৎ ছিটকে পড়ল একটি বড়ো আকারের স্ফুলিঙ্গ। এবং সেই থেকে একটি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা দীপ্ত থেকে দীপ্ততর হয়ে উঠল।

বাঁকপুরের শ্রীপতি মণ্ডল অনন্ত বিশ্বাসের বিঘে তিনেক জমি বর্গাচাষ করত। বছর পাঁচেক ধ'রে শ্রীপতি একটানা জমিটা চাষ করছে। শ্রীপতি নিষ্ঠাবান পরিশ্রমী চাষী। জমিতে যেটুকু ফসল ফলার কথা, ওর যত্ন-আত্তিতে প্রতি বছর তার থেকে বেশীই ফলে। অনন্তও জানে সে কথা। সেজন্য শ্রীপতির কাছ থেকে ঐ তিন বিঘে জমি এই পাঁচ বছরে আর হাত-বদল করায়নি। কিন্তু শ্রীপতির উপর অনন্তর একটা আক্রোশ জমা হচ্ছিল ধীরে ধীরে। গ্রামে কোথায় কী হচ্ছে, সব খবরই রাখে অনন্ত। তার অধীনস্থ ভাগচাষীরা যে প্রতিদিন সত্যপ্রসাদের সভায় জমা হয়, এবং সেখানে নানা রকম শলা-পরামর্শ ফন্দি-ফিকির আঁটা হয়, এটা তার অজানা নয়। তার অধীনস্থ ভাগচাষীদের ডেকে তাদের সাবধানও ক'রে দিয়েছে অনন্ত। সত্যপ্রসাদের সভায় আনাগোনা করলে যে অবিলম্বে তাদের ভাগ-চাষের জমি হাতছাড়া হবে, এটা অনন্ত তাদের পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছে।

ভাগ-চাষীরা এ-সবের কোনো প্রতিবাদ করে না। অনন্ত যখন তাদের সামনে হম্বি-তম্বি করে, তখন চুপ ক'রে মাথা নিচু ক'রে ব'সে থাকে। অনন্ত যা বলে, তাতেই সায় দিয়ে মাথা নাড়ে। আবার সন্ধ্যেবেলায় সত্যপ্রসাদের বৈঠকেও উপস্থিত হয় যথারীতি।

অনন্তর জমিতে শ্রীপতি এবার পাট বুনেছিল। বাবুপাট। বিলভাসান অঞ্চলে দু'রকমের পাট চাষ হয়। কাল্‌ছিট আর বাবুপাট। বাবুপাটের আঁশ ভালো। যেমন দীঘল, তেমনি ধবধবে সাদা। এ-পাটে পয়সা বেশী। শ্রীপতির যত্ন-আত্তিতে অনন্তর তিন বিঘে জমিতে লক্‌লক্‌ ক'রে বেড়ে উঠেছে বাবুপাটের গাছগুলো। ভাদ্রের প্রথম দিকেই পাট কাটা যাবে। তারপর 'জাগ' দিয়ে পচিয়ে বেছে ধুয়ে গাঁট বেঁধে ঘরে তোলা। পাটের ব্যবসায়ীরা তো মুখিয়ে আছে। সেধে বাড়ী বয়ে

এসে মোটা টাকা দিয়ে এ পাট কিনে নিয়ে যাবে।

সত্যপ্রসাদের সভায় বর্গাদার চাষীদের সংঘবদ্ধতায় ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিল অনন্ত। এবার প্রথম ছোবলটা পড়ল শ্রীপতির উপর। শ্রীপতিকে একদিন ডেকে জানিয়ে দিলো—এর পর থেকে আর তাকে দিয়ে অনন্ত জমি চাষ করাবে না। অন্য বর্গাদার দিয়ে চাষ করাবে।

কথাটা শুনে বুকের মধ্যে হাহাকার ক'রে উঠেছিল শ্রীপতির। পাঁচ বছর ধ'রে এ-জমিটা চাষ করছে সে। কত পরিশ্রম ক'রে জমিটাকে সোনা-ফলানো জমিতে পরিণত করেছে। আর আজ অনন্তর খাম-খেয়ালে তার একটি কথাতেই জমিটুকু বেহাত হয়ে যাবে! ভাবতেই শ্রীপতির মাথার মধ্যেটা যেন শূন্য হয়ে আসে। আরো মারাত্মক কথা যেটা শুনল শ্রীপতি, তা হ'লো—পাট-গাছগুলো আর একটু দড় হ'লেই অনন্ত লোক লাগিয়ে গোপনে কেটে ফেলবে। শ্রীপতিকে পাটের ভাগ থেকেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হবে।

ক'দিন ধ'রে শ্রীপতি অসহায় অক্ষম ক্ষোভে গুমরে গুমরে বেড়ালো। তারপর একদিন কথাটা তুলল সত্যপ্রসাদের সান্ধ্য বৈঠকে।

সেদিন বেশ জমে উঠেছিল সভাটা। দুপুর বেলায় ঝোড়ো হাওয়ার মতো এসে হাজির হয়েছিলেন নিখিল রায়। নিখিল রায় মানেই প্রচণ্ড উত্তেজনা, জলন্ত জাগরণ। নিখিলের আগমন-বার্তায় সভায় সেদিন চাষীদের ভিড় যেন উপচে পড়তে লাগল।

প্রথমে সত্যপ্রসাদ চাষীদের কাছে তাদের জাগরণ এবং সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বক্তব্য রাখলেন। তারপর উঠলেন নিখিল। তাঁর সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গ সফর, উত্তরবঙ্গের বর্গাচাষীদের তীব্র জঙ্গী আন্দোলন, চাষীদের অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা রাখলেন নিখিল। আকাশ জুড়ে শ্রাবণের থমথমে মেঘ জমেছে। যে কোনো সময়ে প্রবলবেগে বর্ষণ শুরু হতে পারে। নিখিলের বক্তৃতা শুনতে শুনতে চাষীদের মুখও শ্রাবণ-মেঘের মতো থমথমে হয়ে উঠল। সমগ্র দেহের উত্তাল শিরা-উপশিরায় কিসের এক বর্ষণের সম্ভাবনায় টাল-মাটাল অস্থিরতা খেলা করতে লাগল।

হঠাৎ ভিড়ের অন্ধকার থেকে উঠে দাঁড়াল শ্রীপতি। চারিদিক একবার দেখে নিয়ে সত্যপ্রসাদ আর নিখিলের দিকে তাকিয়ে বলল—'বাবুমশায়রা, আমার এট্টা কথা নিবেদন করার আছে।'

সকলে কৌতূহলী হয়ে উঠল। আজকাল এই সান্ধ্য-বৈঠকে চাষীদের মধ্যে থেকেও দু'একজন দু'চার কথা বলে। কিন্তু শ্রীপতি বক্তৃতা দেবে, একথা কেউ ভাবতেও পারে না। অসম্ভব গায়ের জোর লোকটার। বা'চের নৌকায় হাল ধরতে ওর জুড়ি নেই। কিন্তু মনটা শিশুর মতো সরল। বুদ্ধিটাও একটু মোটা। সেই শ্রীপতি সভায় কিছু 'নিবেদন' করবে শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠল সবাই। কেউবা চাপা গলায় ওকে একটু ঠাট্টাও করল।

কিন্তু শ্রীপতি কোনো কিছু গায়ে মাখল না। হেঁড়ে গলা যথাসম্ভব মার্জিত ক'রে বলল—'বাবুমশায়রা, তোমরা তো আমাদের নিয়ে রোজ 'মিটিন' করো।

ভালো ভালো কথা কও। আমরা শুনি। কিন্তুক বাবুমশায়রা, কাজের কাজ তাতে কোন্‌ড়া হয়, কও দে'খি? আমি এবার পথে বস্‌বো বাবুমশায়রা। অনন্ত মোড়ল আমার ভাগচাষের জমিটুক এবার নিয়ে নেবে কইছে। পাট বুনিলাম। শুনৃতিচি, পাটের ভাগ আমারে দেবে না। ছালে-পুলে নিয়ে আমি কি ক'রে বাঁচবো বাবুরা? আমি তো কোনো অপ্‌রাধ করি নাই।'

কথাগুলো ব'লে গামছার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে ব'সে পড়ল শ্রীপতি। সমস্ত সভায় একটা অসহ্য গুমোট পরিবেশ তৈরী হ'লো। শ্রীপতিকে বক্তৃতা দিতে উঠতে দেখে যারা হাসছিল, তারাও নিঃশব্দে মাথা নিচু ক'রে ব'সে রইল। সকলের মনের চাপা উত্তাপটুকু যেন সরল অজ্ঞ শ্রীপতির কথার মধ্য দিয়ে ভাষা পেয়েছে।

পাঞ্জাবির দুই হাতার আস্তিন অনেকখানি গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন নিখিল। উদ্দীপ্ত চোখে অন্ধকারে জ্যাবড়ানো মুখগুলোর দিকে তাকালেন একবার। নিস্তব্ধ সভায় তাঁর কণ্ঠস্বর বেজে উঠল—'বন্ধুগণ, এইমাত্র কমরেড শ্রীপতি মণ্ডল আমাদের সামনে যে প্রশ্ন রেখে গেলো, তার উত্তর আমাদের ভাবতে হবে। এইভাবে প'ড়ে প'ড়ে মার খাবার দিন শেষ হয়েছে। প্রতিরোধ ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প পথ নেই। এবার থেকে বিলভাসানেও 'তেভাগার' ডাক দিতে হবে। জোতদারদের চাষীর কোল থেকে জমি কেড়ে নেবার অপচেষ্টা বুঝতে হবে। ভাগচাষীদের উপর সব রকমের অত্যাচারের চেষ্টা বানচাল করতে হবে। সবাই মিলে জোট বাঁধতে হবে, আঘাতের বদলে শত্রুকে হানতে হবে পালটা আঘাত। ইন্‌কিলাব—জিন্দাবাদ।'

নিখিলের ভাষণ শেষ হ'লো। তাঁর উত্তেজক বাক্‌-ভঙ্গিমা যে চাষীদেরও অনুপ্রাণিত করেছে, তা বোঝা গেলো। অন্ধকারের মধ্যে নিস্তব্ধ মুখগুলো তাকিয়ে রইল সত্যপ্রসাদের দিকে। সত্যপ্রসাদের অনুমোদন ছাড়া কোনো কাজই যে সম্ভব নয়, এটা বিলভাসানের সব চাষীই জানে।

নীরব মুখগুলো ভাষাহীন জিজ্ঞাসায় যে তাঁর মতামতের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে, সেটা বুঝতে পারলেন সত্যপ্রসাদ। পাশে-রাখা হারিকেনের আলোটাকে সামান্য বাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর স্বাভাবিক ধীর গলায় বলতে শুরু করলেন—'কমরেড শ্রীপতির প্রশ্নের উত্তরে কমরেড নিখিল রায় যে কথা বলেছেন, আমিও তা সমর্থন করি। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ছাড়া সত্যিই আমাদের আর কোনো বিকল্প পথ নেই। লড়াই করেই আমাদের বাঁচতে হবে, বাঁচতে গেলে লড়তে হবে। লড়াই ছাড়া আমাদের পথ নেই।'

সত্যপ্রসাদ থামতেই সমবেত শ্রোতাদের মধ্যে উল্লাস-ধ্বনি উঠল। শুনে শুনে শ্লোগানগুলো সব মুখস্ত হয়ে গেছে। কে একজন হেঁড়ে গলায় চীৎকার ক'রে উঠল—'ইন্‌কিলাব—'। চারিদিক থেকে প্রতিধ্বনি উঠল—'জিন্দাবাদ।'—

সভাভঙ্গের পর সকলে চলে গেলেও কয়েকজন বাছাই চাষী অপেক্ষা ক'রে থাকল সত্যপ্রসাদের নির্দেশে। এবার একটা গোপন আলোচনা-সভা বসল। সেই সভায় স্থির হ'লো, অনন্তর জমিতে শ্রীপতি যে পাট বুনেছে, অনন্তর আগেই সে পাট কেটে নিয়ে আসতে হবে। তেভাগা আন্দোলন অনন্তর জমিতেই প্রথম শুরু হবে। আটাশে শ্রাবণ দিন স্থির হ'লো। অনন্ত যাতে জানতে না পারে, সেজন্য

কথাটা গোপন রাখতে হবে।

নিখিল বললেন—'বিষয়টা যদি গোপন থাকে তো ভালোই। কোনো প্রতি-রোধের মধ্যে আমাদের পড়তে হবে না। কিন্তু অনন্ত যদি জানতে পারে, সাধ্যমত বাধা দেবে। শুনেছি, অনন্তর লোকবল এবং অস্ত্রবলও কম নেই। আমাদেরও এ-ব্যাপারে তৈরী থাকা দরকার। অস্ত্র-শস্ত্রের যোগাড় আমাদেরও রাখতে হবে। প্রয়োজনে তা ব্যবহারও করতে হবে।'

গগন এসব সভায় বড়ো একটা আসে না। এলেও সকলের কথা শোনে চুপচাপ। নিজে বিশেষ কথা বলে না। আজ সভায় এসেছিল।

নিখিলের কথা শুনে উঠে দাঁড়িয়ে গগন বলল—'অস্তর-শস্তরের ব্যাপারডা আমার পরে ছা'ড়ে দ্যান্। অস্তর যা লাগে, আমি দেবো। আমি জানতাম, এদিন আসবে। ঘরে ঘরে আমার হাতে-গড়া অস্তর পৌঁছে গেছে। বাকি যা লাগে, তাও দেবো। বিলভাসানে মা-বসুমতীর বুকে বড়ো তেস্টা। মা রক্ত চায়। মাকে এবার রক্ত পান করাব!'

গগনের দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারাটিকে তন্ত্র-সিদ্ধ কাপালিকের মতো ভয়ঙ্কর দেখায়।

শ্রাবণ-শেষের ক্ষান্ত-বর্ষণ ভোরবেলায় বিলভাসানের সারা তল্লাটটা পড়ে ছিল আচ্ছন্ন সম্মোহিতের মতো। কোনো গৃহস্থ বাড়ীর দূরাগত কুকুরের ডাক মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল। এবারের অনুকূল জল-হাওয়ার গুণে ক্ষেত-প্রান্তরে সর্বত্রই একটা সচ্ছল পরিপূর্ণতা। ভিজে ভিজে সোঁদা গন্ধ বাতাসে ছড়ানো। নিচের দিকে আমন ধানগুলোর ক্ষেতে বর্ধিষ্ণু জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধানগাছগুলো বাড়ছে। উপরের আউশ ধানগুলোর ক্ষেতে ফসলের আশু সম্ভাবনা। ইতস্ততঃ পাটক্ষেতগুলি সবুজ চিত্রপটের মতো অসাধারণ দৃশ্যকল্প রচনা করছিল।

কোথাও বা ে ানো ধানক্ষেত থেকে ভেসে আসছিল কোড়া পাখির ডাক। এ ডাক মেয়ে-কোড়ার। প্রিয়-মিলনের প্রত্যাশায় পুরুষ কোড়াকে নিজের অস্তিত্বের জানান দেওয়া। এ-ডাকের মায়ায় সম্মোহিত হয়ে ছুটে আসে পুরুষ কোড়া। ধান-ক্ষেতের শ্যামল আস্তরণে রচিত হয় পুরুষ কোড়া আর মেয়ে কোড়ার মিলন-বাসর। কখনো কখনো প্রতারক ডাকের ছদ্ম-আহ্বানে প্রাণও দিতে হয় পুরুষ কোড়াকে। কোড়া পাখীর সুস্বাদু মাংসের লোভে ফাঁদ পাতে হয়ত কোনো চাষী। বাঁশের সরু সরু শলাকা দিয়ে তৈরী করে গম্বুজের চূড়োর মতো খাঁচা। তার মধ্যে বসিয়ে রাখে পোষ-মানা মেয়ে কোড়াকে। তারপর খাঁচাটিকে রেখে আসে কোনো ধানক্ষেতের গভীরে। খাঁচার মুখ খোলা থাকে। কৌশলী চাষী দূরে কোথাও অপেক্ষা করে। খাঁচার মধ্যে মেয়ে-কোড়া বুক-ফাটিয়ে মায়াবী ডাক ডাকতে শুরু করে। সে ডাক শুনে পুরুষ কোড়ার ধৈর্য আর বাঁধ মানে না। গুটি গুটি পায়ে চলে আসে খাঁচার কাছে। প্রেমিকা পক্ষিণীর আকুল আহ্বানে বাঁশের খাঁচার শলাকাগুলোকে তখন আর চোখেই পড়ে না। গভীর পুলকে ঢুকে যায় খাঁচার মধ্যে। আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায় খাঁচার মুখ। কোড়ানীকে বুকের পাশে জড়িয়ে নেবার আগেই কোড়া

বুঝতে পারে, কী বিষম মরণ-ফাঁদে সে আটকে পড়েছে। খাঁচার মধ্যে তখন শুরু হয়ে যায় ঝটপটানি। কিন্তু ততক্ষণে পাখ্-মারা চাষীর শক্ত হাত সাপ্‌টে ধরে হতভাগ্য কোড়াকে।

বিলভাসানের আদিগন্ত শ্যামলতায় ভোরের ধূপছায়া অন্ধকারে যখন এইরকম সব নানা দৃশ্যকল্প রচিত হচ্ছিল, তখন ধান পাটের পাতার আড়ালে গায়ে গা মিলিয়ে এগিয়ে এলো শ'দুয়েক চাষী। শ্রীপতির চাষ-করা অনন্তর বাবু-পাটের ক্ষেতটার পাশে এসে দাঁড়াল। অনেকের হাতে রামদা, তীর ধনুক, আর সড়কি। পিঠে বাঁধা বেতের ঢাল। কারো হাতে দীর্ঘ হেঁসো। এই হেঁসোতে পাট কাটার খুব সুবিধে। মার-দাঙ্গা লাগলে প্রয়োজনে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতেও কোনো বাধা নেই।

এক বন্দের টানা তিন বিঘের পাটের ক্ষেতখানাকে ওরা ঘিরে ফেলল চারপাশ থেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝল, সর্বনাশ যা হবার, তা আগেই হয়ে গেছে।

পূব আকাশ লাল ক'রে তখন সূর্যদেব উঁকি মারছে। কুসুম কুসুম রোদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। সেই আলোয় ওরা লক্ষ করল, পাটক্ষেতের মাঝখানটিতে একটা ঝটাপটি চলছে। সুদীর্ঘ বাবু-পাটের গাছগুলি মানুষের মাথা ছাড়িয়ে বেড়ে উঠেছে। ভিতরে কেউ থাকলে বাইরে থেকে বোঝা কঠিন। পাট-ক্ষেতের ভিতরে কত লোক আছে বোঝা যাচ্ছে না। তবু ঝটাপটি দেখে বোঝা যায়, লোকসংখ্যা বেশ অধিকই। ক্ষেতের ভিতরে যে পাটকাটার কাজ চলছে, সেটাও অনুমান করা যায়।

আজকের এই অভিযানের বিষয়টাকে এরা গোপন রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু দেখা গেলো, অনন্তও কম চতুর নয়। চাষীদের মধ্যে তারও দু'চারজন পোষা চর আছে। গোপন খবরটি তাদের কারো মাধ্যমে তার কাছে পোঁছে গেছে আগেই। এরা ক্ষেতে এসে পৌঁছানোর আগেই দলবল নামিয়ে পাট কাটার কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে। এবার এদের পক্ষ থেকে পাট কাটতে গেলে সংঘর্ষ অনিবার্য। কিন্তু এখন পিছিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়।

দলের মধ্যে ছিলেন সত্যপ্রসাদ এবং নিখিল। নিখিল অত্যন্ত চতুর। এ-সময়ে চাষীদের মনোবল ভেঙে পড়লে যে বিষম বিপদ হবে, সেটা অনুমান করলেন। সত্যপ্রসাদও অবস্থার গুরুত্ব অনুভব ক'রে একটু বিহ্বল হয়ে পড়লেন। হঠাৎ নিখিল গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিয়ে উঠলেন—'ইন্‌কিলাব—জিন্দাবাদ। তেভাগার দাবি—মানতে হবে, মানতে হবে।'

একের পর এক শ্লোগান ঘোষণা ক'রে চললেন নিখিল। দলের চাষীরা ঘটনার আকস্মিকতায় একটুখানি ঝিমিয়ে পড়েছিল। নিখিলের শ্লোগান শুনে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। নিখিলের শ্লোগানের সঙ্গে তারাও গলা মিলিয়ে শ্লোগান দিতে শুরু করল।

চাষীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল রামপদ আর গণেশ। রামপদর বুদ্ধি খুব ধারালো। গণেশের বুদ্ধি অতটা ধারালো না হ'লেও লাঠি আর সড়কি—দু'টোতেই ওর হাত

বেশ পাকা। কা'জে-দাঙ্গায় দল পরিচালনার দক্ষতাও যথেষ্ট। রামপদ আর গণেশ দু'জনে সমস্বরে রণ-হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনের দিকে। পাট গাছের ফাঁকে ফাঁকে ওদের অনুসরণ ক'রে এগিয়ে চলল আর সবাই। মুহুর্মুহু রণ-ধ্বনিতে আশেপাশের আকাশ-বাতাস তটস্থ হয়ে উঠল।

প্রতিপক্ষও নীরবে ব'সে রইল না। তারাও পাটক্ষেতের ভিতর থেকে সমানে হুঙ্কার ছাড়তে লাগল। পাটক্ষেতের অভ্যন্তরে প্রতিপক্ষের সঠিক অবস্থান এবং সংখ্যা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রামপদ থমকে দাঁড়িয়ে ওর দলের পিছন দিকের তীরন্দাজ চাষীদের প্রতি ইঙ্গিত করল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর উড়তে লাগল আকাশে। তীরগুলো আকাশে উঠেই বৃষ্টিধারার মতো নেমে আসতে লাগল পাটক্ষেতের মাঝখানে প্রতিপক্ষ বাহিনীর উপর। একটু বাদেই ওপাশ থেকে নানারকম আর্তনাদের শব্দ শোনা যেতে লাগল। পাটবন ভেঙে-চুরে শুরু হ'লো বিষম একটা হুটোপাটি।

রামপদ তখন তীর-চালনা বন্ধ রেখে সবাইকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলো। গণেশের পরিচালনায় অস্ত্রধারী কৃষকেরা সামনের দিকে ছুটল রে-রে ক'রে। মাথা-ছাড়ানো পাটবনের মধ্য দিয়ে বেশী জোরে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তবুও যতটা জোরে পারা যায়, এগিয়ে চলল সবাই। পিছনে হেঁসো-ধারী যেসব চাষী ছিল, তারা এবার সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পাট কাটতে শুরু করল। সত্যপ্রসাদ এবং নিখিল তাদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিতে লাগলেন।—'লাঙল যার—জমি তার',—'তেভাগার দাবি—মানতে হবে।'—ইত্যাদি শ্লোগান-ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠতে লাগল চারিদিক।

ওদিকে গণেশের পরিচালনায় অস্ত্রধারী দলটা অর্ধচন্দ্রাকারে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। একটু বাদেই গোটা দলটা প্রতিপক্ষ বাহিনীর মুখোমুখি হ'লো। দুই দলই উভয়ের অবস্থান এবং সংখ্যা মোটামুটি বুঝতে পারল। পাটগাছের উপর দিকটা পাতায় পাতায় ঝাঁকড়া হয়ে অন্ধকার হয়ে থাকে। কিন্তু নিচের দিকে পাতা না থাকায় অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। ও পক্ষও দলে বেশ ভারী। তবে অনন্ত বিশ্বাসের বাড়ীর কয়েকজন বাঁধা কিষাণ ছাড়া আর সবাই যে বাইরের লোক, সেটা এরা বুঝতে পারল। অনন্ত বাইরে থেকে সড়কিবাজ আর লেঠেলদের এনেছে ভাড়া ক'রে। ওদের দলের কিছুটা পিছনে তিন চারজন মাটিতে প'ড়ে গোঙাচ্ছে। সম্ভবত ওদের হাতে বা পিঠে তীর লেগেছে।

হঠাৎ ওপাশ থেকে একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার শোনা গেলো—'চালা ভাইসব, আল্লার কিরে, এট্টাও যেন ফিরে যাতি না পারে।'

চমকে উঠল এরা সবাই। বাসুন্দের হামিদুল মিয়া। যেমন পাকা সড়কিবাজ, তেমনি দুর্দান্ত প্রকৃতির। বাঁ চোখটা নষ্ট। মারামারি করতে গিয়ে সড়কির খোঁচা লেগে চোখটা অন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে হামিদুলের মনের জোর বা কব্‌জির সামর্থ্য একটুও কমেনি। হামিদুল পেশাদার সড়কিবাজ। সহজে হার মানার পাত্র সে নয়। কা'জে-দাঙ্গায় কালান্তক যমের মতো রুদ্রমূর্তি ধারণ করে।

হামিদুলকে দেখেই এদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার ঘটল। দু'চারজন ছাড়া এদের

কারোরই কা'জে-দাঙ্গার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাই ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। রামপদ এবং গণেশ দু'জনেই সেটা বুঝতে পারল। দলের মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য হামিদুলের হুঙ্কারের জবাবে গণেশও হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'সামাল ভাইসব—সামাল।'

মুখোমুখি দুই প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে বললে ভুল হবে,—হামাগুড়ি দিয়ে ব'সে। সরু লিকলিকে পাটগাছের ভিতর দিয়ে পরস্পরের দুর্বলতার রন্ধ্র খুঁজছে। হঠাৎই হামিদুলের হাত থেকে ছিটকে এলো সড়কি। প্রচণ্ড গতিতে, অপ্রতিহত বেগে। সড়কিটা এসে জগেনের হাঁটুর নিচের খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। জগেন 'ওরে বাবারে—মরিছিরে'—ব'লে আর্তনাদ ক'রে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ক্ষত-স্থান থেকে রক্ত ছুটতে লাগল ফিনকি দিয়ে। তাড়াতাড়ি জগেনকে ধরাধরি ক'রে সবাই পিছনে পাঠিয়ে দিলো।

জগেনের রক্ত দেখে এদের ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হ'লো উল্টো। জগেন এভাবে আহত হওয়াতে এদের সকলের মাথায় যেন খুন চেপে গেলো। হুঙ্কার দিয়ে উঠল গণেশ—'জগেনের রক্তের বদ্‌লা চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে 'মার-মার কাট-কাট' ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই। ওদিকে হামিদুল আর তার সুদক্ষ বাহিনীও তৈরী ছিল। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত স্থানটা রণক্ষেত্রে পরিণত হ'লো। পাটগাছের বাধায় লাঠি সড়কি কোনোটাই ভালোভাবে চালনা করা যায় না। কিন্তু তবুও দুই পক্ষ প্রবল বিক্রমে লড়তে লাগল।

একটু বাদেই বোঝা গেলো, হামিদুলের দল পিছু হটছে। হামিদুলের দল যতই পাকা দাঙ্গাবাজ হোক না কেন, চাষীরা সংখ্যায় অনেক বেশী। এদের মনোবলও আজ প্রচণ্ড। হামিদুলের দলের লোকেরা টাকার বিনিময়ে লড়তে এসেছে। কিন্তু চাষীরা সংখ্যায়ও যেমন বেশী, ওদের মধ্যে একটা আদর্শবোধও তেমনি কাজ করছে। ফলে সমবেত চাষীদের সংঘবদ্ধ আক্রমণে হামিদুলের বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ল দ্রুত। ওদের মধ্যে বেশ কয়েকজনই ইতিমধ্যে আহত হয়েছে। অবস্থা বেগতিক দেখে ওরা এবার আহত লেঠেলদের কাঁধে তুলে পাট-ক্ষেত ছেড়ে পিছন ফিরে পালাতে শুরু করল।

চাষীরা ওদের আর পিছন পিছন তাড়া করল না। লাঠি সড়কি হাতে নিয়ে পাট-ক্ষেতখানাকে শুধু ঘিরে রাখল চারপাশ থেকে। আর মুহুর্মুহু শ্লোগান দিতে থাকল। যে সব চাষীর হাতে হেঁসো ছিল, তারা এবার দ্রুতবেগে পাটগাছ কেটে আঁটি বাঁধতে লাগল। অন্য একদল সেই আঁটি মাথায় ক'রে ব'য়ে নিয়ে শ্রীপতির বাড়ীর সামনে পচা ডোবাটায় ডোবাতে শুরু করল। চাষীদের মধ্যে বড়ো রকমের জখম কেউ না হ'লেও বেশ কয়েকজন অল্প-বিস্তর চোট পেয়েছে। তার মধ্যে জগেনের পায়ের চোটটাই বেশী। বেশ গভীর ক্ষত হয়েছে। আহত সবাইকে শুইয়ে দেওয়া হ'লো আলের উপর। ফুলি তার নারী-বাহিনী নিয়ে সেবা-যত্নের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৌরভী সকলের রক্ত কাদা ধুয়ে দিলো গভীর মমতায়! লক্ষ্মণ কবিরাজ এসে ওদের ক্ষতস্থানে নানারকম পাতা বেটে 'জাব' বেঁধে দিলো। ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই চাষীরা সব পাট কেটে সরিয়ে ফেলল। ন্যাড়া হয়ে গেলো

গোটা পাটক্ষেতটা।

বিলভাসানের সমস্ত গাঁয়ের ঘরে ঘরে একটা চাপা উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল। অনন্তর ভাড়া-করা লেঠেলদের হারিয়ে দিয়ে চাষীদের এই জয়লাভ—সত্যিই এর কোনো তুলনা নেই। অনন্ত হয়ত ছেড়ে দেবে না। এর প্রতিশোধ নেবেই। কিন্তু সে তো পরের কথা। আপাততঃ এই বিজয়োল্লাস সকলকে অভিভূত ক'রে ফেলল। চাষীদের এই সাফল্য উপলক্ষে সেদিন যতীনের স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হ'লো। যদিও যতীনের মনে একটুখানি খুঁত-খুতানি ছিল। চাষীদের এই অসামান্য সাফল্যে সেও উল্লসিত হয়েছিল খুব। কিন্তু তাই ব'লে স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটাকে সে মন থেকে সমর্থন করতে পারল না। কিন্তু এ ব্যাপারে নিখিলের প্রচণ্ড আগ্রহ থাকায় যতীনের কোনো আপত্তি টিকল না।

স্কুল ছুটি দিয়ে চাষীদের নিয়ে সভা করা হ'লো স্কুলের মাঠে। নিখিল চাষীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানালেন। সত্যপ্রসাদও চাষীদের সাফল্যে খুবই আনন্দিত হলেন। তিনিও সকলকে ধন্যবাদ জানালেন। সভায় স্থির হ'লো, অনন্তর জমির কেটে আনা পাট বাছা-ধোওয়া হয়ে গেলে গাঁট বেঁধে তিন ভাগে ভাগ করা হবে। তার দুই ভাগ যাবে শ্রীপতির বাড়ী। আর এক ভাগ যাবে অনন্তর বাড়ী। অনন্তকে ঐ এক ভাগ নিতে বাধ্য করানো হবে। আর এভাবেই বিল-ভাসানে নির্মিত হবে তেভাগা আন্দোলন ও তার সাফল্যের বনিয়াদ।

একদিনের ছোটো একটি ঘটনা। সামান্য একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কিন্তু এই স্ফুলিঙ্গটিই চাষীদের মনে ধিকি ধিকি ক'রে অনুপ্রেরণা হয়ে জ্বলতে থাকল। অপেক্ষা ক'রে থাকল সবাই আগামী অগ্রহায়ণের আমন-ধান কাটার মরসুমের দিকে। তেভাগা আন্দোলনের খুঁটিটাকে তখন সবাই মিলে শক্ত জমির উপর পুঁতে জোরালো ভিত গড়তে হবে।

॥ ষোলো ॥

ভাদ্র মাসের প্রথম থেকেই বিলভাসানে ভেসে আসতে লাগল নানা রকম উড়ো খবর। কলকাতা শহরে নাকি হিন্দু-মুসলমানে জোর দাঙ্গা লেগেছে। এ-পাশের ঢাকা, নোয়াখালি শহরেও নাকি বেজায় মারামারি কাটাকাটি চলছে।

বিলভাসানের গণ্ডিবদ্ধ জীবনে এসব সংবাদ সাময়িক উত্তেজনা ছড়ালেও বিশেষ কোনো উত্তাপ ছড়াতে পারল না। শুধু হাটে গেলে কিছুটা উত্তাপ ওদের গায়ে লাগে। হাটে-বাজারে গেলেই ওরা টের পায়, মুসলমানদের মধ্যে, বিশেষ ক'রে ধনী মুসলমানদের মধ্যে, এক ধরনের উত্তেজনা বিরাজ করছে। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর দাবি তাদের চোখে মুখে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তবে সাধারণ গরীব মুসলমানদের দেখলে বোঝা যায়, ওরা এসব বিষয় নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। সংসারের টানা-পোড়েনেই তারা হিমশিম খাচ্ছে। তবে সব মিলিয়ে চারি-

দিকে রচিত হচ্ছে একটা অস্থিরতার পটভূমিকা।

মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একদিন অন্যান্য নেতার সঙ্গে কাদের সায়েব, হক সায়েবও বিলভাসানে এসে হাজির হন। সত্যপ্রসাদের সঙ্গে নিরালায় কী সব আলাপ-আলোচনা করেন। ওঁদের গম্ভীর থমথমে মুখ দেখলেই বোঝা যায়, সকলেই ভিতরে ভিতরে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন। বাংলার বিভিন্ন স্থানে,—শহরে গ্রামে গঞ্জে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, বিলভাসান এবং আশেপাশের এ-তল্লাটটাকে তার থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাঁরা সবাই বেশ তৎপর। এক স্থান থেকে আর এক স্থানে হিন্দু-মুসলমান চাষীদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাঁরা সাম্প্রদায়িক বিভেদের শিকড়-মূল উপড়ে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরই মধ্যে বাঁকপুর গ্রামের স্কুলের বটতলার মাঠে কবিগানের আয়োজন করা হ'লো। এ-তল্লাটে মুসলমানদের মধ্যে জারীগান এবং হিন্দুদের মধ্যে কবিগান বিশেষ জনপ্রিয়। তবে দুই গানের আসরেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষেই বেশ ভিড় জমে। প্রাণের কথা শুনতে পেলে কবি আর জারীর মধ্যে ভেদ থাকে না। নানাদিক ভেবেই বিলভাসানে কবিগানের আয়োজন করা হ'লো। স্থানীয় হিন্দু চাষীদের মনোবল বাড়বে। আশেপাশের গ্রামের মুসলমান চাষীরাও আসতে পারে। এতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

অনুমান যথার্থ হ'লো। কবিগানের দিন সকালবেলা থেকেই লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো বাঁকপুর স্কুলের বটতলার মাঠ। স্থানীয় হিন্দু চাষীরাই বেশী। তবে দূর-দূরান্তরের বেশ কিছু মুসলমান চাষীও শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত হ'লো। রাস্তা-ঘাটে চলল অবিরত লোকের আনাগোনা। বিলভাসানের নিচু অঞ্চলের গ্রামগুলোর চাষীরা নৌকাযোগে এলো কবিগান শুনতে।

দুপুরের কিছু আগে সরমা, চাঁপা, সৌরভী এবং আরো কয়েকজন মেয়ে মিলে কবিগান শুনতে যাচ্ছিল। দু'পাশে ধানক্ষেত পাটক্ষেতের মধ্যে দিয়ে সামান্য উঁচু রাস্তা। জলে কাদায় ছয়লাপ। একটু অসাবধান হ'লেই পা পিছলে পড়ার সম্ভাবনা। সবাই মিলে হাসি-ঠাট্টা করতে করতে আসছিল। কয়েক বছর আগেও এভাবে প্রকাশ্য সভায় ব'সে গান শোনার কথা বিলভাসানের মেয়ে বউরা কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু এখন নারী-স্বাধীনতার হাওয়ায় এসব কিছুটা চলন-সই হয়ে গেছে।

ওদের ছোটো দলটা জল-কাদার রাস্তা ধ'রে এগিয়ে চলছিল। হঠাৎ পিছন দিকে এক ঝলক দেখে নিয়েই সরমার দিকে তাকিয়ে সৌরভী বলল—'তোমরা এগোও বৌদি, আমি একটু পরে আস্‌তিছি।'

—ব'লেই পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল এবং একটু বাদেই রাস্তার দু'পাশের পাটক্ষেতের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সরমা একটু অবাক হয়ে বলল—'সৌরভীর আবার কি হলো ?'

একজন অল্প-বয়সী বউ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—'ও ঠেয়ারীর কথা বাদ দ্যাও বৌদি। চলো—আমরা যাই।'

অগত্যা ওরা সবাই এগিয়ে গেলো।

সকাল থেকেই সত্যপ্রসাদের বেশ জ্বর-জ্বর লাগছিল। কয়েকদিন রাত-বিরেতে বর্ষা-বাদলায় ঘুরে সর্দি-জ্বর হয়েছে। কিন্তু কবি-গানের আসরে না গেলেও ভালো দেখায় না। বিশেষ ক'রে এ কবিগানের আয়োজনের পিছনে যখন একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। তাই একটু বেলা ক'রে খেয়ে-দেয়ে কবি-গানের আসরের দিকে রওনা দিয়েছিলেন। যতটা পারা যায়, মেঠো রাস্তার জল-কাদা বাঁচিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন আস্তে আস্তে। হঠাৎ একটা ঝাঁকড়া পাটক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন। দু'হাতে পাটগাছ গুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সৌরভী।

সত্যপ্রসাদ বোধহয় একটু চমকে উঠেছিলেন। সৌরভী হেসে উঠে বলল—'ভয় পালেন নাকি সত্যদা? আমি কিন্তু আপনারে ভয় দেখাতি চাইনি। দল বাঁধে কবিগান শুন্‌তি যাচ্ছিলাম। আপনারে দেখে পেছনে পড়িছি। আপনার সাথে এট্টু কথা বল্‌তি চাই।'

সত্যপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বললেন—'কাজটা তুমি ভালো করোনি সৌরভী। রাস্তাঘাটে লোকজন চলাফেরা করছে। কারো চোখে পড়লে সেটা ভালো দেখাবে না। তা, তুমি কি বলতে চাও বলো শুনি।'

সৌরভী সত্যপ্রসাদের সামনে এগিয়ে এসে বলল—'আপনার বুকখান কী পাষাণ দিয়ে গড়া সত্যদা! ঐ বুকখানার এক ফোঁটা ভালবাসা কি আমারে দিতি পারেন না সত্যদা? আমি তো আর কিছু চাই না! শুধু আপনি আমারে বলেন যে, আপনি আমারে ভালোবাসেন!'

সত্যপ্রসাদ ধমক দিয়ে বললেন—'এসব হচ্ছে কি সৌরভী? রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কি আরম্ভ করেছো? সরো—সরো বলছি—। রাস্তা ছেড়ে দাও।'

হঠাৎ ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল সৌরভী—'আমার বুকের মধ্যি যে কী আগুনের জ্বালা সত্যদা, তা আমি কারো বুঝোতি পারি না। কেউ বোঝে না এ জ্বালা! জলে ডুবে মরতি গিলাম, আপনি কেন বুকে জড়ায়ে তুলে আনলেন? আমার শরীলডার সব তো আপনি দেখিছেন। অজ্ঞান শরীলডারে বুকে জড়ায়ে ধরতি পারলেন, আর এই জ্ঞানের শরীলডারে পারেন না? আমার সব জ্বালা তাহলি জুড়োতো সত্যদা। কিন্তু কারে বা কই! পাষাণের পায় মাথা গুঁতোয়ে আমার মরাই সার। হায়রে ভগবান!'—

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা ব'লেই হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়াল সৌরভী। তারপর একছুটে নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন সত্যপ্রসাদ। নিজের অজ্ঞাতেই বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বিলভাসানের চাষী মেয়েরা তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। সৌরভীও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তি ছাড়াও তার দাবি আরো কিছু বেশী। কিন্তু সে দাবি মেটানো তো সত্যপ্রসাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। নিতান্ত আকস্মিক ভাবে তিনি সৌরভীকে বাঁচানোর ঘটনার সঙ্গে

জড়িয়ে গেছেন। কিন্তু এর জন্য তো তিনি দায়ী নন। এই শিক্ষা-দীক্ষাহীন নিম্ন-রুচির মেয়েটির আচরণে সত্যপ্রসাদ যথার্থই ক্ষুব্ধ হলেন। মেয়েটি সত্যিই হতভাগিনী!

সত্যপ্রসাদ যখন কবিগানের আসরে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন বেশ জমে উঠেছে আসর। দুই কবিয়ালের বাক্-লড়াই শুরু হয়েছে। একদিকে এ তল্লাটের বিখ্যাত কবিয়াল নকুল সরকার, আর অন্যদিকে তরুণ কবিয়াল নিতাই সরকার।

কবিগানের বিষয় নির্বাচিত হয়েছে মহাভারত থেকে। বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ—এই দুই ভাইয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—এটাই প্রতিযোগিতার বিষয়। প্রবীণ কবিয়াল নকুল সরকার হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। এবং উঠ্‌তি কবিয়াল নিতাই নিয়েছেন বলরামের পক্ষ। আসরে এখন গান করছেন নকুল। ধুয়োর গানে তিনি আসর মাতিয়ে দিয়েছেন। এত বড়ো মাঠটা উপ্‌চে পড়ছে লোকে। কিন্তু কোথাও কোনো গোল-মাল নেই। বর্ষীয়ান নকুল সরকারের আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠে সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে আছে। দোহারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে ধুয়োর গান শোনালেন নকুল। সঙ্গে বেহালা, ঢোল, কাঁসি ইত্যাদি নানা-রকম বাজনা তো আছেই। বেশ সুগঠিত দল নকুলের। ধুয়োর গান শেষ ক'রে এবার নকুল ঢুকলেন তর্কের রাজ্যে। মহা-ভারতের শ্রেষ্ঠ চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ। কোথায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব,—একথা তিনি ছোটো ছোটো ছড়ার মধ্য দিয়ে অপূর্ব যুক্তি-জাল বিস্তার ক'রে বিশ্লেষণ করতে লাগলেন।

নকুলের পালা শেষ হতে বিকেল গড়িয়ে গেলো। এবার উঠলেন—নিতাই সরকার। নিতাইয়ের বয়স কম। কবিয়াল হিসেবে অভিজ্ঞতাও বেশী নেই। ডাকসাইটে কবিয়াল নকুল সরকারের প্রতিপক্ষ হিসেবে লড়তে গেলে বুকের পাটা থাকা চাই। তবে বয়স বা অভিজ্ঞতা কম হ'লেও নিতাইও একেবারে ফেলনা নন। নিতাইয়ের চেহারাটি চমৎকার। গানের গলাও খুব মিষ্টি। শাস্ত্র-পুরাণে অসাধারণ দখল। বিশেষ ক'রে শাস্ত্র-পুরাণের বিষয়কে আধুনিক যুগের উপযোগী রূপ দিতে তাঁর জুড়ি নেই। এ তল্লাটে যে সব কমিউনিস্ট নেতা যাওয়া-আসা করেন, তাঁদের সঙ্গে নিতাইয়ের বিশেষ জানা-চেনা আছে। ফলে নিতাইয়ের চিন্তা-ধারা কিছুটা বাম-ঘেঁষা। সাম্যবাদী চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ তাঁর অনেক গান চাষীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। নিতাই আসরে উঠে দাঁড়িয়ে কবিগানের নিয়ম অনুযায়ী খানিকক্ষণ পৌরাণিক বিষয়াদি নিয়ে ধুয়োর গান গাইলেন।

গান যখন চলছিল, তখন হঠাৎ শ্রোতাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করা গেলো। একটু বাদেই তার কারণ বোঝা গেলো। জনা পাঁচেক কনস্টেবল সঙ্গে ক'রে মেজ-দারোগা এসেছেন। নিমাই চৌকিদার তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার এনে আসরের পাশে বসতে দিলো দারোগা সাহেবকে। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই উসখুশ করতে লাগল। অনন্তর জমির পাটকাটার পর তেমন নতুন কোনো ঘটনা আর ঘটেনি। তবে অনন্ত থানায় নাকি এজাহার দিয়ে এসেছে। সেই সূত্রেই বোধহয় আজ দারোগা-সায়েবের আগমন। কাকে ধ'রে চালান্ দেবেন, তার ঠিক কী! ফলে শ্রোতাদের মধ্যে একটা মৃদু গোলমাল এবং হুড়োহুড়ি লেগে থাকল।

মেজদারোগা উঠে দাঁড়িয়ে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'আপনারা

শান্ত হয়ে বসেন। গানের আসরে যেন কোনো গোলমাল না হয়।'

এসব অঞ্চলে দারোগার অগাধ প্রতিপত্তি। তাঁর একটি কথাতেই শ্রোতারা আবার শান্ত হয়ে চুপ ক'রে বসল। এদিকে বটগাছের ঝুপ্‌সি ছায়ায় নেমে আসছিল অন্ধকার। সন্ধ্যেও হয়ে গেছে। কয়েকটা হ্যাচাক এনে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'লো আসরের চারপাশে।

ধুয়োর গান শেষ ক'রে বলরামরূপী নিতাই কবিয়াল এবার কৃষ্ণ-রূপী নকুল সরকারের 'চাপান'-এর 'উত্তোর' দেবার জন্য তৈরী হলেন। তবে তাঁর চোখ দু'টো ঘুরে-ফিরেই গিয়ে পড়ছিল দারোগার উপর। আজ এখানে দারোগার আগমনের উদ্দেশ্য যে তিনি নিজেই, কেন জানিনা বারবার এটা তাঁর মনে হতে লাগল। একটু বাদেই অবশ্য নিতাই পারিপার্শ্বিক সমস্ত ব্যাপার বিস্মৃত হয়ে গানের বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন। শাস্ত্র-পুরাণ-মহাভারত মন্থন ক'রে চললেন। বলরাম-চরিত্রের এক নতুন ব্যাখ্যা দিলেন তিনি। পুরাণের হলধর-বলরাম—চাষী-বলরাম হয়ে দেখা দিলেন। নির্যাতিত বঞ্চিত চাষীদের প্রবক্তা হয়ে উঠলেন বলরাম। বলরামরূপী নিতাই ছড়া কেটে কেটে শোনাতে লাগলেন জাগরণের বাণী, শপথের জয়গান।

সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হ'লো। কিন্তু আবিষ্ট শ্রোতাদের ওঠার নাম নেই। নিতাই-য়ের গানের মধ্য দিয়ে তাদের সব বঞ্চনার অভিশাপ যেন খসে খসে পড়তে লাগল। মহাভারতের আলো-অন্ধকারের জগতের বলরাম তাদের বুকের মধ্যে জাগরণের জীবন্ত প্রতীক হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন। সব শেষে আবার ধুয়োর গান ধরলেন নিতাই—

শোন্‌রে ওভাই চাষা,—
যে মাটিতে ফসল ফলাস্‌
যে মাটিকে কথা বলাস্‌,
সে মাটি তোর নয়রে আপন,—
শুধু, চোখের জলে বাঁধ্‌লি মিছে বাসা
শোন্‌রে ওভাই চাষা ॥
এবার কাস্তেটারে লাগারে ভাই শান,
শক্ত হাতে ধররে লাঙল খান,—
বল্‌,—জান দেবো তো ধান দেবো না
খোয়াবো না আর মাটি মায়ের মান।
শোন্‌রে ওভাই চাষা,
যে মাটিতে হাসিস্‌ কাঁদিস্‌
যে মাটিকে ভালবাসিস্‌,
সেই মাটিরই তিলক প'রে
শোনারে তোর ভাষা ॥
জোতদারে আর জমিদারে
ভয় কিসের আর তোরবা কারে,

মাথা তুলে বল্‌রে ডেকে—
দেবো না আর ধান ;
আমার রক্তে রোয়া ধান দেবো না
জান দেবো তো ধান দেবো না—
—এ বিনে তোর নাইরে বাঁচার আশা,
শোন্‌রে ওভাই চাষা ॥

গান শেষ হতে না হতেই হঠাৎ আসরের একপাশের দু'টো হ্যাচাক নিভে গেলো দপ দপ ক'রে। আসরের ও-পাশটায় তৈরী হ'লো আবছা অন্ধকার। সেই ফাঁকে কয়েকজন মিলে নিতাই কবিয়ালকে অন্ধকারের দিকে সরিয়ে নিয়ে গেলো।

দারোগা-সায়েব প্রথমটায় ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেন নি। কিন্তু যখন ব্যাপারটা বোধগম্য হ'লো, তখন তিনি তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠে বললেন—'রাষ্ট্র-বিরোধী গান গাওয়ার জন্য আমি নিতাই সরকারকে এ্যারেষ্ট করছি।'

তারপর কনস্টেবলদের হুকুম করলেন—'যেমন ক'রে পারো, নিতাই সরকারকে এ্যারেষ্ট করো।'

কিন্তু কোথায় তখন নিতাই সরকার! স্কুলের পিছনে বিলের জলে নৌকা তৈরীই ছিল। কেউ কিছু বোঝার আগেই লগির শক্ত খোঁচায় সেই নৌকা নিতাইকে নিয়ে রওনা দিলো বিলের গভীরে।

সেদিনের কবিগানের উদ্দেশ্য পুরো মাত্রায় সফল হ'লো। চাষীদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল নিতাইয়ের গান। শুধু হিন্দু চাষীরাই নয়, মুসলমান চাষীরাও তাতে গলা মেলালো। অত্যাচারের প্রতিবাদে নিপীড়িত মানুষের ভাষায় কোনো ফারাক থাকে না। এক সূত্রে তখন তারা গ্রথিত হয়।

॥ সতেরো ॥

মাঝে মাঝে কী যে একটা আল্‌সেমিতে পেয়ে বসে যতীনকে। কিছুই যেন ভালো লাগে না। বারান্দার একপাশে শুকনো পাট গাদা-দেওয়া ছিল। সকাল থেকে তার উপর শুয়ে শুয়ে রাজ্যের ভাবনা মাথায় জড়ো করছিল। এমনিতে অবশ্য যতীন সব সময়েই কোনো না কোনো কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। দুপুরে স্কুলে যায়। সকালে বিকেলে যতটা পারে, ভাইকে চাষের কাজে সাহায্য করে। এখন অবশ্য কাজ-কর্মের চাপ কম। আউশ ধান কাটা মলা হয়ে গেছে। যেটুকু যা পাট হয়েছিল, তাও বেছে ধুয়ে ঘরে তোলা হয়েছে। বিলভাসানের সব চাষীর ঘরেই এখন কাজকর্ম একটু ঢিলে-ঢালা। বিলখাল এখন জলে ভর-ভরন্ত : চারিদিকে মেছুড়েদের ঘোরাফেরা। বাড়ীর চারপাশ দিয়েও এখন জল। নৌকা-ডোঙা ছাড়া এখন আর কোথাও যাবার উপায় নেই। আর কিছুদিন বাদে দুর্গাপূজা। সব অভাব দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও সকলে এ দিনটার অপেক্ষা ক'রে থাকে।

যতীনের মাথায় অবশ্য এখন এসব কোনো চিন্তাই ছিল না। চুপচাপ শুয়ে খানিকটা আল্‌সেমি করছিল। মনের মধ্যে এক ধরনের শূন্যতাবোধ ক্রিয়া করে কিনা, যতীন নিজেও তা ভালো ভাবে বুঝতে পারে না। ছোটোবেলায় মা মারা গেছে। বাবাই মায়ের মতো আগ্‌লে তাদের দু'ভাইকে বড়ো ক'রে তুলেছে। যতীনের বাবা নয়নচাঁদ অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। যৌবনে গৃহত্যাগী হয়ে একবার নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে। উড়ু-উড়ু স্বভাব। আত্মীয়-স্বজনেরা ধরা-ধরি ক'রে এনে বিয়ে-থা দিয়ে সংসারী বানায়। এখন অবশ্য বাড়ী আর ছেলে দু'টো ছাড়া তার মাথায় আর কোনো চিন্তা নেই। ভিটেয় নানা রকমের ফল-ফলারির গাছ লাগিয়ে বাড়ীটাকে দেখার মতো ক'রে তুলেছে। নিজের 'ক' অক্ষরের বোধ নেই। কিন্তু লেখাপড়ার পরে অসীম মমতা।

বাবার সযত্ন তত্ত্বাবধানে যতীন কলেজ পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। দেখেশুনে বাবা ছেলের বউ এনেছে। সরমাও সুন্দরী, মমতাময়ী লক্ষ্মী বউ। অল্প-স্বল্প লেখাপড়াও জানে। কোনোদিকেই কোনো অপূর্ণতা নেই যতীনের। গাঁয়ের অশিক্ষিত চাষী-বাড়ীর ছেলে সে। বিলভাসানের ওর বয়সী চাষী ছেলেদের তুলনায় অনেকটা এগিয়েছে সে। বাবার ইচ্ছেতেই গ্রামের স্কুলের শিক্ষকতা নিয়ে গ্রামেই পড়ে রয়েছে। নড়াইল কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করার পর ভালো একটা সরকারী চাকরির ডাকও পেয়েছিল। কিন্তু বাবার মত না থাকাতে যাওয়া হয়নি। নয়নচাঁদের ইচ্ছে, গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখেছো, এখন আর পাঁচটা গরীবের ছেলে যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে, তার চেষ্টা করো। ফলে যতীনের পক্ষে আর গ্রামের বাইরে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

এখানেই বোধহয় যতীনের একটা দুর্বল জায়গা রয়ে গেছে। বাড়ীর কাজকর্ম এবং স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যতীন হৈ চৈ করেই সময় কাটায়। স্কুলের ছেলেদের লেখাপড়া, খেলাধূলা—দু'টোতেই তার সমান নজর। ছেলেদের সঙ্গে নিজেও মাঝে মাঝে খেলার মাঠে নেমে পড়ে। কোনো কাজেই যতীনের জুড়ি নেই। তবু মাঝে মাঝে কী যে একটা অবসাদ তাকে পেয়ে বসে। কোনো কিছুই তখন আর ভালো লাগেনা। গ্রামের এই নিস্তরঙ্গ পরিবেশের মধ্যেই তাকে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে হবে,—ভাবলে কেমন যেন সব বিস্বাদ লাগে।

সত্যপ্রসাদের কথা ভাবে মাঝে মাঝে যতীন। খ্যাতি-প্রতিপত্তি, শিক্ষাভিমান, বংশ গৌরব, বিলাস ব্যসন—সব কিছু পিছনে ফেলে এই লোকটি কীভাবে একাত্ম হয়ে গেছেন বিলভাসানের চাষীদের অবজ্ঞাত নিস্তরঙ্গ জীবনের সঙ্গে। কোথাও কোনো পিছুটান নেই লোকটির। একটি আদর্শবোধের প্রতি চরম আনুগত্য না থাকলে বোধহয় এ-ধরনের আত্ম-সমর্পণ সম্ভব হয়না। সত্যপ্রসাদের ক্ষেত্রে এই আদর্শবোধ অবশ্যই তাঁর রাজনৈতিক চেতনা। কিন্তু যতীন নিজের মধ্যে তেমন কোনো উগ্র রাজনৈতিক চেতনাও যেন অনুভব করে না। সকলের ভালো হোক, কল্যাণ হোক—এটা সে চায়। কিন্তু তার জন্য গ্রহণীয় কোনো সুনির্দিষ্ট পথ সম্পর্কে যতীনের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

সরমা রান্নাঘরে রান্না করছিল। আর মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখছিল বেড়ার

ফাঁক দিয়ে। স্কুলের বেলা হয়ে আসছে, তবু যতীনকে উঠতে না দেখে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো। যতীনের পাশে দাঁড়িয়ে ওকে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে বলল—'কি গো কুম্ভকর্ন ঠাউর, সারা সকাল ব্যালাডা কি যোগ-নিদ্রে দিয়েই কাটাবা নাকি?'

যতীন চোখ খুলে সরমাকে এক পলক দেখল। উনুনের আগুনের আঁচে সরমার ভরাট ফর্সা মুখখানা টকটক করছে। যতীন ওর আঁচল ধ'রে টান মারল। সরমা এক ঝটকা মেরে আঁচলটা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম ক্রোধে বলল—'এই বুঝি আবার বাই চাপল মাথায়। ওঠল বাই, চলো বেন্দাবন যাই। সময় নেই, অসময় নেই, মাথায় ঘুর-ঘুরে পোকা ন'ড়ে উঠলিই হলো!'

যতীন কোনো কথা না ব'লে সরমার দিকে তাকিয়ে মিট মিট ক'রে হাসতে থাকে। বউটা সত্যিই ওর বেশ সুন্দরী।

সরমা এবার এগিয়ে এসে যতীনের পিঠ ঘে'ষে দাঁড়াল। যতীনের চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে বলল—'নাও, এবার উঠে পড়ো। আমার রান্না হয়ে গেছে। এরপর তো আবার স্কুলের দেরি হয়ে গেছে ব'লে বাবুর মুখ কা'লে হাঁড়ির মতোন অন্ধকার হয়ে যাবে!'

যতীন আল্‌তো হাতে সরমার কোমর জড়িয়ে ধ'রে রেখে বলে—'আচ্ছা সরমা, তুমি তো কিছুটা লেখাপড়া জানো। তোমাকে যদি আবার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেই, তাহলে কেমন হয়! আরো একটু লেখাপড়া শিখতে পারতে!'

সরমা হেসে বলল—'মাথায় বুঝি আবার এইসব পোকা ঘুরতিছে। ক্যানো, এলে, বিএ পাশ করা বউ না হলি বুঝি বাবুর এখন আর মন উঠতিছে না!'

একটু চুপ ক'রে থাকে সরমা। সুন্দর মুখখানার উপর দিয়ে বুঝি একটা বিষাদের ছায়া খেলা ক'রে যায়। বলে—

'লেখাপড়ার তুল্য জিনিস কী আর কিছু আছে! তা, ঘরের বউ আমি। আমার কি আর স্কুলে যাওয়া সাজে! লোকে মন্দ বলবে না?'

যতীন বলল—'লোকে কী আর মন্দ বলবে! প্রথম প্রথম একটু বলবে হয়ত। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি স্কুল কমিটির মিটিং-এ সামনের দিন কথাটা তুলব। বউরাও যদি কেউ স্কুলে ভর্তি হতে চায়, তার ব্যবস্থা করব। আর তোমাকে দিয়েই প্রথম বউদের স্কুলে যাওয়াটা শুরু করাব। স্কুলে যেতেই হবে তোমাকে।'

উঠোনের এক কোণে যতীনের ছেলে সব্যসাচী আপন মনে খেলা করছিল। বাবার কথাটা বোধহয় ওর কানে গেছে। একছুটে এসে বাবার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আধো-আধো গলায় বলল—'আমি ইস্কুলে যাবো বাবা! আমারে ইস্কুলে নিয়ে চলো।'

সরমা হাসতে হাসতে বলল—'ন্যাও, এবার ঠ্যালা সামলাও।'

হঠাৎ কিশোর-কণ্ঠের একটা উচ্চ ডাক ভেসে এলো—'মাস্টার মশায়, ও মাস্টার মশায়! মাস্টার মশায় বাড়ী আছেন নাকি?'

যতীন তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলো। জল এখন অনেকটা উঁচুতে উঠে এসেছে। ভিটের সামান্য নিচেই তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘাট বাঁধা। সেখানে একটা

ছেলে ডোঙার উপর দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে। যতীন কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখে—ডোঙার উপর বিষাণ দাঁড়িয়ে। ওর স্কুলের ছাত্র। ছেলেটি খুব মেধাবী ব'লে যতীন ওকে খুব স্নেহ করে। যতীন এ-সময় ওকে দেখে একটু অবাক হয়ে বলল—'কি রে, ডাকছিস্ কেন ? স্কুলে যাবিনে ?'

বাঁশের লগিটাকে ভালো ক'রে কাদার মধ্যে পুঁতে ডোঙাটাকে স্থির ক'রে বিষাণ বলল—'যাবো স্যার। আপনারে একটা খবর দিতে এসেছি। সত্যদাদাবাবু আমারে পাঠাইছেন। আজ সন্ধ্যেবেলায় কৈলেস-দাদুর বাড়ী মিটিং হবে। কারা নাকি সব আসবেন। সত্যদাদাবাবু আপনারে বারবার ক'রে যেতে বলিছেন। আরো কয়েক জনরে খবর দিতে কইছেন। সকলরে খবর দিয়ে আমি স্কুলে যাবো।'

যতীন দেখল, ডোঙার মাঝখানে একটা পিঁড়ি পাতা। তার উপর বইখাতা।

বিষাণ একটু ইতস্তত ক'রে বলল—'একটা কথা বলব স্যার।'

লাজুক কিশোর ছেলেটির দিকে তাকিয়ে যতীন হেসে বলল—'বল্না কি বলবি !'

কোনো কথা বলল না বিষাণ। বইখাতার মধ্যে থেকে সন্তর্পণে একটা খাতা বের করল। খাতাটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে নেমে এলো ডোঙা থেকে। যতীনের দিকে খাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে বলল—'স্যার, এইটা একটু দেখে দেবেন ?'

যতীন বিস্মিত হয়ে বলল—'কি ওটা ?'

তেমনি সঙ্কোচের সঙ্গে বিষাণ বলল—'কয়েকটা কবিতা লিখেছি স্যার ! হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না। আপনি যদি একবার দেখে দিতেন।'

খুবই কৌতূহল বোধ করল যতীন—'আচ্ছা—! তুই কবিতা লিখেছিস! বলিস্ কি ! দেখি—দেখি !'

আগ্রহের সঙ্গে বিষাণের হাত থেকে খাতাটা নিলো যতীন।

লাজুক মুখে যতীনের পাশে দাঁড়িয়ে রইল বিষাণ। খাতাটায় যত্ন ক'রে মলাট দেওয়া। মলাটের উপর লেখা—'কবিতার খাতা।'—বিষাণ চন্দ্র দাস।—পাতাগুলো একের পর এক উল্টে চলল যতীন। সমস্ত খাতাটাই ভর্তি। প্রথম দিকে 'আমাদের গ্রাম', 'বর্ষাকাল', 'ধানের ক্ষেত,' 'নববর্ষ'—ইত্যাদি জাতীয় প্রকৃতি-বর্ণনামূলক কবিতা। শেষের দিকের কবিতাগুলো দেখে চমকে উঠল যতীন। 'চাষীর ব্যথা,' 'জাগরণ', 'বিদ্রোহ', 'প্রতিশোধ' ইত্যাদি নামের সব কবিতা। নিতাই সরকারের কবিগানের প্রভাব আছে খানিকটা। কিন্তু কবিতাগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে স্বকীয়তা আছে। ছন্দে একটু-আধটু গোলমাল হয়ত আছে, কিন্তু কিশোর-কবির তীব্র আবেগের উত্তাপে সেটুকু আর চোখে পড়ে না।

কবিতাগুলোর দিকে চোখ বুলোতে বুলোতে গম্ভীর হয়ে গেলো যতীন। বিষাণ মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হ'লো। কাঁচুমাচু মুখে বলল—'ওগুলো হয়নি স্যার ?'

যতীন বলল—'তুই এখন যা। স্কুল কামাই করিস্ না। খাতাটা আমার কাছে থাক্। ভালো ক'রে প'ড়ে দেখে বলব।'

অগত্যা চলে গেলো বিষাণ। ছিপছিপে রোগা ছেলেটা ডোঙা বাইতে বাইতে

যাচ্ছে। যতক্ষণ দেখা গেলো, একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে রইল যতীন।

ঘাট থেকে যতদূর চোখ যায়, এদিকে দৃষ্টি কোথাও বাধা মানে না। বিল-ভাসানের সারা বিল এখন জলে জলময়। মাঝে মাঝে জল-ছাপানো আমন ধানের ক্ষেত। জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আমন ধানের গাছগুলো। যেসব ক্ষেত থেকে পাট কেটে নেওয়া হয়েছে, সেখানে স্বচ্ছ তলতলে জল। রোদের আলো প'ড়ে চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করছে। আকাশের অনেক উপরে হালকা পেঁজা তুলোর মতো মেঘের মিনার মাঝে মাঝে জলের বুকে ছায়া ফেলছে। বিলের গভীরে ছই-বাঁধানো দু'একটা নৌকা। এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে যাতায়াত করছে। পাটের ব্যাপারীদের এখন পাট কেনার মরসুম। মাঝে মাঝে মাটির হাঁড়িকুড়ি-ভর্তি কুমোরদের নৌকাও চোখে পড়ে।

বিলভাসানের আদিগন্ত প্রসারে এইসব নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে যতীনের মনের অবসাদটা অনেকটা কেটে গেলো। এখানকার এই নিস্তরঙ্গ আবদ্ধ জীবনেও মনে হ'লো, একটা সার্থকতা আছে। নাই বা হ'লো জীবনে অনেক কিছু বড়ো পাওয়া। চাষী-বাড়ীর ছেলে সে। এই আবেষ্টনীর মধ্যেই তাকে জীবনের সার্থকতা খুঁজে নিতে হবে। সর্বশক্তি দিয়ে স্কুলটাকে অন্তত বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বিল-ভাসানের দরিদ্র মূর্খ চাষীবাড়ীর দু'চারটে ছেলের মনেও অন্ততঃ যদি কিছুটা শিক্ষার আলো জ্বেলে দিতে পারে, তাহলেই জীবনে অনেকখানি পাওনা হ'লো। বিষাণের কাঁচা হাতের কয়েকটি কবিতার লাইন ঘুরে ফিরে মনে এলো। বিষাণের মতো এইসব ছেলেদের যদি গ'ড়ে তুলতে পারে, এদের মূঢ় ম্লান মুখে যদি একটুখানি ভাষা ফুটিয়ে তুলতে পারে, তবে তার মূল্যও তো কম নয়।

রান্নাঘর থেকে সরমা বেরিয়ে এসে বলল—'আর দেরি করলি কিন্তু স্কুলে যাতি পারবা না।'

যতীন তেল মেখে স্নান করতে নামল। ঘাটের পাশে ছোটো ছোটো হাঁসের ছানাগুলো জলের মধ্যে হুটোপাটি করছে। ভালো ক'রে এখনো সাঁতার কাটতে শেখেনি। হাল্‌কা হলদেটে রংয়ের রেশমের মতো লোম সারা গায়ে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে বাচ্চাগুলোকে। সরমা হাঁসের বাচ্চাগুলোকে ফুটিয়েছে। মা হাঁসটা ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে বাচ্ছাগুলোকে। স্নান করতে করতে যতীন দেখল, একটা বিরাট কুরর পাখি তালগাছের মাথায় ব'সে বাচ্চাগুলোর দিকে তাক করছে। যে কোনো সময়ে ছোঁ মেরে একটা দু'টোকে তুলে নিতে পারে। যতীন তাড়াতাড়ি একটা বড়ো ঢিল তুলে ছুঁড়ে মারল। কুরর পাখিটা উড়ে গেলো।

একটা শান্ত সমাহিত প্রশান্তিতে যতীনের মনটা পরিপূর্ণ হয়ে গেলো।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত মিটিং চলল কৈলাসের ঠাকুর-ঘরের বারান্দায়। সাধারণ চাষীরা কেউ ছিল না। নেতাদের মিটিং। সন্ধ্যেবেলায় হাজির হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা। অনেক রাত পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলের আন্দোলনের সাম্প্রতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হ'লো এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কেও সকলে মতামত ব্যক্ত করলেন। যতীন সারাক্ষণ উপস্থিত থেকে নেতাদের আলোচনা শুনল মন দিয়ে।

আঠারো

সত্যপ্রসাদ ডায়েরীতে লিখলেন—"১লা নভেম্বর, ১৯৪৬। দেড় বৎসর হইতে চলিল, বিলভাসানে আসিয়াছি। ভালোমন্দ মিলিয়া দিনগুলি একরূপ কাটিয়া গেলো। এই দেড় বৎসরে এখানকার চাষীদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছি। ইহারা আজ অনেকটাই সংঘবদ্ধ। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইতে শিখিতেছে। ন্যায্য অধিকার আদায় করিবার বিষয়েও প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু একথা তো ঠিক যে, প্রকৃত সংগ্রাম এখনো শুরু হয় নাই। জোত-দার তথা পুলিশের আক্রমণের মুখে ইহারা কতখানি সংহতি বজায় রাখিতে পারিবে, তাহার কোনোই পরীক্ষা এখনো হয় নাই। উত্তর-বাংলার যে সংবাদ পাইতেছি তাহাতে বোধ হইতেছে, গোটা উত্তরবাংলা রণ-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সেখানকার কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধে জোতদারেরা পিছু হটিতে বাধ্য হইতেছে। তেভাগার দাবি সেখানে কায়েম হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই ফসলের মরসুম হইতে বিলভাসানেও তেভাগার দাবি প্রবল হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা রাখি। এই সংগ্রামে এখানকার চাষীরা কতখানি ঐক্যবদ্ধ থাকিয়া তাহাদের দাবি জোরদার করিয়া তুলিতে পারিবে, জানি না। তবে ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া যতদূর ইহাদের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয়, দৃঢ়বদ্ধ আন্দোলনে ইহারাও কোনো অংশেই পিছাইয়া থাকিবে না।"

সত্যপ্রসাদের অনুমান যথার্থ। আশ্বিনের শেষ থেকে জলে টান ধরতেই চারি-দিকে যেন সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি থেকেই পুরোপুরি আমন ধান কাটার মরসুম শুরু হয়ে যাবে। পুরো বর্ষাকালটা অনেকেরই কেটেছে অভাব-কষ্টে। যাদের নিজেদের কিছুটা চাষের জমি আছে, তাদের অতটা কষ্টে পড়তে হয় না। কিন্তু যাদের প্রধানতঃ বর্গাচাষের উপর নির্ভর করতে হয়, তাদের কষ্টের আর পার থাকে না। জোতদারের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে, ধারকর্জ শোধ ক'রে, যে সামান্য ধান ঘরে আসে, তাতে ছেলেমেয়ের সংসারে কয়দিনই বা সাশ্রয় হয়। ঢ্যাঁপ, শালুক, বিলের মাছ—এসবও তখন পেট ভরানোর অপরিহার্য উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। বর্ষার জলে টান ধরতেই তাই সকলের মনে একটু আশার সঞ্চার ঘটে আমন ধানের ফসলটা ধরতে পারলে কিছুটা দিনের জন্য অন্ততঃ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

চাসীদের মনে উৎসাহের এবার অন্য একটা দিকও রয়েছে। বিলভাসানেও 'কৃষক-সমিতি' স্থাপিত হয়েছে। সমিতির সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত, আমন ধান কেটে এবার জোতদারের খামারের পরিবর্তে ভাগচাষীর খোলেনে তুলতে হবে। এবং জোত-দারকে তেভাগার দাবি মানতে বাধ্য করা হবে। বিলভাসানের ঘরে ঘরে ভাগ-চাষীদের মধ্যে নিঃশব্দে চলছে এর ব্যাপক প্রস্তুতি।

এরই মধ্যে কার্তিকের শেষের দিকে একটা ঘটনা ঘটে গেলো। বিলভাসানের যে কয়েকজন সম্পন্ন জোতদার ছিল, তারা চাষীদের মনোভাবের বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল। গত শ্রাবণে অনন্তর জমির পাট-কাটার ব্যাপারটাও তারা ভুলে যায়নি। সুতরাং আমন ধান কাটার মরসুমে ভাগচাষীরা যাতে জোর ক'রে ধান

কেটে নিয়ে যেতে না পারে, এ-বিষয়ে তারাও যথাসাধ্য প্রস্তুতি গড়ে তুলতে শুরু করল। এ-ব্যাপারে পুলিশের সহযোগিতা না পেলে চাষীদের ঠেকানো যে দুঃসাধ্য হবে, এটাও তারা অনুমান করতে পারল সহজেই। তাই ঘন ঘন কয়েকদিন তারা যাতায়াত করল থানায়। কিছু লেনদেনও চলল। উদ্দেশ্য, ধান কাটা শুরু হবার মুখেই চাষীদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার ক'রে ওদের মনোবল ভেঙে দেওয়া।

প্রহর দু'য়েক বেলা হবে তখন। জোয়ান-মরদ পুরুষ মানুষেরা কেউই তখন প্রায় ঘরে নেই। ক্ষেতে বিলে কোনো না কোনো কাজে বেরিয়েছে সবাই। বাড়ীতে রয়েছে কুচো-কাঁচা আর মেয়েমানুষেরা। ফুলি গোয়ালঘরের বেড়া বাঁধছিল। গোয়ালঘরের বেড়াটা ক'দিন ধ'রে খুলে পড়ে রয়েছে। বাঁধব বাঁধব ক'রেও বাঁধা হচ্ছে না। এসব পুরুষ মানুষের কাজ। কিন্তু ফুলির কোনো কাজেই অযোগ্যতা নেই। বরং পুরুষালী কাজগুলোতেই তার হাত খোলে বেশী।

নিবিষ্ট হয়ে কাজ করছিল ফুলি। হঠাৎ অল্পবয়সী একটি রাখাল ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলো—মল্লিহাটির খাল দিয়ে নাকি একটা টাবুরে নৌকা আসছে। আর সে নৌকাতে পুলিশ রয়েছে। খবরটা শুনে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াল ফুলি। কিন্তু কী করবে কিছুই স্থির করতে পারল না। ইতিমধ্যে খবরটা রটে গেছে। পাড়ার আরো অনেক মেয়ে-বউ এসে হাজির হ'লো ফুলির কাছে। ফুলি সকলকে একবার দেখে নিয়ে বলল—'চল্ তো সকলে একবার দেখে আসি ব্যাপারডা। সকলে মুড়ো ঝাঁটা হাতে নে। আর জুওড় দে।'

ফুলির কথা শেষ হতে না হতেই বউরা মিলে উলুধ্বনি দিতে শুরু করল। সে উলুধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল একপাড়া থেকে আর এক পাড়ায়, এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে। উলুর শব্দ একবার যার কানে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সেও উলু দিয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে দশবারোখানা গ্রাম উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। এদিকে ফুলি সকলকে ডাকতে ডাকতে ছুটল মল্লিহাটির খালের দিকে। ফুলির পিছনে পিছনে ছুটল মহিলারা। সকলের হাতে এক একগাছা ঝাঁটা।

পুলিশ আসার খবর তখন সব গ্রামেই রটে গেছে। এক অপূর্ব দৃশ্য শুরু হ'লো চারিদিকে। প্রতি গ্রাম থেকে মহিলারা ঝাঁটা হাতে উলু দিতে দিতে ছুটতে লাগল। রাস্তাঘাটের জলকাদা এখনো ভাল ক'রে শুকোয়নি। কিন্তু সেই জলকাদা ভেঙেই সকলে ছুটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাঁচ ছয় শ' মহিলা এসে হাজির হ'লো মল্লি-হাটির খালের কূলে। ভৈরব নদ থেকে বেরিয়ে এই খালটা বিলভাসানের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। আশেপাশে বিলের জল কমে এলেও খালটায় এখনো বেশ জল। খালের কূলে এসে সকলে দেখল, খবর যথার্থ। একটা টাবুরে নৌকায় ক'রে পুলিশ আসছে বিলভাসানের গ্রামে। পুলিশের নৌকা দেখে মেয়েদের উলুধ্বনি এবার আরো বেড়ে গেলো।

নৌকার ছইয়ের মধ্যে বড়ো দারোগা নিজে ছিলেন। সঙ্গে জন চারেক কনস্টেবল। মেয়েদের উলুধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে দারোগাবাবু এসে দাঁড়ালেন ছইয়ের বাইরে। এ-রকম একটা দৃশ্য তাঁর মনেও বিস্তর কৌতূহলের সৃষ্টি

করেছে। পুলিশ আসতে দেখলে বিলভাসানের জোয়ান মদ্দ পুরুষমানুষগুলোই ভয়ে গা-ঢাকা দেয়। আর মেয়েদের কথা তো একেবারেই আলাদা। কিন্তু আজ সেই বিলভাসানেরই এতগুলো মেয়েছেলে পুলিশের নৌকার সামনে এইভাবে এসে দাঁড়িয়েছে! ব্যাপারটা অবাক হবার মতো বৈকী!

দারোগা নৌকা থামাতে বললেন মাঝিকে। নৌকার গলুইয়ের উপর দাঁড়িয়ে মেয়েদের উদ্দেশ ক'রে বললেন—'তোমরা কি চাও? এখানে এসে ভিড় করেছো কেন?'

ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল ফুলি। উঁচু গলায় বলল—'আপনাদের ফিরে যাতি হবে দারোগাবাবু। কোনো গেরামের কাউরে ধ'রে নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

ফুলির কথায় বেশ কৌতুক বোধ করলেন দারোগা। বিলভাসান অঞ্চলে কৃষক-আন্দোলন গড়ে উঠেছে, এটা তার অজানা নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এখানকার মহিলারাও যে এতটা এগিয়ে এসেছে, এটা তাঁর জানা ছিল না। হাসি হাসি মুখ ক'রে দারোগা বললেন—'যদি ফিরে না যাই, কি করবে তোমরা?'

ফুলি সংক্ষেপে জবাব দিলো—'দেখতিই পারবেন কি করি।'

দারোগা মাঝিদের দিকে ফিরে এবার দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—'এ্যাই, নৌকা চালা।'

মাঝিরা সবে হাত দিয়েছে বৈঠায়। ফুলি হুঙ্কার ছাড়ল—'ধর্ সকলে নৌকো। টা'নে তোল্ ড্যাঙ্গায়।'

দেখতে দেখতে মহিলারা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল নৌকার গলুইয়ের উপর। চড় চড় ক'রে বিশাল টাবুরে নৌকাখানা টেনে তুলল খালের কূলে শুকনো ডাঙ্গার উপর। নৌকার উপর বড়ো দারোগা আর চারজন কনস্টেবল ঠায় দাঁড়িয়ে। দু'জন কনস্টেবল বন্দুক উঁচিয়ে তাক করল মহিলাদের দিকে। দারোগা হাতের ইশারায় তাদের বন্দুক নামাতে বললেন। নিরস্ত্র স্ত্রীলোকদের উপর বন্দুক চালানোয় আর যাই থাক, পৌরুষ নেই। তাছাড়া দিনকাল ভালো নয়। উত্তর বাংলায় চাষীদের আন্দোলন জটিল আকার ধারণ করেছে। সেখানকার এক থানার ও. সি. চাষী মেয়ে-বউদের মিছিলে গুলী চালানোর আদেশ দিয়ে ফ্যাসাদে পড়েছেন। খবরের কাগজে এ-কাজের জন্য গভর্নমেন্টের সমালোচনা বেরিয়েছে। সে ও. সি.-র এখন চাকরি নিয়ে টানাটানি। সুতরাং বিচক্ষণ দারোগা বুঝলেন, বুঝেশুনে কাজ করতে হবে। অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

শুকনো ডাঙার উপর নৌকায় বসে থাকার কোনো মানে হয় না। এক লাফ দিয়ে দারোগা নৌকার গলুই থেকে নিচে নামলেন। পিছনে কনস্টেবলরা। রাগে অপমানে দারোগার ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। দারোগাকে নামতে দেখে মহিলারা যে একটু ভয় পেলো না, তা নয়। কিন্তু কেউই পেছুলো না। চারিদিক থেকে সবাই তাঁকে ঘিরে ধরল।

সকলের সামনে এসে দাঁড়াল ফুলি। বলিষ্ঠ আকৃতির পুরুষালী চেহারার ফুলির দিকে এক পলক অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে দারোগা বললেন—'তোমাদের এই কাজের জন্য আমি তোমাদের এ্যারেষ্ট করতে পারি, তা জানো?'

ফুলি বলে উঠল—'রেষ্টো-ফেষ্টো যা আপনি করতি পারেন, করেন দারোগা-

বাবু। কিন্তু নৌকো নিয়ে আর আপনারে আগোতি দেবো না। আপনারে ফিরে যাতিই হবে।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন ব'লে উঠল—'আর, ফিরে যাওয়ার আগে আপনারে মাফ চাইয়ে যাতি হবে।'

সকলে সমস্বরে সায় দিয়ে উঠল তার কথায়।

দারোগা বিচক্ষণ লোক। বুঝলেন, এ ছাড়া উপায় নেই। মেয়েদের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই বিসদৃশ অবস্থা থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়া যায়, ততই মঙ্গল। পিছনে দাঁড়িয়ে কনস্টেবলগুলোও হয়ত মনে মনে মজা পাচ্ছে। নিরুপায় দারোগা-বাবু অগত্যা হাত জোড় ক'রে বললেন—'ঠিক আছে, আমি তোমাদের কাছে মাফ চাইছি। তোমরা আমার নৌকা ছেড়ে দাও।'

ফুলি এগিয়ে গিয়ে নৌকার গলুইয়ে হাত রেখে বলল—'নামা সকলে নৌকো।'

মহিলাদের হাতের টানে নৌকা যেমন ক'রে উপরে উঠে এসেছিল, তেমনি ক'রে আবার চড় চড় ক'রে নেমে গেলো খালের জলে।

মাথা নিচু ক'রে দারোগাবাবু আর চারজন কনস্টেবল গিয়ে নৌকায় উঠলেন। ধীরে ধীরে টাবুরে নৌকাখানা এগিয়ে চলল পিছন ফিরে। যতক্ষণ পর্যন্ত চোখে পড়ল নৌকাখানা, সমস্বরে দিক-দিগন্ত কাঁপিয়ে উলু দিয়ে চলল মহিলারা।

বিলভাসানে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া ঘটল সাংঘাতিকভাবে। সামান্য কটা মেয়ে-মানুষের দাপটে প্রবল পরাক্রমশালী বড়োদারোগা বাধ্য হয়েছেন দলবল নিয়ে ফিরে যেতে।—এ ঘটনা বিলভাসানের চাষীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা আর মনোবলের সঞ্চার ঘটাল।

তবে এ ঘটনা যে দারোগা সহজে ভুলতে পারবেন না, আর জোতদারেরাও এ নিয়ে দারোগাকে ক্রমশঃ তাতিয়ে তুলবে, এটা কারো বুঝতে বাকি রইল না। আর তার পরিণাম কী দাঁড়াবে, তাও অজানা নয়। কিন্তু যে নতুন প্লাবনের ধাক্কা এলো, তাতে ওসব পিছুটানের কথা আর কারো মনে রইল না।

॥ উনিশ ॥

বিলভাসানে অগ্রহায়ণ নামল। উত্তুরে হাওয়ায় মিঠে শীতের আমেজ। ক্ষেত-প্রান্তর জুড়ে পাকা ধানের সমারোহ। দুপুরের সোনালী রোদে ধানের পরিপুষ্ট বাইলগুলো ঝিকমিক করে। রাতের শিশিরের স্পর্শে অনাবিল স্নিগ্ধতায় আপ্লুত হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যেটা একটু গাঢ় হতেই সভা বসল বাঁকপুরের বটতলায়। গত দু'দিন ধরেই নেতারা আসছিলেন এক এক ক'রে। ঠিক আত্মগোপন ক'রে না থাকলেও আলাদা আলাদা ক'রে তাঁরা এক এক চাষীর বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। সতর্ক

থাকা ভালো। যে কোনো সময়েই পুলিশের আগমন ঘটা বিচিত্র নয়। সত্যপ্রসাদ তো রয়েছেনই। এছাড়া এসেছেন নিখিল রায়, নুটু মিত্র, কাদের সাহেব, আব্দুল হক সায়েব প্রভৃতি নেতা। এছাড়াও আরো কয়েকজন নতুন নেতার মুখ দেখা গেলো। আজকের সভার কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল চাষীদের মধ্যে। ফলে সন্ধ্যে হতে না হতেই গোটা বটতলাটা গাদাগাদি ঠাসাঠাসি ভিড়ে ভরে গেলো। তবে ভিড় হলেও কথাবার্তা কম। সকলেরই বুকের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা থিরথির করছে। ফুলিও তার নারী-বাহিনী নিয়ে বসে আছে ভিড়ের একপাশ ঘেঁষে।

স্কুলের বারান্দার উঁচু জায়গাটায় গোটা কয়েক হ্যারিকেন জ্বলছে টিমটিম ক'রে। সেখানে নেতারা বসেছেন।

আজ নেতারা কেউই দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন না। দু'একজন শুধু সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলেন।

নিখিল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'আমরা এতদিন ধ'রে যে সময়টার জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিলাম, আজ সেই সময় এসেছে। এখন আর কথা নয়, এবার আমাদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তার আগে আমাদের কতকগুলো নিয়ম তৈরী ক'রে নিতে হবে। এবং সে নিয়ম যাতে ঠিকমতো পালন করা হয়, সেদিকেও সবাইকে নজর রাখতে হবে।'

যতীনের সতর্ক দৃষ্টি সন্ধ্যার অন্ধকারেও ভিড়ের মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'আমি একটা কথা বলব।'

বক্তৃতার মধ্যে বাধা পেয়ে বিরক্ত হলেন নিখিল। কিন্তু শান্তকণ্ঠে বললেন—'ঠিক আছে যতীনবাবু, আগে আপনার কথাই শুনি।

যতীন ভিড়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দৃষ্টি রেখে বলল—'এই মিটিং 'কৃষক-সমিতি'র মিটিং। কৃষক-সমিতির বিরোধিতা করতে পারে, এমন কাউকে আমরা এখানে থাকতে দেব না। যদি তেমন কেউ এখানে থাকো, সে চলে যাও।'

যতীনের কথায় সবাই চমকে উঠল। যতীনের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে সকলের চোখ সেই নির্দিষ্ট জায়গাটাতে গিয়ে পড়ল। হঠাৎ দেখা গেলো, সেখান থেকে পাঁচ-ছয়জন লোক নিঃশব্দে উঠে গেলো মাথা নিচু ক'রে। বোঝা গেলো, ওরা জোতদারদের চর। ওরা উঠে যেতেই চাষীদের কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল—'ধর-ধর—শালাদের।'

নিখিল বললেন—'যতীনবাবু, আপনার সতর্কতার জন্য ধন্যবাদ।'—চাষীদের দিকে ফিরে বললেন—'সবাই শান্ত হয়ে বোসো। সভায় কোনো গোলমাল করা চলবে না। তবে, আমাদের আরো সতর্ক হয়ে চলতে হবে। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগাযোগ গ'ড়ে তুলতে হবে। জোতদারের চরেরা মিশে যেতে চাইবে আমাদের সঙ্গে। তাদের আলাদা ক'রে ফেলতে হবে। জোতদারের দালালি করবে যারা, তাদের আমরা ছেড়ে দেব না কিছুতেই।'

চাষীদের মধ্যে উল্লাসব্যঞ্জক একটা চাপা হুঙ্কারধ্বনি উঠল।

নিখিল বললেন—'আমাদের হাতে সময় কম। এবার চটপট আমাদের কতক-

গুলো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই সিদ্ধান্তগুলো কমরেড সত্যপ্রসাদ মুখার্জী তোমাদের কাছে বুঝিয়ে বলবেন।'

সত্যপ্রসাদ উঠে দাঁড়ালেন। সবাই উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সত্যপ্রসাদ বললেন—'ভাইসব, এতদিন আমরা শুধু কথা বলেছি। এবার আমাদের পরীক্ষার দিন। যে তেভাগার স্বপ্ন আমরা এতদিন ধ'রে দেখেছি, আজ তাকে আমাদের সফল ক'রে তুলতে হবে। এর জন্য কতকগুলো নিয়ম আমাদের মেনে চলতে হবে। প্রথম কথা যেটা, তা হ'লো, কোনো বর্গাচাষীই আলাদাভাবে তার ক্ষেতের ধান কাটবে না। দল বেঁধে অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো ক্ষেতের ধান একসঙ্গে কেটে ফেলতে হবে। ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গেই সব ধান নিয়ে যেতে হবে যার যার খোলেনে। জোতদাররা কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক এক তল্লাটের ধান কেটে ফেলতে হবে। মনে রাখতে হবে, সব কাজই করতে হবে দল বেঁধে। কোনো কিছুতেই দল ভাঙা চলবে না। সবাই দলবদ্ধ থাকলে জোতদাররা হাজার চেষ্টা করলেও কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। বাধা দিতে এলেও পেরে উঠবে না আমাদের সঙ্গে।'

সত্যপ্রসাদ থামতেই কাদের সায়েব উঠে দাঁড়ালেন—'আর একটা কথা। একটা রক্ষী-বাহিনী গড়তে হবে। সবাই যখন ধান কাটার কাজে ব্যস্ত থাকবে, এই রক্ষী-বাহিনী তখন চারিপাশে পাহারা দেবে। কোনো দিক দিয়ে জোতদারদের আক্রমণ আসতে পারে বুঝলেই, এরা আগে থেকে সবাইকে সাবধান ক'রে দেবে।'

ভিড়ের মধ্যে এক জায়গায় একটা গুঞ্জন উঠল। নিখিল উঠে দাঁড়িয়ে জোরালো গলায় বললেন—'ওভাবে কথা বললে চলবে না। যদি কারো কিছু বলার থাকে, উঠে দাঁড়িয়ে বলতে হবে।'—

একজন বয়স্ক চাষী উঠে দাঁড়াল—'আমরা এট্টা কথা বলতি চাই। আমরা ধান কা'টে নিয়ে আসবো, আর জোতদাররা ঘরে ব'সে চুপ ক'রে তামাক খাবে, তা তো মনে কয়না। ওদের লা'ঠেল আছে, গুণ্ডো আছে. ওরা যদি আমাদের দাবোড় নাগায়, আমরা তাহলি কি ক'রে পার পাবো ?'

নিখিল বললেন—'ঠিক কথা! জোতদাররা এত সহজে ব্যাপারটা মেনে নেবেনা। ওরা বাধা দেবেই। সমস্ত শক্তি নিয়েই ওরা বাধা দেবে। কিন্তু আমাদেরও তার জন্য তৈরী থাকতে হবে। কৃষক-সমিতির প্রত্যেকটি কর্মীকে লাঠি বা অন্য অস্ত্র সঙ্গে রাখতে হবে। অকারণে মারামারি করার দরকার নেই। মনে রাখতে হবে, তেভাগা হাসিল করাই আমাদের আসল কাজ। তবে দরকার হ'লে যে কোনো সময়েই অস্ত্র ব্যবহারের জন্য তৈরী থাকতে হবে। মারতে এলে আমরাও মারব।'

আবদুল হক সায়েব বললেন—'ধান কাটার সময় ছাড়াও অন্য যে কোনো সময়ে যে কোনো জায়গায় বিপদের আভাস পেলেই সেখানে ছুটে যেতে হবে। হাতের কাছে যতটা পারা যায় অস্ত্র মজুত রাখতে হবে। যেখান থেকে যে বাধাই আসুক, দল বেঁধে সবাই রুখে দাঁড়াতে হবে।'

নুটু মিত্র বললেন—'আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। এ-সময় আমাদের

একতার দরকার সব থেকে বেশী। এজন্য আমার অনুরোধ, পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে যেসব দলাদলি, ঝগড়াঝাঁটি আছে, সেসব পুষে রাখা চলবে না।'

চাষীরা সমস্বরে বলে উঠল—'ঠিক কথা, ঠিক কথা।'

মেয়েদের দলের দিকে তাকিয়ে সত্যপ্রসাদ বললেন—'ফুলিদি কোথায় গেলে?'

আবছা অন্ধকারের মধ্যে ফুলির দীর্ঘ দেহটা সোজা হয়ে দাঁড়াল।

ফুলির প্রসঙ্গে নেতাদের মধ্যেও বেশ কৌতূহল দেখা দিলো। বিশেষ ক'রে আজ যাঁরা এখানে নতুন এসেছেন। ফুলির অসম-সাহসিকতা এবং তার 'মহিলা-সমিতি'র কার্য-কলাপের কথা ইতিমধ্যেই নেতাদের মধ্যেও পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সকলেই ফুলিকে কিছুটা সমীহের চোখে দেখেন।

সত্যপ্রসাদ বললেন—'ফুলিদি, তোমাদেরও কাজের ভার নিতে হবে। ধান-কাটার সময় তোমরাও পাহারাদারের কাজ করবে। সঙ্গে অস্ত্র রাখবে তোমরাও। কাজের সময় কারো জলতেষ্টা পেলে জল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবে।'

চাষীদের সব প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে সভা শেষ হ'লো। সভা শেষ হয়ে যাবার পরও নেতারা নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলেন। জলধর, নবীন, রামপদ, ভজন, জগেন, বাঘা এবং অন্যান্য গ্রামের আরো কয়েকজন জোয়ান চাষী একান্ত আনুগত্যে তাদের পাশে রইল। যতীনও সব কথাবার্তা আলোচনা শুনল মন দিয়ে।

পরদিন শুরু হ'লো এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। বিলভাসানের নিরুত্তেজ নিস্তরঙ্গ জীবনে এক সীমাহীন উত্তেজনা আছড়ে পড়ল। শত শত চাষী দলবদ্ধ পঙ্গপালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল এক একটা ক্ষেতের উপর। কয়েক নিমেষেই ধান কাটা, আঁটি বাঁধার কাজ শেষ হয়ে যায়। নিমেষেই আবার সেসব ধানের আঁটির বোঝা মাথায় মাথায় পৌঁছে যায় ভাগচাষীর খোলেনে। এক ক্ষেত থেকে আর এক ক্ষেত। সারাদিন ধ'রে চাষীরা বিলভাসানের ধান-ক্ষেতগুলি উথাল-পাথাল ক'রে ফেলল।

শুধু সেদিনই নয়। পর পর কদিন ধ'রেই চলল এ-রকম। বর্গাচাষের প্রায় সমস্ত জমি থেকেই চাষীরা ধান কেটে বর্গাচাষীর খোলেনে তুলল। এতবড়ো কাজ চলল, কিন্তু কোথাও কোনো গোলমাল নেই। হৈ চৈ নেই। ফুলির 'নারী-সমিতি'র মহিলারাও সারাক্ষণ চাষীদের আশে-পাশে থেকে তাদের উৎসাহিত করতে থাকল। দা কুড়ুল ঝাঁটা হাতে নিয়ে ধানক্ষেতের চারিপাশে দাঁড়িয়ে সতর্ক নজর রাখল আশেপাশে। অকল্পনীয় জাগরণ দেখা দিলো চাষীদের মধ্যে।

স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীতে শুধু যে বর্গাচাষীরাই যোগ দিলো, তা নয়। যারা বর্গাচাষী নয়, এমন কি যারা নিছক ক্ষেতমজুর, তারাও দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়ে এগিয়ে এলো বর্গাচাষীর ক্ষেতের ধান কাটার কাজে। পরপর কদিন ধ'রে বিলভাসানের সারাটা সময় চরম উত্তেজনায় থরথর ক'রে কাঁপতে থাকল।

অনন্ত, ভজন, পুলিন, বদন প্রভৃতি স্থানীয় জোতদারেরা কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিল আগে থেকেই। আমন-ধান কাটার সময় এবার যে কিছুটা গোলমাল হবে, আগে থাকতেই তারা তা অনুমান করেছিল। ফলে যে যার সাধ্য অনুযায়ী ভাড়াটে লাঠিয়াল সড়কিওয়ালাদের সঙ্গে কথাও ব'লে রেখেছিল। তৈরী রেখেছিল নিজেদের লোকজনও। কিন্তু এ রকম একটা ব্যাপার ঘটতে পারে, তারা তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি। দশ-বিশজন লোকের মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু যেখানে শত শত চাষী একযোগে সংঘবদ্ধ হয়ে ক্ষেতের পর ক্ষেতের ধান উড়িয়ে নিয়ে যায়, সেখানে তাদের কীভাবেই বা বাধা দেওয়া যায়! ফলে নিষ্ফল ক্রোধে দূরে দাঁড়িয়ে আঙুল-কামড়ানো ছাড়া জোতদারদের আর কিছুই করণীয় থাকল না।

দিন পনেরো বাদে চাষীদের বিজয়-মিছিল বের হ'লো। দলে দলে চাষীরা এসে যোগ দিলো মিছিলে। সকলেরই হাতে লাঠি। সে লাঠির মাথায় লালঝাণ্ডা বাঁধা। কেউ কেউ নিয়ে এলো জয়ঢাক। সে জয়ঢাকের গম্ভীর নিনাদে বিলভাসানের আকাশ বাতাস গম্‌গম্‌ ক'রে উঠল।

মিছিলের একেবারে সামনে থাকল ফুলির নারী-বাহিনী। মুহুর্মুহু উলুধ্বনিতে তারাও চারিদিক মুখরিত ক'রে তুলল। মাঝেমাঝেই মিছিল থেকে শ্লোগান উঠতে লাগল—'ইন্‌কিলাব—জিন্দাবাদ।'—'তেভাগার দাবী—মানতে হবে।'—'আধি নয়—তেভাগা চাই।'—'নিজ খামারে—ধান তোলো।'—'রসিদ ছাড়া খাজনা নাই—বাজে আদায় বন্ধ চাই।'—'বর্গাচাষীকে উচ্ছেদ করা—চলবে না, চলবে না।'—এমনি সব নানা শ্লোগান। সারা দুপুর বিকেল জুড়ে বিলভাসানের প্রতিটি গ্রামের রাস্তা ধ'রে দীর্ঘ মিছিল পথ-পরিক্রমা ক'রে চলল। বিজয়োল্লাসের ঢেউ প্রতিটি চাষী-পরিবারে অভূতপূর্ব শিহরণ জাগিয়ে তুলল।

জোতদাররা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু তারা চাষীদের তেভাগার দাবির কাছে নতিও স্বীকার করল না। বর্গাচাষীদের খোলেনে ধান ঝাড়াই-বাছাই, মলা-ডলার কাজ হয়ে গেলে বাছাই ধান তিনভাগ করা হ'লো। দুইভাগ উঠল বর্গাচাষীর গোলায়। বাকি ভাগ নেবার জন্য জোতদারদের কাছে খবর পাঠানো হ'লো। কিন্তু স্থানীয় জোতদাররা তো বটেই—নড়াইল, বাসুন্দে, আফ্‌রা প্রভৃতি জায়গার জোতদারেরাও তাঁদের ভাগ নেবার জন্য কেউ এগিয়ে এলেন না। চাষীরা তখন প্রতি গ্রামে ধর্মগোলা স্থাপন করল। জোতদারদের যার যার ধানের হিসাব লিখে রেখে ওদের ধান জমা ক'রে রাখল ধর্মগোলায়।

জোতদারদের জমির ধানের বিলি-ব্যবস্থা এ-ভাবে করা গেলেও অন্য একটা ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলো। বিলভাসানের প্রতিটি গ্রামেই বেশ কয়েক ঘর ক'রে সক্ষম-পুরুষ-মানুষহীন বিধবার পরিবার আছে। বেশীর ভাগেরই দু'পাঁচ বিঘে ক'রে চাষের জমি আছে। বাড়ীতে যেহেতু চাষ-আবাদ করার সক্ষম পুরুষ মানুষ নেই,—তাই বাধ্য হয়েই তাদের জমি বর্গায় চাষ করাতে হয়। এবং যেহেতু তারা বর্গা-চাষীকে দিয়ে জমি চাষ করায়, ফলে শ্রেণীগতভাবে তারা জোতদার পর্যায়ভুক্ত।

সামান্য দু'চার বিঘে জমির মালিক হয়েও এরা জোতদার আখ্যা পেলো।

এই সমস্ত অসহায় বিধবা বর্গাচাষীদের এই মাতামাতিকে ভালো চোখে দেখতে পারল না। চাষীরাও এদের নিয়ে খুব দ্বিধায় পড়ে গেলো প্রথম দিকে। কিন্তু তারপর নিজেরাই আবার সভা ক'রে ঠিক করল—এইসব অল্প জমির মালিক অসহায় পরিবারগুলির ক্ষেত্রে তেভাগার আইন প্রযোজ্য হবে না। কেউ কেউ অবশ্য এক যাত্রায় পৃথক ফল ক'রে লাভ কী—এ জাতীয় মন্তব্য করল। কিন্তু অধিকাংশ চাষীই আগের মতকেই সমর্থন করল। সত্যপ্রসাদও আন্তরিকভাবে সম্মতি দিলেন চাষীদের এ প্রস্তাবে। ফলে এই গরীব বিধবার পরিবারগুলিকে তাদের প্রাপ্য অর্ধেক ধানই দিয়ে দেওয়া হ'লো। চাষীদের এই সুবিবেচনায় তারাও কৃষক সমিতি এবং নারী-সমিতির একান্ত অনুরক্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু আসল জোতদারেরা চুপ ক'রে ব'সে থাকল না। সামনা-সামনি লড়াইয়ে এগিয়ে আসার মুরোদ না থাকলেও উঠে-পড়ে লেগে গেলো অন্যভাবে চাষীদের জব্দ করার জন্য। অনন্ত পুলিন বদনেরা নিজেদের মধ্যে মিটিং করতে লাগল ঘনঘন। মাঝে মাঝেই নানা রকম ভেট নিয়ে থানায় দারোগাকে সেলাম দিতে থাকল।

সকালের দিকে নতুন ধানের ফ্যানা ভাত খেয়ে কাস্তে হাতে ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিল জলধর। ক্ষেতের ধান কাটা হয়ে গেছে। খড় বা 'নাড়া'গুলো পড়ে রয়েছে। জলধর ক্ষেতে যাচ্ছিল নাড়া তুলতে। জ্বালানির কাজে লাগবে। অকারণেই একটু ঘুর-পথে কৈলাসের বাড়ীর পাশের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। উদ্দেশ্যটা সফল হ'লো। ভিটের নিচের দিকে আমতলায় দাঁড়ানো দেখা গেলো চাঁপাকে। জলধর অবশ্য চাঁপাকে দেখে একটু হেসে এগিয়ে যাবার উপক্রম করল। কিন্তু চাঁপা ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জলধরকে ডাকল হাতছানি দিয়ে। অগত্যা জলধর ফিরে এসে চাঁপার পাশে দাঁড়াল। মিটিমিটি হাসতে থাকল চাঁপার দিকে তাকিয়ে। চাঁপা রাজহাঁসের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে চোখে ঝিলিক তুলে বলল—'অমন সং-এর মতো হাস্‌তিছো ক্যানো ?'

—'বাঃ রে ! হাসি পালি হাসবো না ?'—জলধর তেমনিভাবে হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

চাঁপা রাগের ভান ক'রে বলে—'ঢং কোথাকার !' জলধর মুগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ চাঁপার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—'জানিস্, মাতুব্বর জ্যাঠা কাল আমারে কি কইছে ?'

ভিতরে ভিতরে একটু চমকে ওঠে চাঁপা। জলধরের সঙ্গে চাঁপার বিয়ের ব্যাপারে যে মা-বাবার মধ্যে মাঝে-মাঝে কথাবার্তা হয়, এটা জানে চাঁপা। তবে এ নিয়ে বাবা জলধরকে কিছু বলেছে কিনা, সেটা জানে না। কিন্তু সেটা অনুমান ক'রেই চাঁপা যেন একটু লজ্জা পেলো। মাথা নিচু ক'রে নখ খুঁটতে থাকল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

জলধর উৎসাহিত হয়ে বলে—'মাতুব্বর জ্যাঠা কইছে,ফালগুন মাসেই তোর সাথে

আমার বিয়ে দেবে। জ্যাঠা কইছে, একদিন মা'র সাথে এ-নিয়ে কথাবার্তা ক'বে।'

চাঁপাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে জলধর বলে—'কি রে, একেবারে চুপ মা'রে গেলি যে!'

ঝাম্‌টি দিয়ে ওঠে চাঁপা—'হয়, তোমারে কইছে! বিয়ে অমনি দিলিই হলো—তাই না?' জলধর একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—'তাই ক' তাহলি! তা ঠিক আছে, জ্যাঠারে আমি বল্‌বানি যে, চাঁপা আমারে পছন্দ করে না।'

চাঁপা রেগে ওঠে—'কোন্ সময় আমি বললাম তোমারে সে কথা?'—তারপর হেসে ফেলে বলে—'ঠিক আছে, তাই ক'লি যদি তোমার মনে শান্তি হয়, তাই কইও।'

চাঁপার সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে জলধরের মুগ্ধ দৃষ্টি আরো ঘন হয়ে ওঠে।

হঠাৎই চমকে ওঠে দু'জনে। বাঁকপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়া থেকে প্রবলবেগে দুম্‌দুম্ শব্দে জয়ঢাক বাজছে। এ জয়ঢাকের শব্দ তো বিপদের সঙ্কেত! সব বাড়ীর থেকেই হুড়মুড় ক'রে লোকজন বেরিয়ে আসতে থাকে। এমন সময় অল্প-বয়সী একটি চাষী-ছেলেকে দেখা গেলো রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে আর বলছে,—'তাড়াতাড়ি চলো সকলে, গেরামে পুলিশ আস্‌তিছে। গো-চরের মাঠ পর্যন্ত আইছে।'

ছেলেটি চীৎকার করতে করতে এগিয়ে গেলো সামনের দিকে।

খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো। খবর কানে যাওয়ামাত্র সবাই জয়ঢাক পেটাতে শুরু করল। জয়ঢাকের প্রবল শব্দে গ্রাম-গ্রামান্তর উচ্চকিত হয়ে উঠল। সঙ্গে মেয়েদের উলুধ্বনি। একটু বাদেই দেখা গেলো, আশে পাশের সব গ্রাম থেকে পিল্ পিল্ ক'রে মেয়ে-পুরুষের দল বেরিয়ে আসছে। হাতের কাছে যে যা পেয়েছে, অস্ত্র হিসেবে তাই তুলে নিয়েছে। দা, বঁটি, খোন্তা, কুড়ুল। দু'একজনের হাতে লাঠি, রামদা, সড়কি। মাঠ ঘাট ভেঙ্গে প্রবল বিক্রমে সবাই ছুটে চলেছে বাঁকপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ার গো-চরের মাঠের দিকে।

জলধর প্রথমটায় একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপর সকলকে ছুটতে দেখে সেও ছোটা শুরু করল। যেতে যেতে রাস্তার পাশ থেকে একটা কচা গাছের মস্ত ডাল ভেঙ্গে কাঁধে তুলে নিলো লাঠির মতো।

ওদিকে গো-চরের মাঠে তখন জমা হয়েছে হাজার খানেক নারী-পুরুষ। চারিদিক থেকে আরো সবাই ছুটে আসছে দলে দলে। জয়ঢাক আর উলুধ্বনির প্রবল শব্দে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছে।

থানা থেকে মেজ দারোগা জন-কয়েক বন্দুকধারী কনস্টেবল নিয়ে সকাল সকালই রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু এতটা রাস্তা আসতে আসতে একটু বেলা চড়ে গেলো। হেঁটেই আসছিলেন সবাই। অনন্ত বিশ্বাস, পুলিন রায়ের দল গিয়ে বেশ কয়েকজনের নামে এজাহার দিয়ে এসেছিল। দারোগার ইচ্ছে ছিল, অতর্কিতে গ্রামে ঢুকে গ্রেপ্তার ক'রে ফেলবেন কয়েকটাকে। কিন্তু কী ক'রে যে তাঁর আসার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, বুঝতে পারলেন না। অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হ'লো।

গো-চরের মাঠ পার হয়ে বাঁকপুর গ্রামে ঢোকার মুখেই তিনি দেখলেন, শত শত চাষী নারী-পুরুষ তাঁর সামনে দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বিল-বাদাড় ভেঙ্গে ছুটে আসছে আরো অনেকে। জয়ঢাকের প্রবল শব্দ বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। কার্যতঃ তিনি এখন ওদের হাতে বন্দী। সঙ্গে অবশ্য বন্দুকধারী কনস্টেবল রয়েছে। তিনি নিজেও সশস্ত্র। কিন্তু এই অগণিত জনতার সামনে এই ক'জন কনস্টেবলের কী-ই বা মূল্য আছে! এখন আর এক পা এগোতে হ'লেই গুলী চালাতে হবে। তাতে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। একবার পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে সমূহ বিপদ ঘটবে। গুলী চালালে কিছু হতাহত হবেই। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে তখন।

নানা দিক চিন্তা ক'রে দারোগা একটু বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তবু খাপের রিভলভারটা খুলে হাতে নিয়ে সামনের দিকে একটু এগিয়ে বললেন—'রাস্তা ছেড়ে দাও। আমার কাজ করতে দাও। নইলে বাধ্য হবো গুলী চালাতে।'

কিন্তু জনতার কাছ থেকে কোনো উত্তর এলোনা। শুধু প্রবল শব্দে বেজে চলল জয়ঢাক। আর সে জয়ঢাকের শব্দকে ছাপিয়েও জনতার ভিতর থেকে অবিরত ধ্বনি উঠতে লাগল—'ইন্‌কিলাব—জিন্দাবাদ।' —'চাষীর লড়াই—চল্‌ছে চল্‌বে।' —'পুলিশ তুমি—ফিরে যাও, ফিরে যাও।'

দেখতে দেখতে পুলিশের সামনে জনতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর দুর্ভেদ্যতর হয়ে উঠল। অগত্যা কনস্টেবলদের নিয়ে পিছু হঠলেন মেজ দারোগা। চাষীদের সঙ্ঘ-শক্তি আর সুদৃঢ় প্রতিরোধের মুখে পুলিশ বাধ্য হ'লো মাথা নোয়াতে।

॥ কুড়ি ॥

সেদিন ফিরে গেলেও পুলিশের তৎপরতা বাড়তে লাগল ক্রমেই। মাঝে মাঝেই বিলভাসানের গ্রাম-সীমানায় তাদের আবির্ভাব ঘটতে থাকল। শক্ত-সমর্থ যে কোনো চাষীকে গ্রেফতার করাই এখন তাদের লক্ষ্য। বিশেষ ক'রে সত্যপ্রসাদ এবং ফুলিকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ হন্যে হয়ে উঠল। ফলে মাঝে মাঝেই অতর্কিতে হানা দিতে লাগল পুলিশ। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফল হতে লাগল একই। পুলিশের আগমন-সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা দলবদ্ধভাবে তাদের সামনে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সেই প্রতিরোধ ভেদ ক'রে পুলিশের পক্ষে বিলভাসানের কোনো গ্রামেই প্রবেশ করা সম্ভব হয়না।

বিলভাসানের সীমান্ত অঞ্চলের গ্রামগুলিতেও চাষীরা সব সময়েই সতর্ক প্রহরা মোতায়েন রাখে। পুলিশ আসার সম্ভাবনা দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই তারা চারিদিকে সে সংবাদ ছড়িয়ে দেয়। চারিদিকে বেজে ওঠে অবিরত জয়ঢাকের বাজনা। চাষীরা যে যেখানে থাকে, হাতের কাছে যে অস্ত্র পায়, তাই নিয়ে ছুটে এসে পুলিশের

সামনে গ'ড়ে তোলে অটল প্রতিরোধ। বিলভাসানের সীমান্ত অঞ্চলের গ্রামগুলিতে পাহারা দেবার কাজে যে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে উঠেছে, আজকাল তাতে যোগ দিয়েছে কষ্টীরামও। এ-কাজে কষ্টীরামের যোগ্যতা সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে।

কিন্তু এরই মধ্যে একদিন পুলিশের হাতে গ্রেফ্‌তার হয়ে গেলো জগেন আর রামপদ। বিলভাসানের উত্তর প্রান্তের সীমান্ত অঞ্চলের গ্রাম হ'লো বনখালি। বনখালি গ্রামের পরেও বিলভাসানের চাষীদের কিছু কিছু ক্ষেত-জমি আছে। ওখানেই গিয়েছিল জগেন আর রামপদ। দু'জনেরই কয়েক কাঠার একটা ছোট ক্ষেত আছে ওখানে। দুপুরের দিকে দু'জনে সেই ক্ষেতে গিয়েছিল। কিন্তু ওপাশের জঙ্গল-অঞ্চলের রাস্তা দিয়ে কখন্ যে পুলিশের একটা দল নেমে এসেছে, তারা তা টেরও পায়নি।

মেজ দারোগা আজও যথারীতি পুলিশ নিয়ে বিলভাসানের গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। তবে আজ সোজা রাস্তায় না এসে একটু ঘোরা পথে আসছিলেন। উত্তরের জঙ্গলের রাস্তা থেকে ক্ষেতের মধ্যে নেমেই মেজ দারোগার নজর পড়ল জগেন আর রামপদর দিকে। বন্দুকধারী কনস্টেবলদের নির্দেশ দিতেই তারা বন্দুক বাগিয়ে অতর্কিতে জগেন আর রামপদকে ঘিরে ফেলল চারিদিক থেকে। নিঃশব্দে আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া জগেন আর রামপদর কোনো গতি রইল না। দু'জনের হাতে হাতকড়া পরানো হ'লো। একজন কনস্টেবল একটা বেতের লাঠি দিয়ে আচ্ছা ক'রে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলো দু'জনের পিঠে। মেজ দারোগা তাঁর পুলিশ-বাহিনীকে দ্রুত থানায় ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন বন্দীদের নিয়ে।

খবরটা কিন্তু চাপা থাকল না। বনখালিতে যারা সংবাদ সংগ্রহকারী ছিল, তারা জয়ঢাকের শব্দে দ্রুত চারিদিকে এ-দুঃসংবাদটি ছড়িয়ে দিলো। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে খবুরেরা ছুটল গ্রেফতারের সংবাদ জানাতে। বিলভাসান থেকে কোনো চাষীর গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা এই প্রথম। সুতরাং চাষীদের মনে ঘটনাটির প্রতিক্রিয়া ঘটল সাংঘাতিকভাবে। এবার আর হাতের কাছে পাওয়া যা খুশি অস্ত্র নয়, প্রত্যেকের সংগ্রহে রামদা, সড়াঁক, তীরধনুক প্রভৃতি যে সব শাণিত অস্ত্র সযত্নে লুকানো ছিল, সেগুলো নিয়ে ছুটল সবাই।

দেখতে দেখতে একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী তৈরী হ'লো। ঢাল আর বল্লম-ধারী কয়েক শ' শক্তিশালী দক্ষ চাষী থাকল সকলের সামনে। পিছনে নানা অস্ত্র হাতে অন্য সবাই। জগেন আর রামপদকে নিয়ে যে রাস্তা দিয়ে পুলিশ থানায় ফিরে গেছে, সেই রাস্তা ধ'রে সবাই প্রাণপণে ছুটতে থাকল। বিলভাসান থেকে থানার দূরত্ব মাইল সাতেক। পুলিশের দল তখনো থানায় পৌঁছতে পারেনি। মাইলখানেক পথ তখনো বাকি। এমন সময় চাষীদের সেই সৈন্যবাহিনী নাগাল পেয়ে গেলো পুলিশ দলের।

খানিকটা দূরত্ব রেখে চাষীরা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল পুলিশদের। দুপুরের উজ্জ্বল সূর্যালোকে ওদের হাতের দীর্ঘ সড়াঁকির ফলাগুলো ঝকঝক ক'রে উঠল। সবাই এবার ঘন ঘন স্লোগান দিতে থাকল। পুলিশ দলের চারপাশের

চাষী-বাহিনীর বৃত্তটি ক্রমেই ছোটো হয়ে আসতে থাকল। পুলিশদের তখন সামনে বা পিছনে—কোনো দিকেই এগোনোর উপায় নেই। সশস্ত্র চাষী-বাহিনীর বিরাট ব্যূহের মধ্যে তখন তারা বন্দী। কনস্টেবলেরা গুলি চালানোর জন্য দারোগার অনুমতি চাইল। কিন্তু মেজ দারোগা সাবধানী লোক। চাষীদের এই অস্ত্রধারী বিশাল সেনা-বাহিনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে সামান্য ক'জন কনস্টেবল নিয়ে গুলি চালাতে যাওয়া যে নিতান্তই হঠকারিতা হবে, আজও তা তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলেন। সুতরাং গুলি চালানোর আদেশ না দিয়ে তিনি ঘটনার গতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন সতর্কভাবে। খাপের পিস্তলটি খুলে শক্তহাতে ট্রিগারে আঙুল রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হঠাৎই এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল ধনু পাগল। বিল-বাদাড় ভেঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র হাতে চাষীরা যখন ছুটছিল, তখন ধনুও তাদের সঙ্গ নিয়েছিল। পাগলের খেয়াল আর কী! ছুটতে ছুটতে সকলের সঙ্গে চলে এসেছে। ধনু এমনিতে পাগল হ'লে কী হবে! বেশ বলিষ্ঠ, গাট্টাগোট্টা চেহারা। ধনু হঠাৎ সামনের দিকে এগিয়ে এসে একজন চাষীর হাত থেকে এক ঝটকায় সড়্‌কি আর ঢাল কেড়ে নিলো। তারপর সেই ঢাল-সড়্‌কি বাগিয়ে ধ'রে বিকট শব্দে 'জয়-কালী, জয়-কালী' ব'লে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল দারোগার সামনে।

এই আকস্মিক ঘটনায় দারুণভাবে চমকে উঠলেন দারোগা। তাঁর হাতের পিস্তল থেকে ছিটকে গেলো পরপর দু'টি গুলী। কিন্তু দু'টি গুলীই ধনুর ঢালের উপর দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আকাশে উড়ে গেলো।

এ-রকম একটা ঘটনার জন্য চাষীরাও তৈরী ছিল না। তারাও প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল গুলীর শব্দে। কিন্তু পর মুহূর্তে চারিদিক থেকে তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু পুলিশকে আক্রমণ করল না। তাদের লক্ষ্য ছিল জগেন আর রামপদ। পুলিশের হাত থেকে ওদের দু'জনকে ছিনিয়ে নিয়ে সবাই পিছু হটতে লাগল দলবদ্ধভাবে। যে ক'জন কনস্টেবলের হাতে বন্দুক ছিল, তারা সবাই এবার একসঙ্গে বন্দুক উঁচু ক'রে তাক করল। কিন্তু মেজদারোগা হাতের ইশারায় তাদের নিরস্ত হতে বললেন। গুলী চলার আশঙ্কা চাষীদের মনেও ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে গোটা দলটাই যখন জগেন আর রামপদকে নিয়ে পুলিশের গুলীর আওতা থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে আসতে পারল, তখন সকলের বুকে সাহস ফিরে এলো। চারিদিক থেকে শ্লোগান উঠল—'ইন্‌কিলাব—জিন্দাবাদ।' হঠাৎই কে একজন শ্লোগান দিলো—'বাঁকপুরের বীর-কৃষক ধনুচাঁদ কি—'চারিদিক থেকে সহর্ষে সমস্বরে প্রতিধ্বনি উঠল—'জয়!'

ওদিকে ধনুচাঁদের তখন আর কোথাও পাত্তা নেই। হঠাৎ পাগ্‌লামিতে বিষম একটা কাণ্ড ঘটিয়ে আবার নিমেষের মধ্যেই মিশে গিয়েছিল দলবলের মধ্যে। তারপর কখন যে সকলের চোখ এড়িয়ে 'বোঁ-বোঁ'—করতে করতে আবার বাঁকপুরের দিকে ছুট্ মেরেছে,—তা কেউ টেরও পায়নি।

জগেন আর রামপদকে মাঝখানে রেখে চাষীদের বিজয়ী-বাহিনী শ্লোগান দিতে দিতে ফিরে এলো বিলভাসানে।

পুলিন অনন্ত বদন প্রভৃতি বিলভাসানের জোতদারেরা ঘটনার গতির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখছিল। পুলিশ এসে বারবার ফিরে যাচ্ছে, চাষীদের প্রতিরোধের মুখে প'ড়ে কাউকে গ্রেফতার করতে পারছে না, জগেন রামপদকে গ্রেফতার করার পরেও চাষীরা পুলিশের হাত থেকে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে এলো, এসব ঘটনায় বিষম সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল তারা। প্রতিরোধের মুখে পুলিশ কেন গুলী চালাচ্ছে না, এ প্রশ্ন ওদের মনে পুলিশের আচরণ সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করালো। তাদের ধারণা হ'লো, পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে ইচ্ছে ক'রেই। কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলেও তারা তো চুপচাপ ব'সে থাকতে পারে না। যেমন ক'রে হোক, চাষীদের সামনে বাধা সৃষ্টি করতে হবেই। নাহলে চাষীদের মধ্যে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ব'লে আর কিছুই থাকবে না।

মল্লিহাটির পুলিন রায়ের বাড়ীতে একদিন গভীর রাতে সভা বসল জোতদারদের। স্থানীয় হিন্দু জোতদারেরা সবাই তো উপস্থিত থাকলই, করিমপুরের খালেদ মিয়া এবং নুরহাটের ইব্রাহিম খাঁ-কেও খবর দিয়ে আনা হ'লো। যথারীতি ওদের আদর-আপ্যায়নাদির ব্যবস্থা হ'লো। খালেদ মিয়া এবং ইব্রাহিম খাঁ প্রথমে মনোযোগ দিয়ে এখানকার ইতিবৃত্ত সব শুনল।

পুলিশের কার্যকলাপের কথা শুনে খালেদ মিয়া বলল—'ভাইসায়েবরা, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, পুলিশ আপনাদের সাথে নেমকহারামি করিছে। পুলিশের ভরসায় ব'সে থাকা এখন আপনাদের আহাম্মকি ছাড়া আর কিছু না।'

পুলিন চিন্তিত মুখে বলল—'সে তো আমরাও বুঝতি পারতিছি ভাইসায়েব। কিন্তু আমাদের পথটা কী, সেইডাই তো বুঝতি পারতিছি না।'

ইব্রাহিম খাঁ এতক্ষণ একটা বালিশে হেলান দিয়ে সব কথা শুনছিল। এবার দীর্ঘ দেহটা সটান সোজা ক'রে ব'সে বলল—'পথ নিশ্চয়ই আমাদের বাত্‌লাতি হবে। তবে অবস্থা যা দেখতিছি, তাতে শুধু গা'র জোর খাটায়ে কাজ হবে না। পুলিশের কাছ থেকেও তেমন মদত পাওয়া যাচ্ছে না। এখন আমাদের কাজ হবে, নতুন কোনো ফিকির বার করা। সে ফিকিরের কথা আমি আপনাদের বল্‌তি রাজী আছি। তবে সে কাজে নামতি হবে সাবধানে। আপনারা আমরা মিলে-জুলে ভাইবেরাদর হয়ে যদি এ-কাজে নামতি পারি, তবেই ফল মেলবে।'

ইব্রাহিমের কথার জবাবে কেউ কিছু বলল না। কিন্তু সকলেই ওর ফিকিরটা জানার জন্য উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে থাকল ওর মুখের দিকে।

ইব্রাহিম সরু চোখে একবার চারিদিকে তাকিয়ে বলল—'এখানে যারা হাজির আছেন, সবাই বিশ্বাসী লোক তো?'

পুলিন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলে—'কোনো ভয় নেই খাঁ সায়েব। আপনার কথা আপনি নিশ্চিন্তে বলতি পারেন। সবাই আমরা নিজেদের লোক।'

—'ভয়? ওসব ভয়-ডরের কথা বলবেন না ভাইসায়েব। ইব্রাহিম খাঁ কোনো শয়তানের বান্দাকে ডর খায় না। আপনারা ফিকিরের কথা জানতি চাইছেন, সেটা যাতে কোনো আহাম্মক আদ্‌মীর কানে না যায়, সে জন্যিই কথাটা বলা।'

ইব্রাহিমের দম্ভোক্তিতে সকলে যেন একটু মনঃক্ষুণ্ণ হ'লো। কিন্তু তবু সবাই

ওর কথা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে।

ইব্রাহিম ওর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরকে সামান্য নামিয়ে বলল—'ভাইসায়েবরা, কথাটা শুন্যতি হয়ত খারাপ লাগবে, কিন্তু এখন আমাদের সামনে একটাই পথ।—তা হ'লো, হিন্দু-মোছলমান চাষাদের মধ্যি দাঙ্গা বাধানো। আমার ওখানকার কিছু বর্গাদার মোছলমান চাষা বড়োই বেয়াড়াপানা করতিছে। তারাও আজকাল তেভাগার আওয়াজ দেচ্ছে। তেভাগার রোগ এখন সব বর্গাদার চাষার মধ্যি ছড়ায়ে পড়িছে। দুই চারটে খুন জখম হয়ত আমি ক'রে দিতি পারি। কিন্তু তাতে কোনো ফল হবে না। বজ্জাতগুলোরে উপযুক্ত শিক্ষা দিতি হবে। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতি হবে।'

একটু থামল ইব্রাহিম খাঁ। সকলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ওর মুখের দিকে নিবদ্ধ হয়ে রইল।

ইব্রাহিম খাঁ আবার বলতে থাকে—'হ্যাঁ, যা বলতিছিলাম। এখন এসব রোগের দাওয়াই হচ্ছে, দাঙ্গা বাধায়ে দেয়া। ফিকির ক'রে হিন্দু চাষাদের পেছনে মোছলমান চাষাদের, আর মোছলমান চাষাদের পেছনে হিন্দু চাষাদের লাগায়ে দেয়া। দুশ্‌মনগুলো তাহলি নিজেরাই কাটাকাটি ক'রে মরবে।'

অনন্ত বিশ্বাস হঠাৎ বলে উঠল—'কাজটা কি অতো সোজা হবে খাঁ সায়েব? শয়তানগুলো এখন আর অতো সহজ সরল নেই।'

ইব্রাহিম খাঁ এক পলক তাকিয়ে থাকল অনন্তর দিকে। তারপর বাহারি নুরে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—'কাজটা যে সহজ নয়, সে আমি জানি অনন্ত-ভাই। কিন্তু কঠিন কাজ কীভাবে সহজ করতি হয়, তাও আমি জানি। আপনাদের মদত পা'লি এ-কাজ ঘটানো কিছু কঠিন নয়। এখন বলেন—আপনারা রাজী কিনা?'

এদের পক্ষে রাজী হওয়া ছাড়া আর কীই বা পথ আছে।

অতঃপর আরো ঘণ্টাখানেক ধ'রে চলল গোপন সলাপরামর্শ। এবং সেই আলোচনার ফলশ্রুতি হিসেবে পরপর এমন দু'টি ঘটনা ঘটল, যাতে এতদঞ্চলের গরীব হিন্দু মুসলমান চাষীদের জীবনে সৃষ্টি হ'লো এক ভয়ঙ্কর জটিলতা।

বিলভাসানের নিচু বিল অঞ্চলে পাঁচ ছয় বর্গমাইল জুড়ে চাষী তফসিলী হিন্দুদের গ্রাম। পশ্চিমে যশোহর সদরের এ-পাশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বাস। এদিকে উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরাও বাস করেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই চাষীর সংখ্যাও বিস্তর। বিলভাসানের বিল অঞ্চলের পূব দিকে নড়াইল অঞ্চলও এ-রকমই একটা মিশ্র এলাকা। ইব্রাহিম খাঁর বাড়ী এই নড়াইল অঞ্চলের নুরহাট গ্রামে। এখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তার জোতদারী রাজত্ব। এদিকের গ্রামগুলি অধিকাংশই মুসলমান চাষীদের। মাঝে মধ্যে দু'একটি গ্রাম শুধু হিন্দু চাষীদের। চাষীদের মধ্যে বেশীর ভাগই ইব্রাহিম খাঁর বর্গাদার। তেভাগার চেতনা এখানকার বর্গাচাষীদের মধ্যেও একটু একটু করে সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে। পুলিনের বাড়ী জোতদারদের মিটিং-এর পরবর্তী পর্যায়ের

প্রথম ঘটনাটি ঘটল এই অঞ্চলে।

পাশাপাশি দু'টি গ্রাম। মুসলমান চাষীদের একটি বৃহৎ গ্রামের সামান্য ব্যবধানে হিন্দু চাষীদের অপেক্ষাকৃত ছোটো একটা গ্রাম। ধর্মের ব্যবধান থাকলেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতি বজায় ছিল। পরস্পরের বাড়ীতে পালে-পার্বণে যোগদানেরও রেওয়াজ ছিল। কিন্তু এখানেই ঘটল একটা অঘটন। কিম্বা বলা যেতে পারে—ঘটানো হ'লো।

দুই গ্রামের মাঝখান দিয়ে একটা ছোটো খাল বয়ে গেছে। বর্ষাকালে খালে প্রচুর জল থাকলেও এখন ফাল্গুনের রোদে সামান্যই জল অবশিষ্ট আছে। জল যাই থাক না কেন, এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যেতে হ'লে খালের উপরকার সুদীর্ঘ বাঁশের সাঁকো পার হয়েই যেতে হয়। সেদিন সন্ধ্যে নাগাদ দেখা গেলো, মুসলমান চাষীদের গ্রাম থেকে আসা একটি অল্পবয়সী মুসলমান বউ কাঁধে একটা বোঁচকা নিয়ে সাঁকো পার হচ্ছে। বউটি যখন সাঁকোর মাঝামাঝি এসেছে, তখন উল্টোদিকের হিন্দু গ্রামের থেকে একজন হিন্দু যুবক তড়বড় ক'রে উঠে এলো সাঁকোর উপর। যুবকটি এগিয়ে এসেই একটা হাত টেনে ধরল মুসলমান বউটির। সঙ্গে সঙ্গে বউটি 'বাঁচাও—বাঁচাও' ব'লে চিৎকার জুড়ে দিলো। যুবকটি তৎক্ষণাৎ উল্টোদিকে ফিরে সাঁকোর উপর থেকে একছুটে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলো হিন্দু-গ্রামের মধ্যে।

সাঁকোর এ-পাশে সব তৈরীই ছিল। বউটির চীৎকার শোনামাত্র দশ বারোজন মুসলমান চাষী তাড়াতাড়ি ছুটে এলো লাঠি-সোটা নিয়ে। বউটি তাদের কাছে অকপটে যা জানাল, তা হ'লো, সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে ঐ হিন্দু ছোকরাটি তার ইজ্জত নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। সবাই তখন বউটিকে নিয়ে হাজির হ'লো এ অঞ্চলের মাথা ইব্রাহিম খাঁর বৈঠকখানায়। ইব্রাহিম খাঁ সন্ধ্যার নামাজ সেরে বৈঠকখানার ফরাশে বসে গুড়গুড়ি টানছিল। কিছুই না জানার ভান ক'রে ইব্রাহিম সকলের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘটনার বৃত্তান্ত জানবার ভান করল। বউটিকেও জিজ্ঞাসাবাদ করল। বউটি এবারও হিন্দু যুবকের দ্বারা তার শ্লীলতাহানির চেষ্টার কথা সকলকে শোনাল সাড়ম্বরে।

ঘটনাটা তখন লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে সারা গ্রামে। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ ঘোর হয়ে এসেছে। কিন্তু তার মধ্যেই দলে দলে মুসলমান চাষীরা এসে ইব্রাহিমের বৈঠকখানায় সমবেত হতে লাগল।

ইব্রাহিম সকলের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—'কাফেরের এত বড়ো আস্পর্ধা, মোছলমানের মেয়ের গায়ে হাত তোলে! মোছলমানের গায়ে কি রক্ত নেই? না, সব ভেড়ার বাচ্চা ব'নে গেছে?'

ইব্রাহিমের আশেপাশে যারা সমবেত হয়েছিল, তারা সকলেই গরীব মুসলমান চাষী। অত্যাচারী ধনী জোতদার ইব্রাহিমকে সকলেই মনে মনে ঘৃণা করে। কিন্তু এখন ইব্রাহিমের উত্তেজক কথাবার্তায় সকলের সাম্প্রদায়িক চেতনায় সুড়সুড়ি লাগল। এগিয়ে এলো দশ বারোজন বলিষ্ঠ চাষী। ইব্রাহিমের পাশে দাঁড়িয়ে সেলাম জানিয়ে বলল—'আপনি মালেক, হুকুম দ্যান্ কি করতি হবে।'

ইব্রাহিম বুঝল, ওষুধ ধরেছে। যারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, হাতের ইশারায় তাদেরও কাছে ডাকল। সকলেই কাছে এগিয়ে এলো।

ইব্রাহিম কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে বলল—'তোরা সব অস্ত্র-পাতি নিয়ে তৈরী হ'। দু'একদিনের মধ্যিই কাফেরটার গ্রাম লুঠ করতি হবে। কাফেরটারও জান শেষ করতি হবে। আর মনে রাখিস, এখানেই শেষ নয়। কাফেরগুলোকে এবার সব ঠাণ্ডা করতি হবে। বিলভাসানে কাফেরগুলোর একটা বড়ো ঘাঁটি। ওগুলোরেও এবার খতম করতি হবে।'

সকলের মনে আগুন ধরিয়ে দিলো ইব্রাহিম। দরিদ্র সরল অজ্ঞ মুসলমান চাষীদের চোখে মুখে এক ভয়ঙ্কর হিংসার প্রস্তুতি ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলতে থাকে।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল বিলভাসানে। বিলভাসানের গ্রামগুলোতে একটা ধর্মষাঁড় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কোনো ধর্মস্থানে স্বাস্থ্যবান সুলক্ষণযুক্ত একটি তরুণ ষাঁড়কে উৎসর্গ করা হয়। তখন সে ষাঁড়টির নাম হয়ে যায়—'ধর্মষাঁড়'। ধর্মষাঁড় হিন্দুদের কাছে পবিত্রতার প্রতীক বলে চিহ্নিত। গ্রামে গ্রামে সেটি যদৃচ্ছা ঘুরে বেড়ায়। কারো কোনো ক্ষতি করলেও কেউ কিছু বলে না। বরং অনেকেই আদর ক'রে তাকে ভাত, ডাল, ভাতের ফেন, তরকারীর খোসা ইত্যাদি খেতে দেয়। বিল-ভাসানের গ্রামগুলোতেও এমনই একটা বিশাল ধর্মষাঁড় দীর্ঘদিন ধ'রে বিচরণ ক'রে বেড়াত। হঠাৎই একদিন ধর্মষাঁড়টি নিখোঁজ হয়ে গেলো। চারিদিকে শুরু হ'লো খোঁজাখুঁজি। এমন সময় সংবাদ রটে গেলো, নুরহাটের মুসলমানেরা ধর্মষাঁড়টাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে জবাই ক'রে খেয়ে ফেলেছে।

এ-সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো, বিলভাসানের জোতদারেরা অতি-মাত্রায় ধর্ম-প্রাণ হয়ে উঠেছে। ধর্মষাঁড় নিধন-জনিত পাপের জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ণ ইত্যাদি শুরু ক'রে দিলো। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তারা এত বড়ো অন্যায় মুখ বুজে সহ্য না ক'রে এর প্রতিশোধ নেবার জন্য হিন্দু চাষীদের তাতিয়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। একদিন দেখা গেলো, বেশ কয়েকজন ষণ্ডা-মার্কা লোক রাস্তায় রাস্তায় জিগির দিয়ে বেড়াচ্ছে—'ধর্মষাঁড় মারার বদ্‌লা চাই—মোছলমানের রক্ত চাই।'—বলা বাহুল্য, এরা সকলে বিলভাসানের জোতদারদের পোষা লোক।

বিলভাসানের চাষীরা প্রথম দিকে এ-সব কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে কিছু লোকের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে শুরু করল। সরল অজ্ঞ চাষী-বাসী মানুষ সবাই। মনের ভিতরে সব সময়েই একটা ধর্মভয় সক্রিয় থাকে। ধর্মষাঁড় অপহরণ এবং তার জবাই-এর ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মনের মধ্যে একটা বিক্ষোভ জমা হয়েছিল। জোতদারদের প্ররোচনায় সে বিক্ষোভ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংস সংঘর্ষে লিপ্ত হবার পথ খুঁজতে লাগল।

হঠাৎ উদ্ভূত এই সমস্যার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন সত্যপ্রসাদ। অবস্থা যখন ক্রমেই চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে যেতে থাকল, তখন সত্যপ্রসাদ একদিন সন্ধ্যেবেলায় বিলভাসানের চাষীদের নিয়ে বাঁকপুরের বটতলায় সভা ডাকলেন। সত্যপ্রসাদ চাষীদের অনুরোধ জানালেন, ধর্মষাঁড়ের ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে অনর্থক

উত্তেজিত না হতে। কারণ, সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল শুরু হলে চাষীদের তেভাগা আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

উপস্থিত চাষীদের মধ্যে অধিকাংশই সত্যপ্রসাদের বক্তব্যকে সমর্থন করল। কিন্তু বেশ কয়েকজন আবার বিরুদ্ধতাও করল। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'কিন্তু তাই ব'লে আমাদের জাত-ধম্মো ব'লে কিছু থাকবে না ? সব মুখ বুজে মান্‌তি হবে ?'

বেশ একটু উত্তেজনার মধ্যে সেদিন সভা শেষ হ'লো। এবং অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে, যে-কোনোদিন যে-কোনো মুহূর্তে এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষের মধ্যেই ইন্ধন যোগাবার লোকের অভাব ঘটল না।

সত্যপ্রসাদ প্রমাদ গনলেন। গত ১৯৪৬-এ কলকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে কী ভয়ানক রূপ ধারণ করেছিল, বিলভাসানে থেকেও সে সব সংবাদ কানে এসেছিল তাঁর। কিন্তু যশোহর জেলার এই অঞ্চলটায় কখনো কোনো সাম্প্রদায়িক তিক্ততা দেখা দেয়নি। কিন্তু অবস্থা যেভাবে গড়াচ্ছে তাতে এবারে আর এই তিক্ততাকে এড়ানো যাবে ব'লে মনে হয় না। এই বিস্তীর্ণ চাষী-অধ্যুষিত এলাকায় একবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হ'লে তার পরিণাম যে কী দাঁড়াবে, তা ভেবে মনে মনে শিউরে উঠলেন সত্যপ্রসাদ।

॥ একুশ ॥

এ-রকম একটি উত্তাল পরিস্থিতিতে বিলভাসানে এসে হাজির হলেন কাদের সায়েব, হক সায়েব, নুটু মিত্র, নিখিল রায় এবং রসিক বিশ্বাস। এঁরা এতদিন রংপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলায় তেভাগা-আন্দোলনের নেতৃত্বের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ওখানে থাকতে থাকতেই উড়ো-ভাসা সংবাদে যশোহরের এই অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কথা তাঁদের কানে পৌঁছেছিল। সংবাদটিকে তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিণাম সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন তাঁরাও। এবং অঙ্কুরেই একে বিনষ্ট করার সমূহ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ফলে ওঁরা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছেন বিলভাসানে। সত্যপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেন। রাত্রে কৈলাসের বাড়ীতে জরুরী বৈঠক বসল। বিলভাসানের সব গ্রামের কৃষকসমিতির বিশিষ্ট কৃষক কর্মীদের খবর দেওয়া হ'লো। যতীনও উপস্থিত থাকল। দাঙ্গা-প্রতিরোধের বিষয়টিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাল সবাই।

সভায় স্থির হ'লো, মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিতে মুসলমান নেতারা এবং হিন্দু-প্রধান অঞ্চলগুলিতে হিন্দু নেতারা চাষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাদের অনুরোধ জানাবেন দাঙ্গা থেকে নিরস্ত হবার জন্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে এ-ছাড়া

আর কোনো উপায় নেই।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন ভোরেই কাদের সায়েব এবং হক সায়েব চলে গেলেন নুরহাট অঞ্চলে। কৃষকসভার আরো কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান নেতাকেও ওখানে আসার জন্য সংবাদ পাঠানো হ'লো। নুটু মিত্র, নিখিল রায়, রসিক বিশ্বাস এবং সত্যপ্রসাদও বিলভাসানের গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচারকার্যে নেমে পড়লেন। যতীনও সারাক্ষণ নেতাদের সঙ্গে থাকল ছায়ার মতো। বিলভাসানের চাষীরা তাদের এ অঞ্চলের একমাত্র উচ্চশিক্ষিত এই ভদ্র বিনয়ী ছেলেটিকে মনেপ্রাণে সকলেই অত্যন্ত ভালবাসে। এঁদের সমবেত উপস্থিতিতে এবং সনির্বন্ধ আবেদনে যথেষ্ট সুফল দেখা দিলো।

নুরহাট অঞ্চলে মুসলমান নেতারাও যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করলেন। ওখানেও কৃষক-সমিতির কিছু কিছু মুসলমান কর্মী ছিল। তাদের নিয়ে নেতারা সফর করে বেড়ালেন গ্রামে গ্রামে। দাঙ্গার কুফল সম্পর্কে মুসলমান চাষীদের অবহিত করার চেষ্টা করলেন। এইভাবে সকলের সমবেত উদ্যোগে সমগ্র অঞ্চলটি থেকেই সপ্তাহখানেকের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টির উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হয়ে এলো।

অতঃপর কৃষকসভার নেতারা তুলোরামপুর হাটের পাশের বিশাল মাঠটায় হিন্দু-মুসলমান চাষীদের এক সভা আহ্বান করলেন। বিস্তর লোক-সমাগম ঘটল সভায়। উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা চাষীদের কাছে দাঙ্গার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে ভাষণ দিলেন। পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য অনুরোধ জানালেন। সভায় সেই হিন্দু যুবক এবং মুসলমান বউটিকেও আনা হ'লো। রসিক বিশ্বাস যশোহর কোর্টের ঝানু উকিল। তিনি তাদের জেরা করা শুরু করলেন। জেরার মুখে সব স্বীকার করতে বাধ্য হ'লো তারা। গোটা ব্যাপারটাই যে একটা সাজানো কেস, তা বুঝতে বাকি রইল না কারো। এবং এ-সব কিছুর পিছনে যে কলকাঠি নাড়ছে কুচক্রী জোতদার ইব্রাহিম খাঁ, এটাও উভয় সম্প্রদায়ের চাষী জনসাধারণ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারল। বিলভাসানের যে ধর্মষাঁড়টি নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, সেটিকেও পাওয়া গেলো নুরহাটের খোঁয়াড়ে। ফলে, দাঙ্গার উত্তেজনা যেমন জ্বলে উঠেছিল দাউ দাউ ক'রে, তেমনিভাবেই আবার তা শান্ত হয়ে এলো।

বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ-ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল।

চাষীদের জব্দ করতে জোতদারদের এ-প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হ'লো। উপায়ান্তর না দেখে বিলভাসানের জোতদাররা আবার সলা-পরামর্শয় বসল। ধান লুটের অভি-যোগ এনে বিলভাসানের কৃষক-সমিতির কয়েকজন বিশিষ্ট বর্গা-চাষীর নামে ১০৭ ধারার মামলা রুজু করল যশোহর কোর্টে। জোতদারদের ধারণা হ'লো, মামলায় জড়াতে পারলেই চাষীদের জব্দ করা যাবে। বিলভাসানের গ্রামগুলিতে গ্রেফ্তারী পরোয়ানা নিয়ে নতুন ক'রে শুরু হলো পুলিশের উপদ্রব। যাদের নামে গ্রেফ্তারী পরোয়ানার খবর পাওয়া গেলো, তারা সবাই এবার কিছুটা গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াতে লাগল। সত্যপ্রসাদ এবং ফুলির নামেও কেস উঠেছে। ফলে তাদেরও চলাফেরায় কিছুটা গোপনতার আশ্রয় নিতে হ'লো।

শোবার ঘরের দক্ষিণ পাশের বড়ো নিমগাছটার তলায় চৌকি পেতে ব'সে ছিল কৈলাস। কিছুদিন থেকে একটা কাশির অসুখ হয়েছে। ফলে শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না কৈলাসের। শরীর মনের সেই প্রফুল্ল ভাবটা যেন আর নেই। গরমে অস্থির লাগছে শরীরটা। বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি এখন। বেলাটা একটু চড়তে না চড়তেই রোদের তাপ গন্‌গনে হয়ে উঠেছে। কৈলাসকে চুপচাপ ব'সে থাকতে দেখে কৈলাস-গিন্নি পাশে এসে দাঁড়াল।

—'আজ শরীলডা কি এট্টু ভালো বোধ করতিছো ?'

কৈলাস উদাস গলায় বলে—'ঐ চল্‌তিছে এক রকম।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ নিঃশব্দে কেটে যায়। নিমগাছের পাতায় পাতায় ঝির-ঝিরে কাঁপন লাগে। বাতাসে নিমফুলের হালকা মৃদু সুবাস।

কৈলাস আস্তে আস্তে বলে—'বুঝলে নবীনের মা, মনে বড়ো ইচ্ছে ছিলো, এই ফাল্গুন-চত্তিরেই কাজখানা সা'রে ফেলবো। জলধর আর চাঁপার হাত দুইখানা এক ক'রে দিতি পার্‌লি মনে বড়ো শান্তি পাতাম। কিন্তু কী যে ডামাডোলের বাজার পড়লো দ্যাশে। মান্‌ষির সাধ-আহ্লাদ মিটেনোর আর কোনো উপায় থাকলো না। দুই দণ্ড কারো থির হয়ে তিষ্ঠোনোর জো নেই, মান্‌ষির হাউশ-সাধ মেটাবে কি ক'রে—। আমারও যেন রৎ-বল প'ড়ে আস্‌তিছে।'

একটানা কিছুক্ষণ কথা ব'লে কৈলাস কাশতে থাকে। নবীনের মা বলে—'এসব নিয়ে তুমি এ্যাতো ভাব্‌তিছো ক্যানো ? তোমার নবীন সতীশ বড়ো হইচে। ওরা তো তোমার পাশে আছেই। আর জলধরও তো আমাদের ঘরের ছেলেই। সেতো আর পলায়ে যাচ্ছে না। সময়-সুযোগ বুঝে কাজ করবা। এ নিয়ে এ্যাতো ভাবনা-চিন্তের কি হলো।'

কৈলাস হাত উল্‌টে হতাশ গলায় বলে—'আর সময়-সুযোগ।'—

এমন সময় ওদের পাশে এসে দাঁড়ান সত্যপ্রসাদ। পরনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ধুতি জামা। কাঁধে একটা কাপড়ের ঝোলানো থলি। কৈলাসকে উদ্দেশ ক'রে বলেন—

'আমি একটু চললাম কৈলাস।'

কৈলাস জিজ্ঞাসু চোখে সত্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকায়।

সত্যপ্রসাদ একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলেন—'গতকাল মা'র একটা চিঠি পেয়েছি। বাবা নাকি খুব অসুস্থ। যশোরের বাসা-বাড়ীতে দাদার কাছে রয়েছেন। মা বারবার ক'রে লিখেছেন, আমি যেন একবার গিয়ে বাবাকে দেখে আসি। বাবার শরীরের অবস্থা নাকি ভালো নয়। এরপর আর দেখা নাও হতে পারে।'

চৌকি থেকে উঠে দাঁড়াল কৈলাস। উদ্বিগ্ন গলায় বলল—'বলেন কি ছোটোবাবু, আপনি এই সময় একা একা যশোরে যাবেন ? আপনার নামে যশোর কোর্টে কেস রইছে। বিপদ হতি কতক্ষণ।'

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধরা গলায় আবার বলে—'কত্তা-মশায়ের এতবড়ো অসুখ, আপনার না যাওয়াডাও তো ভালো দেখায় না। কিন্তু আমার মনডা ক্যানো য্যানো আপনার এ যাওয়াতে সায় দেচ্ছে না।'

সত্যপ্রসাদ সংক্ষেপে জবাব দিলেন—'কিন্তু আমার না গিয়ে উপায় নেই কৈলাস। আমাকে যেতে হবেই। তোমরা সব সাবধানে থেকো। চলি।'—

দীর্ঘ পদ-বিক্ষেপে সত্যপ্রসাদ ভিটে থেকে নেমে এলেন রাস্তায়। তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। যতক্ষণ তাঁকে দেখা গেলো, অপলকে তাকিয়ে থাকল কৈলাস। বুকটার মধ্যে কেমন যেন হুহু করতে লাগল। সত্যপ্রসাদ তাদের থেকে অনেকখানি সম্মানিত ব্যবধানের মানুষ। কিন্তু ছেলেটা এই দু' বছরে কেমন যেন বড়ো আপন হয়ে গেছে। তার বড়ো ছেলে নবীনের থেকে কতোই বা আর বড়ো হবে সত্যপ্রসাদ!

বিষণ্ণতার একটা গাঢ় প্রলেপ ভারী ক'রে তোলে কৈলাসের মনটাকে।

এদিকে পুলিশের আক্রমণ দিনে দিনে তীব্র হয়ে ওঠে। যাদের নামে গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা রয়েছে, তাদের সন্ধানে পুলিশ মাঝেমাঝেই বিলভাসানের গ্রামে হানা দিতে লাগল। পুলিশের আচরণ ক্রমেই হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে। প্রথমদিকে পুলিশ সাধারণতঃ কারো বাড়ীতে উঠত না। কিন্তু এখন একটু একটু ক'রে অভিযুক্ত চাষীদের বাড়ীতে খানাতল্লাশী করতে শুরু করল। চাষীদের মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য পুলিশ হাতের কাছে যাকে পায়, তার পিঠে দু'চার ঘা মারতেও কসুর করে না। চাষীদের সংঘবদ্ধতা এবং দৃঢ়তাতেও চিড় ধরতে লাগল একটু একটু ক'রে। পুলিশের আগমন-সংবাদে এখন আর সবাই প্রতিরোধের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠতে ভরসা পায় না। বরং আত্মগোপনের পথ খোঁজে।

চাষীদের এই দুর্বলতার সুযোগে কয়েক দিনের মধ্যেই বিলভাসানের বিভিন্ন গ্রাম থেকে গ্রেফ্‌তার হয়ে গেলো বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত চাষী। বিলভাসানের রাস্তা দিয়ে পুলিশ তাদের হাতকড়া পরিয়ে প্রচণ্ড প্রহার দিতে দিতে টেনে নিয়ে গেলো থানায়। সেখান থেকে বিনা বিচারে চালান দিলো জেল-হাজতে। বিলভাসানের কৃষকদের তেভাগা-আন্দোলন প্রচণ্ড বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'লো।

এরই মধ্যে এলো আর এক নিদারুণ দুঃসংবাদ। পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন সত্যপ্রসাদ। অসুস্থ বাবাকে দেখতে যশোহর টাউনে গিয়েছিলেন। পুলিশ সেখানে তাঁর সন্ধান পায়। বিলভাসানে ফিরে আসার সময় যশোহর স্টেশনে পুলিশ তাঁকে গ্রেফ্‌তার করে। জামিনের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু জামিন মঞ্জুর হয়নি। রাজসাহী জেলে চালান দেওয়া হয়েছে সত্যপ্রসাদকে।

ক্ষোভে দুঃখে ক্রোধে হতাশায় বিলভাসানের চাষীদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। পুলিশের মারমুখী আক্রমণের মুখে তাদের আন্দোলন আর তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারল না। কিন্তু ওরই মধ্যে তারা যথাসম্ভব কাজ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। মাঝে মাঝে নেতারা রাতের দিকে পালিয়ে এসে সভা করেন। সভা-শেষে চাষীরা সতর্ক প্রহরায় আবার তাঁদের সরিয়ে দেয় নিরাপদ এলাকায়। পুলিশের ধর-পাকড় চলতেই থাকল। ওরই মধ্যে চলতে লাগল চাষীদের চাষ আবাদের কাজও। এখন বৈশাখ মাস। চাষ-আবাদের সময়। মাঝে মাঝেই পর্যাপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে। ক্ষেতে 'জো' এসেছে। এখন তো আর চাষের কাজে ঢিলেমি দেওয়া যায়

না। সব থেকে বড়ো কথা, কোনো বর্গাচাষীই তার বর্গাচাষের জমির দখল ছাড়ল না। জোতদারদের হুমিতম্বি শাসানির মধ্যেও তারা দল বেঁধে নিজ নিজ অধিকারের বর্গাজমিতে চাষ দিলো। বীজ ছড়াল।

এইসব নানা টানা-পোড়েন, বিপর্যয় আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিলভাসানের দিনরাতগুলো গড়িয়ে যেতে থাকল। তারপর এলো ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসের অন্যতম শুভদিন। দু'শ বছরের পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেলো ভারতবর্ষ। সারা দেশ জুড়ে উল্লাস আর আনন্দের বন্যা বয়ে চলল। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে নেমে এলো দেশ-বিভাগের অভিশাপ। অখণ্ড বাংলা হ'লো খণ্ডিত। পূর্ব বাংলা পড়ল পাকিস্তানের অধিকারে।

বিলভাসানের চাষীরাও শুনল স্বাধীনতা-লাভের সংবাদ। তারাও নিশ্চয়ই আনন্দ বোধ করল। কিন্তু এ-ঘটনার রাজনৈতিক গুরুত্ব কতখানি, তা উপলব্ধি করার মতো চেতনা তাদের ছিল না। সত্যপ্রসাদ বিলভাসানে থাকলে হয়ত চাষীদের কাছে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কিন্তু বিলভাসানের চাষীরা দেশের স্বাধীনতা-লাভে যতখানি আনন্দিত হ'লো, তার চেয়েও অনেক বেশী আতঙ্কিত হ'লো, তাদের যশোহর জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে। পাকিস্তান মানে—মুসলমানের রাজত্ব। এখানে কি আর তারা জাত-ধর্ম বজায় রেখে বাস করতে পারবে? এ-জাতীয় চিন্তা তাদের মনে কাঁটার মতো বিঁধতে থাকল।

তবে, যাই হোক না কেন, দেশের স্বাধীনতা-লাভকে কেন্দ্র ক'রে তাদের কিছু আশু উপকারও ঘটল। এবং তাতেই তারা সত্যিকারের উল্লাস বোধ করল। সারা দেশ জুড়ে স্বাধীনতা-লাভের আনন্দ-উৎসব পালনের অঙ্গ হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলে যে-সব বিচারাধীন বন্দী ছিল, তাদের মুক্তি দেওয়া হ'লো। বিলভাসানের বেশ কিছু চাষী জেল-হাজতে আটকে ছিল। তারা মুক্তি পেয়ে ফিরে আসতে লাগল একে একে। রাজসাহী জেল থেকে একদিন ফিরে এলেন সত্যপ্রসাদও। বিলভাসানের চাষীদের কাছে এর থেকে উল্লাসের আর কী থাকতে পারে! সকলের মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেলো।

এই আনন্দকে পরিপূর্ণ ক'রে তোলার জন্য ফুলির মহিলা-সমিতি চড়ুইভাতির আয়োজন করল। হৈ চৈ ক'রে চারিদিক একেবারে মাতিয়ে তুলল ফুলি। সত্যপ্রসাদ তো বটেই, আরো যে-সব চাষী এতদিন হাজতে বন্দী ছিল, সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হ'লো চড়ুইভাতিতে। ফুলমতি, বিনতা, সরমা, সৌরভী—সবাই খুব খাটল। চাল কুটে পিঠে পায়স তৈরী করা হ'লো। হাঁসের মাংসের ব্যবস্থা হ'লো। অঢেল খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-ফূর্তি চলল। নানারকম গল্প-গুজব ও চলল। তার মধ্যে জেল-হাজতের গল্পই বেশী।

সব থেকে বেশী জমল সনাতনের গল্পটা। ওদের সবাইকে ধ'রে নিয়ে প্রথম-দিন হাজত-ঘরের বারান্দায় ফেলে রাখা হয়েছিল। সারারাত এবং তার পরদিন বিকেল পর্যন্ত কাউকে কিছু খেতে দেওয়া হয়নি। ক্ষিদেয় সকলের পেট চুঁই চুঁই করছিল। বিকেলের দিকে দারোগা এসে সিপাইদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'এদের সবাইকে ধোলাই দেওয়া হয়েছে তো?'—সনাতন একটু বোকা-সোকা মানুষ।

ভেবেছিল, 'ধোলাই' বোধহয় কোনো খাবার-দাবারের নাম। চিমসে পেটটায় হাত বোলাতে বোলাতে তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলেছিল—'না বাবু, আমরা তো ধোলাই পাইনি।'—দারোগা সনাতনের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে চলে গিয়েছিলেন। একটু পরেই সিপাইরা সকলকে ধোলাই দিয়েছিল আচ্ছা ক'রে। অভুক্ত পেটে সিপাইদের সেই ডাণ্ডার বাড়ি কারো কাছেই উপাদেয় মনে হয়নি। এখন সনাতনের সেই গল্প জুড়ে সবাই সনাতনকে ক্ষেপাতে লাগল।

সৌরভী সারাক্ষণ সত্যপ্রসাদের পাশে থেকে তাঁর খাওয়া-দাওয়া, সেবা-যত্নের দিকে নজর রাখল। সত্যপ্রসাদ প্রথম দিকে একটু সঙ্কোচ বোধ করছিলেন; কিন্তু সৌরভীর স্নিগ্ধ সংযত আচরণে সত্যপ্রসাদের সঙ্কোচ কেটে যেতে দেরি হ'লো না। সৌরভীর সঙ্গেও আজ তিনি মন খুলে হেসে কথা বললেন।

সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত বেশ গভীর হ'লো। সৌরভীকে একা পেয়ে সরমা তার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে এলো একপাশে। আজ সারাদিন ধ'রে সৌরভী সত্যপ্রসাদের পাশে পাশে ঘুরছে, প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবা-যত্ন করছে, এটা চোখ এড়ায়নি সরমার। সরমা হেসে বলল—'কি রে মুখপুড়ী, মনের সাধ মিটিছে তোর আজ?'

সৌরভীর চোখ ছাপিয়ে জল এলো। নিমেষে চোখের জল মুছে একগাল হেসে সরমার কাঁধে মাথা রেখে বলল—'তুমি তো সব জানোই বৌদি! তয় আর মিছেমিছি লজ্জা দ্যাও ক্যানো!'—

'কৃষক-সভা'র নেতারা ভেবেছিলেন, দেশ স্বাধীন হ'লে স্বাধীন দেশের সরকার নিশ্চয়ই কৃষকদের কথা চিন্তা করবেন। কৃষকদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই তেভাগা চালু হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো, সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। তেভাগা তো চালু হ'লোই না, বরং সরকারের জোতদার-তোষণনীতি অব্যাহত রইল।

স্বাধীনতার এ-ফাঁকি দেখে বামপন্থী নেতারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁরা আওয়াজ তুললেন—'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়।'—ফলে নতুন ক'রে আবার শুরু হ'লো ধর-পাকড়। স্বাধীন সরকারের জেলখানা ভরে উঠতে লাগল নতুন কয়েদীতে। পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারও কঠোর হাতে দমন উৎপীড়নের নীতি গ্রহণ করলেন। কৃষক সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি শ্রেণী-সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা গৃহীত হ'লো। যে-সব অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে তেভাগা-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেখানে সরকারের বিষ-দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হতে লাগল। ফলে বিলভাসানের আকাশেও আবার নতুন ক'রে ঘনিয়ে উঠতে লাগল দুর্যোগের কালো মেঘ।

আশ্বিন মাসে প্রবল বন্যা হ'লো বিলভাসানে। জলা জায়গা। প্রত্যেক বছরই এ-সময় এখানে জল জমে। কিন্তু এ-বছর জলের তোড় খুব বেশী। চারিদিক একেবারে জলে জলময় হয়ে গেলো। শুধু ভিটে বাড়ীগুলো জেগে রইল কোনোমতে। বিলের নিচের দিকে কারো কারো আবার ভিটেতেও জল উঠে গেলো। বাড়ীঘরদোর ছেড়ে তারা আশ্রয় নিলো বাঁকপুরের স্কুল বাড়ীতে।

এদিকে বিলভাসানে বড়ো বড়ো টাবুরে নৌকা ক'রে মাঝে মাঝেই পুলিশের আগমন ঘটতে লাগল। শোনা গেলো, বিলভাসান অঞ্চল যে থানার অধীন, সেখানকার বড়ো দারোগা বদলি হয়ে গেছেন। নতুন যিনি বড়ো দারোগা হয়ে এসেছেন, তিনি অবাঙালী মুসলমান। দুর্ধর্ষ প্রকৃতির জন্য তিনি বিখ্যাত। পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের উপর কঠোর পীড়ন-নীতির কৃতিত্বের জন্য তিনি বিভাগীয় প্রশংসা পেয়েছিলেন। এখন তিনিই এখানকার থানার অধীশ্বর। বড়ো দারোগা স্বয়ং পুলিশ-বাহিনী নিয়ে মাঝে মাঝেই নৌকা ক'রে বিলভাসানের গ্রামগুলির মধ্যে টহল দিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

বিলভাসানের কৃষক-সমিতির কাজও এগিয়ে চলল এরই মধ্য দিয়ে। সংগঠনের কাজকে আরো শক্তিশালী করার জন্য চাষীরা বদ্ধ-পরিকর হয়ে উঠল। মাঝে মাঝেই নেতারা আসেন। সংগোপনে বৈঠক করেন। দু' একদিন থেকেই আবার চলে যান। জোতদারদের জমিতে বর্গাচাষীরা যে আউশ ধান ও পাট ফলিয়েছিল, বর্ষার মুখে এবারও তা চাষীরা অধিকাংশই কেটে নিয়েছিল এবং তেভাগা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দু' একটি ক্ষেত্রে অবশ্য জোতদারেরা লেঠেলপাইক লাগিয়ে ফসল কেটে নিতে সমর্থ হয়েছিল।

আসন্ন আমন ধান কাটার মুখে কৃষক-সমিতির সংগঠন যাতে শক্তিশালী ভূমিকা নিয়ে আমন ধান কেটে তুলে তেভাগার দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, এটাই এখন বিলভাসানের চাষীদের একমাত্র লক্ষ্য। জোতদারেরাও এবার অনেক বেশী তৎপর। আগে থাকতেই এবার তারা শক্তিবৃদ্ধির দিকে মনোযোগী হ'লো। পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখল। নিজেদের নিরাপত্তার আবেদন নিয়ে বড়ো দারোগার কাছে ধরনা দিতে শুরু করল নিয়মিত। বিলভাসানে কৃষকসভার যে সব নেতা সভা করতে আসেন, চাষীদের উৎসাহিত করেন, তাঁদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগল জোতদাররা। সরকার-বিরোধী আওয়াজ তোলার জন্য মুসলিম লীগ সরকারও বামপন্থী নেতাদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেন। তাঁদের ধ'রে জেলে না পোরা পর্যন্ত সরকারের স্বস্তি রইল না।

বিলভাসানের সত্যপ্রসাদ এবং ফুলি সিঙ্গিকে গ্রেফতার করার জন্য আবার ওয়ারেণ্ট বের হ'লো।

॥ বাইশ ॥

পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পড়তে অল্পের জন্য একদিন বেঁচে গেলো ফুলি। এই ঘটনায় পুলিশ মহলে তার সম্পর্কে প্রচণ্ড বিস্ময় এবং কৌতূহল সৃষ্টি হ'লো। ফুলির শক্তি, সাহস এবং নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতার কথা পুলিশ মহলে আগেও যথেষ্ট প্রচারিত ছিল। গত বছর ফুলি তার নারী-বাহিনীকে নিয়ে নৌকা-সমেত তৎকালীন বড়ো দারোগাকে টেনে তুলেছিল ডাঙায়। সে ঘটনা পুলিশ আজো ভোলেনি।

ফুলির এবারের পুলিশের চোখে ধুলো দেবার ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে পুলিশ-মহলে তার অপরিসীম শক্তি সম্পর্কে আরো বেশী বিস্ময় সৃষ্টি হ'লো। নানা কাল্পনিক কাহিনীরও উৎপত্তি ঘটল ফুলির নামে।

কিছুদিন থেকে ফুলিকেও একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হচ্ছিল। এমনিতে অবশ্য কোনো বাধা-নিষেধ মেনে চলার পাত্রী সে নয়। ডানা-মেলা পাখির মতোই তার গতিবিধি। কিন্তু অকারণে পুলিশের হাতে ধরা পড়াও তো কোনো কাজের কথা নয়। সেজন্যই ফুলি এখন কিছুটা সতর্ক হয়ে চলাফেরা করে। বিশেষতঃ, তার নামে যখন আবার নতুন ক'রে গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। পুলিশের আগমন সংবাদ টের পেলেই ফুলি নিজেকে কোথাও লুকিয়ে ফেলে সংগোপনে। পুলিশ চলে যাবার পরই আবার বেরিয়ে এসে কাজকর্ম শুরু ক'রে দেয়।

আশ্বিনের অর্ধেক পার হয়ে গেলো। কিন্তু বিলভাসানের বন্যার জলে এখনো টান ধরেনি। সারা তল্লাটটা থই থই করছে জলে। ভিটে-বাড়ীগুলো শুধু জেগে আছে জলের পরে। পর পর সাত আট দিন বিলভাসানে পুলিশের আগমন ঘটেনি। ফলে লোকজন একটু নিশ্চিন্ত। ফুলির কতকগুলো দরকারী কাজ বাকি পড়ে রয়েছে। মহিলা-সমিতির কাজ-কর্ম কীভাবে আরো জোরদার করা যায়, এ-চিন্তা সর্বদাই ঘুরপাক খায় তার মাথায়।

বেলাটা একটু চড়তেই ফুলি তাদের বিল্‌তিতে গ্রাম থেকে ডোঙায় চ'ড়ে রওনা দিলো বাঁকপুরের দিকে। মাঝখানে মাইল দুয়েক বিল উজিয়ে ফুলি গিয়ে পৌঁছালো বাঁকপুরে। উত্তর পাশে একটেরেয় একটা ছোটো ভিটে-বাড়ী। মহিলা-সমিতির বিশিষ্ট কর্মী বিসখার বাড়ী ওটা। ওর সঙ্গে ফুলির কিছু পরামর্শ করা দরকার। সতর্ক চোখে চারিদিক একবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে বিসখাদের ঘাটে ডোঙা রেখে ফুলি ভিটেয় উঠে গেলো। ঢুকল গিয়ে বিসখার ঘরে।

এ-দিন ভোরবেলাতেই জনকয়েক কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে মেজদারোগা হাজির ছিলেন বাঁকপুরের অনন্ত বিশ্বাসের বাড়ী। একটা সাধারণ নৌকায় কিছুটা প্রচ্ছন্ন বেশে তাঁরা এসেছিলেন। ফলে তাঁদের আবির্ভাব কারো নজরে পড়েনি। ধনী জোতদার অনন্ত বিশ্বাসের বাড়ী কত লোকজনই তো যাওয়া আসা করে। মেজদারোগার উদ্দেশ্য ছিল, অনন্তর বাড়ী সকালের জলযোগাদি সেরে বিলভাসানের গ্রামে টহল দিতে বেরোবেন।

ফুলি যখন বিসখাদের বাড়ীর ঘাটে ডোঙা থেকে নামছিল, তখন তাকে দূর থেকে লক্ষ করছিল একজন। অনন্ত বিশ্বাসের বাড়ীর একজন বাঁধা-কিষাণ ডোঙায় চ'ড়ে বিলের দিকে যাচ্ছিল আরালি ঘাস কাটতে। জলের উপর ঝাঁপিয়ে-ওঠা এই আরালি ঘাস এখন গরুর অন্যতম খাদ্য। যেতে যেতে হঠাৎ ওর চোখ পড়ে ফুলির উপর। ফুলিকে ধরার জন্য পুলিশ যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা বিলভাসানের একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। সুতরাং কিষাণটির আর ঘাস কাটতে যাওয়া হ'লো না। দ্রুতবেগে ডোঙা বেয়ে বাড়ী ফিরে এলো। মূল্যবান সংবাদটি তুলে দিলো অনন্তর কানে।

অনন্ত মহা উল্লসিত। ছুটে গিয়ে দারোগাকে বলল—'মেজবাবু, পাখি ধরবেন তো তাড়াতাড়ি ওঠেন।'

দারোগা হেঁয়ালিটা ধরতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর অনন্তর কাছে সংবাদটা শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনিও। তড়ি-ঘড়ি ক'রে ধড়া-চূড়ো সামলে কনস্টেবলদের নিয়ে রওনা হলেন। চার পাঁচখানা নৌকা যোগাড় করা হ'লো। সব নৌকাতেই একজন ক'রে বন্দুকধারী কনস্টেবল। সঙ্গে সেই কিষাণটি। বিসখাদের ঘাটে এসে দেখতে পেলেন, ফুলির ডোঙাটি ঘাটেই রয়েছে। অর্থাৎ ফুলি এ-বাড়ীতেই আছে। পুলিশ চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল ভিটেটা। একজন কনস্টেবল আর চৌকিদারকে নিয়ে মেজদারোগা নৌকা থেকে লাফ দিয়ে ভিটেয় নামলেন।

ফুলি আর বিসখা তখন ঘরের মধ্যে ব'সে সলা-পরামর্শ করছিল। হঠাৎ বিসখার ছোটো ভাসুরপোটি ঘরের মধ্যে ছুটে এসে বলল—'ও খুড়ী, তোমরা কি করতিছো ? ওদিকি যে পুলিশ আইছে !'

চমকে ওঠে বিসখা। দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে বাইরে তাকিয়ে দেখে—সর্বনাশ ! ভিটের ও-প্রান্তে নৌকা থেকে পুলিশ নামছে। ফুলির পালানোর আর কোনো পথ নেই।

ফুলিকে জড়িয়ে ধ'রে বিসখা অস্ফুটে আর্তনাদ ক'রে উঠল—'কি হবে ফুলিদি ? পুলিশ যে ভিটে ঘিরে ফেলিছে !'

ক্ষণিকের জন্য ফুলিও বিভ্রান্ত বোধ করল। কিন্তু পর মুহূর্তে তার স্নায়ুগুলো টান-টান শক্ত হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'ভয় পাস্‌নে ! দরজা বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে শুয়ে থাক্। পুলিশ আস্‌লি বলবি, জ্বর হইছে।'

ঘরের মধ্যে একবার চোখ বুলালো ফুলি। তারপর এক ঝটকায় আলগা ক'রে ফেলল পিছন দিকের বাঁশের বেড়াটা। সেখান দিয়ে সন্তর্পণে দীর্ঘ দেহটা সাপের মতো টেনে বের ক'রে নিয়ে এলো। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল ঘরের পিছনের কানাচে। ঘরের পিছনে ডাঙা জমি সামান্যই। ভিটের সব লোক এখানে ছাই-মাটি সাত-পাঁচ আবর্জনা ফেলে। ফলে জায়গাটা নোংরায় ভরা। তার উপর চারপাশে বড়ো বড়ো বিচে-কলার গাছ। পাতার ছায়ায় ঝুপসি অন্ধকার। সেই নোংরা আবর্জনার মধ্যে ঝুপসি অন্ধকারে এসে দাঁড়াল ফুলি। আর কয়েক পা এগোলেই জলের শুরু। এখানে একটা বিশাল পুকুর। এখন অবশ্য কোন্‌টা পুকুর আর কোন্‌টা কী, বোঝার উপায় নেই। চারিদিক তো জলে ভেসে জলময় হয়ে আছে। তবুও পুকুরের অংশটা কিছুটা আঁচ করা যায়। প্রায় বিঘে তিনেক জায়গা জগদ্দল কচুরিপানায় ঢাকা। এই অংশটাই পুকুর। তারপর থেকে ধু ধু করছে জল। তার থেকে আর একটু এগিয়েই শুরু হচ্ছে বিস্তৃত গভীর বিল। একেবারে বনখালি গ্রামে গিয়ে সে বিলের শেষ।

ফুলি সেই বিস্তৃত জলরাশির দিকে তাকাল একবার। তারপর এগিয়ে গেলো সামনের দিকে। ধীর পায়ে জলে নামল। সবল দুই হাতে কচুরিপানা ঠেলে সামান্য একটু জায়গা ফাঁক করল। নিজের অজান্তেই কখন ফুলির দুই হাত উঠে

এলো কপালে। মনে মনে বলল—'মা কালী, তুমিই রক্ষে ক'রো মা!'

তারপর কচুরিপানার সেই ছোট্ট ফাঁক দিয়ে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেলো ফুলির দেহটা।

ছোটো একটা ডিঙি নৌকা নিয়ে বিলে এসেছিল বিষাণ। লম্বা বাঁশের লগি দিয়ে নৌকাটা বাইতে বাইতে চলে এসেছিল বিলের অনেকখানি ভিতরে। উদ্দেশ্য ছিল শাপ্‌লা তোলা। বিলের গভীর জলের এক একটা শাপ্‌লা প্রায় দশ বারো হাত লম্বা। এগুলোর স্বাদও বেশী। অনেকগুলো শাপ্‌লা তুলেছে বিষাণ। নৌকার মাঝখানে বাঁশের চালির উপর সেগুলো গাদা দেওয়া রয়েছে।

শাপ্‌লা তোলাটাই বিষাণের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বিলের এই বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে একা একা নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে তার ভারী ভালো লাগে। মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়ে। মাথার উপর শাসন করার তেমন কেউ নেই। একমাত্র মা। কিন্তু মা তো আজকাল কোনোদিকেই খেয়াল রাখে না। ফুলির সঙ্গে মহিলা-সমিতির কাজকর্ম নিয়ে মেতে থাকে। তবে বিষাণকে শাসন করার দরকারও হয় না। ভালো ছেলে সে। যতীন মাষ্টারের স্কুলে লেখাপড়ায় তার সুনাম আছে। তবে একটু পাগ্‌লা পাগ্‌লা, খেয়ালী স্বভাব—এই আর কী। কবিতা লেখার বাতিকও দিন দিন বেড়ে চলেছে। এখন স্কুলে দুর্গাপূজার ছুটি। পড়াশুনোর চাপ কম। ফলে বিষাণের ঘোরাঘুরিটাও বেড়ে গেছে।

বিলের মাঝামাঝি গিয়ে নৌকার উপর লগি তুলে রেখে চুপচাপ ব'সে থাকল বিষাণ। কি সুন্দর দেখাচ্ছে চারিদিকটা। দূরে দূরে গ্রামগুলো জলের উপর ভাসছে। এক একটা ধূসর দ্বীপের মতো দেখাচ্ছে গ্রামগুলোকে। বিলের উপর দিকে আমন ধানের ক্ষেত। জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছে আমন ধানের গাছগুলো। বিষাণের নৌকা যেখানে, সেখানে আরো গভীর জল। মাঝে মাঝে জলের সমতলে উঁকি দিচ্ছে জলজ শ্যাওলাগুলো। তার গায়ে বড়ো বড়ো খয়েরী রঙের শামুক শুঁড় মেলে বিশ্রাম করছে। মাথার উপর ঝলমল করছে দুপুরের রোদ। রোদের উজ্জ্বল আলোয় বিলের পরিষ্কার জলের গভীরে অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়। মাঝে মাঝে শরতের উড়ো মেঘের ছায়া নামে বিলের জলে। নিমেষে জলের রং পালটে নিকষ-কালো হয়ে ওঠে। সেই অতল কালো জলের দিকে তাকালে আচমকা বুকের মধ্যে যেন হিম হয়ে ওঠে।

বিস্ময়ভরা দু'টো চোখ মেলে বিষাণ জলের এইসব সৌন্দর্য দেখছিল। দেখতে দেখতে তার মনটা যেন চলে গেলো আর এক জগতে। তার ক্লাসের বাংলা পাঠ্য বইয়ে একটি প্রবন্ধ আছে—'সমুদ্রতলের সৌন্দর্য।'—প্রবন্ধটিতে ভারী সুন্দর ক'রে সমুদ্রের তলদেশের প্রবাল-পাহাড়, মাছ এবং নানা ভয়ঙ্কর জীবের বর্ণনা দেওয়া আছে। নৌকার পাশের স্বচ্ছ সুগভীর জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিষাণের মন চলে গিয়েছিল সমুদ্রতলের সেই রহস্যময় অজানা রাজ্যে।

হঠাৎ চমকে উঠল বিষাণ। একটা বিশাল অতিকায় জীব জলের তলা দিয়ে ছুটে আসছে তার নৌকার দিকে। প্রচণ্ড ভয়ে বিষাণের সারা শরীর যেন অবশ

হয়ে এলো। চোখ দু'টো বন্ধ হয়ে গেলো আপনা-আপনি।

জীবটা হঠাৎ নৌকার ডালির এপাশে মাথা উঁচু ক'রে ভেসে উঠল। তারপর একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসল নৌকায়। ঝাঁকুনি খেয়ে চোখ দু'টো খুলে গেলো বিষাণের। জীবটি তখন নৌকার গুরোয় হাতের ভর রেখে হাঁফাচ্ছে।

বিষাণ এক পলক দেখেই ভয়ানক অবাক হয়ে বলল—'মাসী—তুমি!'

ফুলি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'হ্যাঁরে কোদা, আমি। তা, নৌকাডা বা দেখি বাপ সুমুখির দিকি। এট্টু জোরায়ে বা। এক্কেবারে নিয়ে চল্ বনখালির রঘুরাম সদ্দারের বাড়ী।'

'কোদা' হ'লো 'খোকা'র আদরের ডাক। তা, কোদা তখন ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝে ফেলেছে। ফুলি মাসী যে পুলিশের তাড়া খেয়ে জলে ডুব মারতে মারতে বিলের মধ্যে চলে এসেছে, এটা বুঝতে বাকি রইল না বিষাণের।

বিষাণ তাড়াতাড়ি বলল—'মাসী, তুমি নৌকোর খোলে শুয়ে পড়ো।'

বাধ্য মেয়ের মতো ফুলি শুয়ে পড়ল বাঁশের চালির তলায় নৌকার খোলে। বিষাণ চালির উপর দীর্ঘ শাপলাগুলো এলোমেলো ক'রে ছড়িয়ে দিলো। বাইরে থেকে এখন আর হঠাৎ বোঝার উপায় রইল না যে. নৌকার খোলে একজন মানুষ রয়েছে।

বিষাণ তখন লিকৃপিকে হাতে বাঁশের দীর্ঘ লগিটা ঝপাঝপ ফেলতে লাগল জলে। শাপলা-গাছ, ধানগাছ, শ্যাওলার জঙ্গল ভেদ ক'রে নৌকা এগিয়ে চলল সামনের দিকে। লক্ষ্য, বনখালির কৃষক-সমিতির বিশিষ্ট সদস্য রঘুরাম সর্দারের বাড়ী।

এদিকে একজন কনস্টেবল আর চৌকিদারকে নিয়ে মেজদারোগা তো নামলেন ভিটেয়। মনে তাঁর ভারী স্ফূর্তি। মহিলা-সমিতির নেত্রী ডাক-সাইটে ফুলি সিঙ্গিকে আজ গ্রেপ্তার করার কৃতিত্ব অর্জন করবেন তিনি।

মেজদারোগা তল্লাশী শুরু করলেন। ভিটেয় অনেক শরিকের বাস। একটার পর একটা ঘরে তল্লাশী ক'রে চললেন দারোগা। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ। সমর্থ পুরুষ-মানুষ কোনো ঘরেই নেই। সকাল হতেই সব এদিক ওদিক সরে পড়েছে। রয়েছে শুধু মেয়েরা, বাচ্চা-কাচ্চা আর বুড়ো-বুড়ীর দল। দারোগা তাদের উপরেই হম্বি-তম্বি করতে লাগলেন। কিন্তু ফুলিকে খুঁজে পাওয়া গেলো না কোথাও।

খুঁজতে খুঁজতে দারোগা এসে হাজির হলেন বিসথার ঘরে। কিন্তু বিসথার তখন প্রবল জ্বর। কাঁথামুড়ি দিয়ে 'উহু'-হু'-হু''—ক'রে এমন কাঁপুনি শুরু ক'রে দিলো যে, তার কাছ থেকে আর কোনো কথা বার করা গেলো না।

হঠাৎ ঘরের পিছন দিকের আলগা বেড়ার দিকে দারোগার দৃষ্টি আকর্ষণ করল চৌকিদার। দারোগা বুঝলেন, এই পথেই ফুলি সিঙ্গি পালিয়েছে। ঘরের মধ্যে আর সময় নষ্ট করা বৃথা। তাড়াতাড়ি দারোগা ঘরের পিছনে কানাচে এলেন। পালিয়ে যাবে কোথায় ফুলি সিঙ্গি? চারিপাশেই তো পাহারা রয়েছে। দুর্ভেদ্য কচুরিপানার জঙ্গল দেখে দারোগা অনুমান করলেন, এর মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে ফুলি। নিশ্চিত শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে দারোগা মরিয়া হয়ে

উঠলেন। বিষম চেঁচামেচি শুরু করলেন। ছুটে এলো চৌকিদার কনস্টেবলেরা। তাদের পিছন পিছন অনন্তর বাড়ীর কয়েকজন কিষাণ।

সবাই মিলে শুরু হ'লো খোঁজাখুঁজি। কত কালের পুরোনো সেই পুকুর-ভর্তি কচুরিপানার জঙ্গল তছনছ হয়ে গেলো। দারোগার আদেশে মাছ-ধরা কোঁচ আনা হ'লো। তারপর সবাই মিলে কচুরিপানার মধ্যে কোঁচ মারতে আরম্ভ করল। যদি ফুলি কচুরিপানার মধ্যে জলের তলায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে! ঘণ্টাখানেক ধ'রে কোঁচ চালানো হ'লো। তোলপাড় হয়ে গেলো পুকুরের জল। কিন্তু কোথায় ফুলি! ফুলির হদিস মিলল না কোথাও।

দারোগা টং হয়ে উঠলেন রেগে। এর মধ্যে আবার অনন্তর বাড়ীর একজন কিষাণ-ছোকরা মন্তব্য ক'রে বসল—'ও বিটিরে বিশ্বেস নেই দারোগাবাবু। ওর নাম ফুলি সিঙ্গি। পুরো এক দিন জলের তলায় ডুবোয়ে থাক্‌তি পারে। আরো জোরায়ে কোঁচ মারতি কন্।'

দারোগা কটমট ক'রে কিষাণ ছোকরাটির দিকে তাকালেন। ছোকরাটি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলো সেখান থেকে।

হতাশ হয়ে ফিরে যাবার সময় মেজ দারোগা মন্তব্য করলেন—'ফুলি সিঙ্গির নাম শুনেছিলাম। আজ তার কেরামতি দেখলাম!'

এই ঘটনায় ফুলি সিঙ্গি সম্পর্কে পুলিশের মধ্যে বিস্ময় এবং আতঙ্ক আরো বেশী ক'রে দানা বেঁধে উঠল। আর তার এই অলৌকিক অন্তর্ধানকে কেন্দ্র ক'রে বিলভাসানের গ্রামে গ্রামে রচিত হ'লো নানা গল্পকথা।

॥ তেইশ ॥

বিলভাসানে আবার অগ্রহায়ণ এলো। শুরু হ'লো আমন ধান কাটার মরসুম। এতদিনে তেভাগা-আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান-রূপে পরিগণিত হয়েছে বিলভাসান। বিলভাসানের কৃষকদের বীরত্ব, সংগ্রাম, সহিষ্ণুতা, 'কৃষক-সভা'র গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'কৃষক-সভা'র কেন্দ্রীয় কমিটি ফসল কাটার মরসুমে সর্বশক্তি দিয়ে বিলভাসানের তেভাগা-আন্দোলনকে মদত দেবার নির্দেশ দিলেন জেলা-কমিটিকে। জেলা-কমিটির নেতারাও সে নির্দেশ পালন ক'রে চললেন অক্ষরে অক্ষরে। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের নামেই গ্রেফতারী পরোয়ানা রয়েছে। পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করার জন্য এবার অনেক বেশী তৎপর। ফলে তাঁদের কাজকর্ম করতে হচ্ছে অত্যন্ত সংগোপনে। আগে প্রকাশ্য স্থানেই তাঁরা চাষীদের নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় সভা করেছেন। কিন্তু এখন আর এ-ধরনের প্রকাশ্য সভা নিরাপদ নয়।

বাধ্য হয়ে নেতারা কৌশল পাল্টালেন। এখন শুধু বাছা বাছা বিশিষ্ট কৃষক কর্মীদের নিয়ে গভীর রাত্রে সভা হতে লাগল। ঐ সব কৃষক কর্মীই আবার সভার

সিদ্ধান্ত পৌঁছে দিতে লাগল গ্রামে গ্রামে সাধারণ কৃষকদের কাছে। সভা চলাকালীন নিপুণ সশস্ত্র কৃষক-কর্মীরা সতর্কভাবে সভার আশেপাশে পাহারা রাখে। সভার স্থানও প্রত্যেক দিন পরিবর্তিত হয়। কৃষক-কর্মীদের অনেকের মধ্যেই বেশ নেতৃত্বের শক্তি প্রকাশিত হতে লাগল। সভার স্থান নির্ণয় করা, বহিরাগত নেতাদের গোপনে আশ্রয়-দানের ব্যবস্থা করা, সংগোপনে তাদের এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে নিয়ে সভার আয়োজন করা—এসব কাজে স্থানীয় কিছু কিছু কৃষক-কর্মী খুবই পারদর্শী হয়ে উঠল। 'সংগঠন ও সংগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষা, আর শিক্ষার মাধ্যমে সংগঠন ও সংগ্রাম'—'কৃষক-সভা'র এই নীতি মূর্ত হয়ে উঠল বিলভাসানের কৃষক-কর্মীদের কাজের মধ্যে।

আমন ধান কাটার মরসুমে তেভাগার দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চাষীদের সংগঠনের ক্রিয়াকলাপ যেমন বৃদ্ধি পেলো, তেমনি জোতদাররাও ভাগ-চাষীদের দাবি নস্যাৎ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলো। জোতদার এবং পুলিশের সমন্বিত শক্তি জোটবদ্ধ হ'লো বিলভাসানের কৃষকদের তেভাগার দাবি স্তব্ধ ক'রে দেবার জন্য। পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারেরা তখন কথায় কথায় শিশু-রাষ্ট্রের দোহাই পাড়েন। কিন্তু কৃষকদের ন্যায্য দাবিকে ধূলিসাৎ ক'রে দিতে শিশু-রাষ্ট্রের পুলিশ-বাহিনীর দানবীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেরি হ'লো না।

পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হ'লো চাষীদের অভিযান। ধান কাটার সময় এবারও আগের বারের পথই অনুসরণ করা হ'লো। দলবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে অনেকগুলি ক্ষেতের ধান অল্প সময়ের মধ্যে কেটে সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু হ'লো। পাহারার কাজও জোরদার করা হ'লো ধান কাটার সময়। পাহারাদার ভলান্টিয়াররা এবার রীতিমতো ঢাল সড়কি লাঠি রামদা নিয়ে পাহারা দিতে থাকল। অতর্কিতে চাষীরা এক এক জায়গার ক্ষেতে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল যে, বাধা দেবার কোনো সুযোগই পেলো না জোতদাররা। পুলিশে খবর দেওয়া আছে। কিন্তু পুলিশ আসতে আসতেই চাষীরা তাদের কাজ হাসিল ক'রে সরে পড়ে।

জোতদাররা কৌশল পালটাল। বড়ো দারোগার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কিছু পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা করল নিজেদের বাড়ীতে। চাষীরা কোনো ক্ষেতের ধান কাটা শুরু করলে যাতে নিকটবর্তী স্থান থেকে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হয়, সে-জন্যই এই ব্যবস্থা। প্রয়োজনে গুলী চালানোর নির্দেশও দেওয়া থাকল তাদের। এর ফলে চাষীদের ধান কাটার কাজ ব্যাহত হ'লো কিছুটা। পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামে কিছু খুন জখম হবেই। কিন্তু সেটা তো তাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। এখন তাদের সব থেকে বড়ো কাজ হ'লো, ক্ষেতের ধান কেটে নিজেদের দখলে নিয়ে আসা। ফলে তারা পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের পথ সযত্নে এড়িয়ে চলল। কিন্তু ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে তাদের ধান-কাটার কাজও অব্যাহত রইল। পুলিশের আশ্রয়-পুষ্ট হয়ে জোতদারেরাও লোকজন লাগিয়ে কিছু ক্ষেতের ধান কেটে নিজেদের খোলেনে তুলতে সমর্থ হ'লো। কিন্তু তাতে চাষীদের মনোবল নষ্ট হয় না। দ্বিগুণ উৎসাহে ধান কাটার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে তারা।

কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এবং এই পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে কিছুটা আকস্মিক ভাবেই।

সত্যপ্রসাদের মাথায় এখন অনেক দায়িত্ব। কৈলাসের বাড়ীতে তাঁর মূল আস্তানা ঠিক আছে। কিন্তু তাঁকে এখন প্রায়ই কৃষক-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গোপনে বিলভাসানের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়। এখন আর বড়ো সভা করা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামে গ্রামে ছোটো ছোটো ঘরোয়া বৈঠকের ব্যবস্থা ক'রে কার্যসূচী তৈরী করতে হচ্ছে। সংগঠনকে উজ্জীবিত রাখার দিকেও লক্ষ রাখতে হচ্ছে।

সেদিন দুপুরবেলায় সত্যপ্রসাদ কৈলাসের বাড়ীতেই ছিলেন। খেয়ে উঠে একটু-খানি বিশ্রাম নেবার কথা ভাবছিলেন। সন্ধ্যেবেলাতেই আবার বিলভাসানের সীমান্তবর্তী গ্রাম বকচরায় যেতে হবে। ওখানে রাত্রে চাষীদের একটা মিটিং আছে। ঐ অঞ্চলের ধান-কাটা সম্পর্কে কার্যসূচী তৈরী করতে হবে। এ-সব চিন্তাই ঘুরছিল সত্যপ্রসাদের মাথায়। বারান্দার নিচে মাটির ডোয়ায় হেলান দিয়ে ব'সে আছে ধনুপাগল। সত্যপ্রসাদকে আজ ঘরে থাকতে দেখে পাগলটা এসে জুটেছে। থেকে থেকে সত্যপ্রসাদের দিকে তাকায় আর বিড়বিড় করে আপনমনে। মাঝে মাঝে দোল খায়। পাগলের বিচিত্র সব খেয়াল!

এমন সময় একজন কৃষক-কর্মী একজন লোককে নিয়ে এলো সত্যপ্রসাদের কাছে। সত্যপ্রসাদ আজকাল যেখানেই থাকুন না কেন, কিছু জোয়ান ছেলে সব সময়েই তাঁর পাহারার ব্যবস্থা রাখে। তাদেরই একজন নিয়ে এলো ঐ লোকটিকে। সাধারণ চাষী-বাসীর মতো বেশভূষা লোকটার। মাথায় আবার একটা আধ-বোঝাই বস্তা। ধান-টান কিছু হবে বোধ হয়। হঠাৎ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকিয়েই চিনতে পারলেন সত্যপ্রসাদ। জেলা-কমিটির একজন বিশিষ্ট কর্মী ইনি। ছদ্মবেশটা বেশ ভালই হয়েছে।

বস্তাটা নামিয়ে তিনি চুপি চুপি বললেন—'কমরেড, আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে। কিছু গোপনীয় বই আর কাগজ-পত্র থাকল। বর্তমান অবস্থায় এখানে আপনাদের কী করণীয়, সে সম্পর্কে জেলা-কমিটির নির্দেশ-পত্রও থাকল। এগুলো সাবধানে রাখবেন। পুলিশের হাতে পড়লে বিপদ হবে।'

ভদ্রলোক আর দেরি করলেন না। সাধারণ হেটো চাষীর মতো রাস্তায় নেমে চলতে শুরু করলেন। সত্যপ্রসাদের ইশারায় কৃষক-ছেলেটি বস্তাটিকে নিয়ে সত্য-প্রসাদের খাটের নিচে একপাশে গাদা দিয়ে রাখল। দেখলে মনে হবে, ঘর-সংসারেরই কোনো জিনিস পোরা রয়েছে বস্তায়।

কিন্তু বিপদ এলো ঐ ভদ্রলোককে ঘিরে। ফিরে যাবার সময় বিলভাসানের সীমান্ত-মুখে তিনি ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে। পুলিশের কাছে তাঁর মুখ অপরিচিত নয়। 'কৃষক-সভা'র জেলা-কমিটির দক্ষ কর্মী হিসেবে পুলিশ তাঁরও অনুসন্ধানে ছিল। বিলভাসান থেকে বেরোতে দেখেই পুলিশের সন্দেহ হয়। তারপর গ্রেফতার এবং পরিচয় আবিষ্কার।

পুলিশ ওঁকে থানায় ধ'রে নিয়ে প্রথমে জেরা-জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। কিন্তু

কোনো জবাব না পেয়ে বেধড়ক মার দেয়। মারের চোটে সমস্ত কথা স্বীকার করতে বাধ্য হন তিনি। বিলভাসানের বাঁকপুর গ্রামে কৈলাস মণ্ডলের বাড়ীতে সত্য-প্রসাদের কাছে 'কৃষক-সভা'র কিছু মূল্যবান কাগজপত্র লুকানো রয়েছে, এ খবর জেনে গেলো পুলিশ। এই ক-মাসে অবাঙালী বড়ো দারোগা বাংলা ভাষাটা মোটা-মুটি আয়ত্ত ক'রে নিয়েছেন। তিনি ভাঙা ভাঙা বাংলায় কৈলাস মণ্ডলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

তখন থানায় উপস্থিত ছিল জোতদার পুলিন রায়। পুলিন এগিয়ে এসে বলল —'বড়োবাবু, ঐ কৈলেসটাই তো এক নম্বরের হারামি। ওদের পালের গোদা সত্য মুখার্জী তো ওর বাড়ীতেই থাকে। নেতা-গোতারা আ'সে সব ঐ কৈলেসের বাড়ীতেই মিটিং করে। ঐ কৈলেসটারে এট্টু টাইট্ দেয়া দরকার।'

বড়ো দারোগা শুধু গম্ভীরভাবে একবার 'হুঁ' বললেন। তারপর মেজ দারোগা আর পুলিনকে নিয়ে পরামর্শ করতে বসলেন। কৈলাসের বাড়ী লুঠ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো।

পরদিন বেলা একটু চড়তেই বিরাট একটি পুলিশ-বাহিনী বিলভাসানের পূব দিক দিয়ে এসে ঢুকল মল্লিহাটির পুলিন রায়ের বাড়ীতে। সঙ্গে বড়ো দারোগা স্বয়ং। এত বড়ো পুলিশ-বাহিনী এর আগে আর কখনো বিলভাসানে আসেনি। দেখলেই বোঝা যায়, শুধু বিলভাসানের থানা থেকেই নয়, মহকুমা থানা থেকেও পুলিশ আনা হয়েছে। সকলেরই হাতে রাইফেল। পুলিশের এই বিরাট সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে আরো বেশ কিছু লোক। উৎসাহটা যেন তাদেরই বেশী। এরা সব মুসলিম লীগের সমর্থক। কৈলাসের বাড়ী লুঠ করার জন্য বড়ো দারোগা এদেরও সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন।

পুলিন রায়ের বাড়ীতে পুলিশ ঢুকতেই বিলভাসানের পূব সীমান্তে চাষীদের যে সব পাহারাদার ছিল, তারা গ্রামে গ্রামে অতি দ্রুত স্বেচ্ছাসেবক খবুরে পাঠিয়ে এ খবর ছড়িয়ে দিলো। চাষীরা যেন কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়ল এ-খবরে। সকলেরই লক্ষ্য এখন ধান-কাটার দিকে। হঠাৎ এ-সময়ে এতবড়ো পুলিশ-বাহিনীর আগমনের সংবাদে তারা কিছুটা বিহ্বল বোধ করল। কিন্তু তবু গ্রামে গ্রামে সবাই অস্ত্র হাতে উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

এদিকে পুলিনের বাড়ীতে পুলিশ জমা হবার সংবাদ শুনেই বিষাণ তার দলটাকে নিয়ে হাজির হ'লো পুলিনের বাড়ী। বিষাণ তার সমবয়সী ছেলেদের নিয়ে একটা দল গড়েছে। এদের কাজ হ'লো—চরের কাজ। কোনো জায়গায় পুলিশ এলেই এরা সেখানে গিয়ে পুলিশের আশে পাশে ঘুর-ঘুর করে। ছোটো ছেলে। কেউই এদের সন্দেহ করেনা। এরা সরল হাবা-গোবা ভাব ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে পুলিশের পাশে। পুলিশদের ছোটো-খাটো ফাই-ফরমাশও খাটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া ক'রে থাকে। পুলিশদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়, কোন্ গ্রামে তারা আক্রমণ করতে যাচ্ছে, সে খবর জানার চেষ্টা করে। খবরটি জানতে পারলেই এক-দু'জন নিঃশব্দে সরে যায় সেখান থেকে। তারপর নির্দিষ্ট গ্রামে ছুটে গিয়ে খবর দেয় সেখানকার কৃষক-কর্মীদের। কৃষকরা সাবধান হয়ে যায়। বিষাণের এই

ক্ষুদে চর-বাহিনী নিজেদের বুদ্ধিমত একটি সাঙ্কেতিক ভাষাও তৈরী ক'রে নিয়েছে। যেমন—'পুলিশ এসেছে, সাবধান।' কথাগুলো তারা উল্টো ক'রে নিয়ে বলে—'শলিপু ছেসেএ, নধাবসা।' চুপিচুপি এ-ভাষায় তারা নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি করে। এ-ভাষার রহস্য তারা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেনা।

আজও বিষাণ তার দল নিয়ে পুলিন রায়ের বাড়ীতে এসে খবর-সংগ্রহের কাজে লেগে গেলো। কিন্তু এত পুলিশ আর লোকজনের মধ্যে বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। কিন্তু ওরই মধ্যে 'বাঁকপুর' 'সত্যপ্রসাদ' 'কৈলাস মণ্ডল' প্রভৃতি শব্দ কানে গেলো তাদের। তারা বুঝল, আজ পুলিশের লক্ষ্য বাঁকপুর গ্রাম। সত্যপ্রসাদকে ধরার জন্যই পুলিশ এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চর ছুটল বাঁকপুরে।

পুলিনের বাড়ীতে সামান্য সময় অপেক্ষা ক'রেই পুলিশ-বাহিনী নেমে এলো বড়ো রাস্তায়। কাঁধে বন্দুক রেখে সারিবদ্ধভাবে কুচকাওয়াজ করতে করতে পুলিশ-বাহিনী এগিয়ে চলল বাঁকপুর গ্রামের দিকে। পিছন থেকে মুসলিম লীগের সমর্থকেরা আওয়াজ দিলো—'পাকিস্তান—জিন্দাবাদ।'

এদিকে পুলিশ-বাহিনী রাস্তায় নামতেই বিলভাসানের গ্রামেগ্রামে চাষীরা সতর্ক হয়ে উঠল। চারিদিকে বেজে উঠল হাজার হাজার জয়ঢাক। সে প্রবল নিনাদে পুলিশেরাও চমকে উঠল। বিলভাসানের জয়ঢাকের শব্দ তাদের কাছে এক বিষম আতঙ্কের বস্তু। জয়ঢাক মানেই সংঘবদ্ধ চাষীদের প্রবল প্রতিরোধ। আর সে প্রতিরোধ যে কী জিনিস, পুলিশ বহুবার তার পরিচয় পেয়েছে। সুতরাং গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ভেসে আসা জয়ঢাকের প্রবল শব্দে পুলিশ-দল কিছুটা হত-চকিত হয়ে পড়ল। কিন্তু বড়ো দারোগা সামনের দিকে এগিয়ে এসে আকাশের দিকে হাত তুলে হুকুম দিলেন—'ফায়ার।'

সঙ্গে সঙ্গে চারটে রাইফেল থেকে পরপর গুলী ছুটল আকাশে। জয়ঢাকের শব্দ ছাপিয়ে সে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হ'লো বিলভাসানের গ্রামে গ্রামান্তরে। চাষীরা বুঝল, আজকের এ পুলিশ-বাহিনীকে ভয় পাইয়ে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। প্রয়োজনে এরা নির্মম ভাবে গুলী চালাবে। কিন্তু তবু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকল না কেউ। অস্ত্র-পাতি হাতে নিয়ে বাড়ীঘর গাছ-গাছালির আড়ালে সবাই এসে জড় হতে থাকল বাঁকপুরে।

কৈলাসের বাড়ীর থেকে সামান্য একটু দূরে বিলের গা ঘেঁষে একটা জঙ্গুলে জায়গা। বড়ো বড়ো আস্‌-শ্যাওড়া আর মাদার গাছে ঢাকা। নিচে কোমর-সমান উলুখড়ের জঙ্গল। অস্ত্র হাতে জোয়ান চাষীরা একে একে এসে সমবেত হ'লো সেখানে। আত্মগোপন ক'রে অপেক্ষা করতে লাগল।

পুলিশ-বাহিনীর আজ আর অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি নেই। মাঝখানের তিন-চারটে গ্রাম অতিক্রম ক'রে সটান এসে হাজির হলো বাঁকপুরে। এসেই ঘিরে ফেলল কৈলাস মণ্ডলের বাড়ী। মুসলিম-লীগের সমর্থকদের 'পাকিস্তান—জিন্দাবাদ' ধ্বনি উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। বাড়ী থেকে নবীন এবং সতীশকে আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধ কৈলাস এবং মেয়েরা শুধু রয়েছে বাড়ীতে। কৈলাসের বাড়ীর চারিদিক ঘিরে ফেলে পুলিশ-দল আস্তে আস্তে ভিটের উপর উঠে আসতে লাগল।

কৈলাসের বাড়ী পুলিশ ঢুকতে দেখেই জঙ্গুলে জায়গাটা থেকে একজন চাষী বেরিয়ে ছুটল বকচরা গ্রামে। ওখানে সত্যপ্রসাদকে পাওয়া যেতে পারে। চাষীটির অনুমান যথার্থ। গতকাল সন্ধ্যেয় বকচরা গ্রামে এসে অনেক রাত পর্যন্ত মিটিং ক'রে সত্যপ্রসাদ আর কোথাও যেতে পারেননি। এখানেই এক বাড়ীতে দিনের বেলায় আত্মগোপন ক'রে ছিলেন। ঢাকের শব্দ কানে গিয়েছিল তাঁরও। কোথায় কী ঘটেছে, জানার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ চাষীটি গিয়ে বলল—'সত্যদা, সব্বোনাশ হইচে। কৈলেস মোড়লের বাড়ী পুলিশ ঢুকিচে।'

সত্যপ্রসাদ চমকে উঠলেন—'সে কি ? তোমরা বাধা দাওনি ?'

চাষীটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'এতক্ষণে কি হচ্ছে, আমি কতি পারিনা সত্যদা। মেলা পুলিশ আইচে। আমরাও দল বাঁন্ধে অস্ত্র-পাতি নিয়ে শ্যাওড়া ভিটেয় বসে রইছি। এতক্ষণে মনে কয়—দুই দলে লা'গে গেছে।'

সত্যপ্রসাদ ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। জামাটা গায়ে দিতে দিতে বললেন—'চলো, আমি যাচ্ছি।'

কিন্তু এখানে যারা সত্যপ্রসাদের পাহারাদার ছিল, তারা বাধা দিলো—'না, সত্যদা, এ-অবস্থায় আপনার কিছুতেই যাওয়া চল্‌তি পারে না।'

—'বলছ কি তোমরা ? কৈলাসের যদি কোনো বিপদ হয় ? তাছাড়া আমার খাটের নিচে অনেক জরুরী কাগজ-পত্র রয়েছে। ওগুলো পুলিশের হাতে পড়লে যে খুব বিপদ হবে।'

কিন্তু পাহারাদার চাষীরা অনড়—'সে যা হয় হবে। কিন্তু জা'নে-শুনে আপনারে তো আমরা বিপদের মধ্যি পাঠাতি পারিনা। আপনার যাওয়া চলবে না।'

সত্যপ্রসাদ নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এদিকে পুলিশ-বাহিনী নিয়ে বড়ো-দারোগা বাড়ীতে ঢুকে কৈলাসের খোঁজ করলেন। কৈলাস হাত জোড় ক'রে সামনে এসে দাঁড়াল। বড়ো দারোগা তাঁর আধা-খ্যাঁচ্‌ড়া বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন—'সত্য মুখার্জি কোথায় ?'

কৈলাস তেমনি হাত জোড় ক'রে বলল—'জানিনা বড়োবাবু।'

গালাগাল দিয়ে উঠলেন দারোগা। দেখা গেলো, বাংলাভাষাটা এখনো ঠিকমতন আয়ত্ত করতে না পারলেও কিছু চোস্ত বাংলা গালাগাল তিনি বেশ রপ্ত ক'রে ফেলেছেন। মুখ ভেংচে বললেন—'জানিনা বড়োবাবু ! ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে তখন জানতে পারবি।'

কৈলাস মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

—'সত্য মুখার্জির কাছে যে কাগজগুলো রয়েছে, সেগুলো কোথায় ?'—দারোগা আবার হুঙ্কার ছাড়লেন।

কৈলাস অবাক হয়ে বলল—'কাগজ ? কোনো কাগজের কথা তো আমি জানিনা বড়োবাবু !'

সঙ্গে সঙ্গে বড়ো দারোগার হাতের লাঠিটা গিয়ে সপাং ক'রে পড়ল বৃদ্ধ কৈলাসের উন্মুক্ত পিঠের উপর। যন্ত্রণায় কৈলাসের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল।

এরপর বড়ো দারোগা তল্লাশীর হুকুম দিলেন। কিন্তু সত্যপ্রসাদকে তো পাওয়া গেলোই না, যে কাগজগুলোর সন্ধানে তিনি এসেছেন, তারও কোনো হদিস মিলল না। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর আদেশে এবার কনস্টেবলেরা ঘরের খড়ের চাল লাঠি দিয়ে খোঁচা মেরে এলোমেলো ক'রে সন্ধান চালালো। সত্য-প্রসাদের ঘর থেকে তাঁর খাট বিছানা বালিশ টেনে ছত্রাখান ক'রে ছড়িয়ে দেওয়া হ'লো উঠোনে। কিন্তু কোথাও আপত্তিকর কিছু পাওয়া গেলো না।

বড়ো দারোগা এবার পুলিশের পিছনের বাহিনীকে ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'লো তাদের ক্রিয়াকলাপ। ঘরে ছিল কাঁঠাল কাঠের দরজা-জানালা। সেগুলো তারা খুলে ফেলল। অনেকগুলো কাঁঠাল কাঠের বড়ো বড়ো পিঁড়ি ছিল। সেগুলোও বের ক'রে নিলো। রান্নাঘরে কাঁসার থালা-বাসন যা ছিল, সবই বেরিয়ে গেলো। ঘরে মূল্যবান জিনিসপত্র কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। শখ ক'রে একটা খাসি পুষেছিল চাঁপা। সেটা বাঁধা ছিল উঠোনের কোণে। সেটাও অদৃশ্য হয়ে গেলো। গোলা ভর্তি ধান ছিল। একজন গিয়ে গোলার বাঁধন কেটে দিলো। ধানগুলো ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। চাঁপা, চাঁপার মা, আর ছেলে-কোলে নবীনের বউ ঘরের পিছনে গিয়ে ডুক্‌ ছেড়ে কাঁদতে লাগল।

কৈলাস নিঃশব্দে সরে এসে ভিটের নিচে তালগাছটার তলায় হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে চুপ ক'রে বসে রইল। বাড়ীর উপর সবাই যখন লুঠ-পাট আর ধ্বংস-লীলায় ব্যস্ত, তখন শ্যাওড়া-তলা থেকে গাছ-পালার ফাঁকে ফাঁকে চুপি চুপি জলধর এসে দাঁড়াল কৈলাসের পাশে। চাপা গলায় বলল—'তুমি একবার হুকুম দ্যাও মাতুব্বর জ্যাঠা। আমরা সকলে ঝাঁপায়ে পড়ি। তোমার হুকুম শোনার জন্য সকলে বসে আছে। এ তো আর চোখে দেখা যায় না!'

কৈলাস চোখের জল মুছে বলল—'না বাপসকল, তোরা সব চুপ ক'রে থাক্‌গে। এদের সাথে তোরা পারবি না। ঢাল-সড়কি দিয়ে বন্দুক রোখা যায় না। শুধু শুধুই মরবি তোরা।'

কৈলাসের অনুমতি না পেয়ে ক্ষুণ্ণ হ'লো জলধর। গাছ-পালার আড়ালে-আবডালে আবার সন্তর্পণে ফিরে গেলো শ্যাওড়া তলায়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মুসলিম-লীগের উৎসাহী কর্মীদলের হাতে বাড়ীর যা কিছু মূল্যবান জিনিস ছিল, তা পাচার হয়ে গেলো। ছারখার হয়ে গেলো কৈলাসের সোনার সংসার।

পুলিশ-বাহিনী নিয়ে বিজয়-গর্বে বড়ো দারোগা ভিটে থেকে নেমে এলেন নিচে। সারিবদ্ধ পুলিশ-বাহিনী নিয়ে ফিরে চললেন। কৈলাসের বাড়ীর নিচে বড়ো পুকুরটা ছাড়িয়ে রাস্তার পাশে মস্ত একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ। তার পাশে একটা খড়ের গাদা। বাঁশের চওড়া মাচার উপর শুকনো উলুখড়ের হালকা আঁটি-গুলো পরপর সারি দিয়ে সাজানো। বিশাল একটা স্তূপের মতো দেখাচ্ছে। ঘর ছাওয়ার জন্য কৈলাস খড়গুলো সংগ্রহ ক'রে রেখেছিল। খড়ের স্তূপটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল একজন কনস্টেবল। স্তূপটার মাঝামাঝি জায়গার একটা খড়ের আঁটি একটু নড়ে উঠল যেন! কনস্টেবলটি ছুটে গিয়ে

বড়ো দারোগাকে বলল—'স্যার, মনে হয় এই খড়ের গাদার মধ্যে মানুষ লুকিয়ে আছে।'

দারোগা খড়ের গাদার পাশে এসে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করলেন। কিছুই বোঝা গেলো না। তবু তিনি গলা চড়িয়ে বললেন—'ভেতরে কে আছো, বেরিয়ে এসো।' মিনিট খানেক অপেক্ষা ক'রে তিনি আবার বললেন—'ভেতরে কে আছো, বেরিয়ে এসো। না হ'লে আগুন ধরিয়ে দেবো।'

কিন্তু খড়ের গাদাটা যেমন নিশ্চুপ হয়ে পড়ে ছিল, তেমনই পড়ে রইল।

দারোগা হুকুম দিলেন—'খড়ে আগুন লাগাও।'

কনস্টেবলেরা এগিয়ে এসে দেশলাই জ্বেলে খড়ের গাদার চারপাশ থেকে আগুন ধরিয়ে দিলো।

শুকনো উলুখড়। দেখতে দেখতে জ্বলে উঠল দাউ দাউ ক'রে। আগুনের লেলিহান শিখা বিশাল তেঁতুলগাছটার প্রায় মাথায় মাথায় পৌঁছে লক্ লক্ করতে লাগল। কিন্তু উলুখড়ের গাদা থেকে কারো কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। নিঃশব্দে শুধু খড়গুলো পুড়তে লাগল।

হঠাৎ সেই দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে-থাকা খড়গুলোকে দুই হাতে ঠেলে সরিয়ে আগুনের মধ্যে উঠে দাঁড়াল একটা মনুষ্য-মূর্তি। খড়ের গাদা থেকে এক লাফ দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। কিন্তু তারও সর্বাঙ্গ তখন জ্বলছে। গায়ের সঙ্গে সাপটে ধরা রয়েছে একটা বস্তা। বস্তাটাও জ্বলছে। বস্তার মধ্য থেকে কাগজ-পোড়া গন্ধ উঠছে। সেই জ্বলন্ত মনুষ্য-মূর্তিটা এবার বিকট চীৎকার করতে করতে ছুটল পুকুরের জলের দিকে। বস্তার তলাটা পুড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল পোড়া কাগজের টুকরো। কিন্তু ওকে আর জল পর্যন্ত পৌঁছাতে হ'লো না। জ্বলন্ত দেহটা নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো পুকুরের পাড়ে।

বিস্ফারিত চোখ মেলে দৃশ্যটা দেখলেন বড়ো দারোগা। তারপর পুলিশ-বাহিনীর দিকে ফিরে মাথা নিচু ক'রে আদেশ দিলেন—'কুইক মার্চ।'

সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলে জড়ো হ'লো কৈলাসের বাড়ীর সামনে। গোল হয়ে বসল সবাই। পিছনে রইল কৈলাসের ভাঙা-চোরা বাড়ীটা। আর তাদের মাঝখানে রইল ধনুর আধ-পোড়া মৃতদেহটা। কারো চোখে কোনো ভাষা নেই। নিঃশব্দে বোবা জন্তুর মতো সবাই তাকিয়ে রইল অন্ধকারের দিকে। সকলেরই মনের মধ্যে এখন শুধু একটিই মানুষ ঘুরছে। সে হ'লো ধনু। ধনু পাগল—। কৈলাসের বাড়ীতে পুলিশ ঢোকার আগেই কখন যে পাগলটা সত্যপ্রসাদের ঘরে ঢুকেছিল, তা কেউই টের পায়নি। তারপর কাগজের বস্তাটা নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়েছিল। পাগলের বিচিত্র খেয়াল!

সকলের থেকে একটু দূরে অন্ধকারে চুপচাপ বসে ছিলেন সত্যপ্রসাদ! চোখের পাতা দু'টো তাঁর বারবার ভিজে উঠছে। বিলভাসানে আসার পরের ঘটনাগুলো একের পর এক মনে পড়ছে। বদ্ধ পাগল ছিল এই ধনু। একদিন একে দেখে কী ভয়ই না তিনি পেয়েছিলেন! তারপর এই বদ্ধ পাগলটাই আস্তে আস্তে তাঁর

বশ মেনেছিল। কতদিন পায়ের কাছে এসে ব'সে থাকত চুপচাপ। আবার কখনো পাগলামি শুরু করত। সেই ধনু আজ আর নেই! কাগজের বস্তাটা খাটের নিচে রাখার সময় ধনু সেখানে ছিল। কথাবার্তাও শুনেছিল। তাহলে কি সত্য-প্রসাদকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই ধনু কাগজের বস্তাটা নিয়ে খড়ের গাদায় লুকিয়ে ছিল? তাহলে কি ধনু পাগল নয়? সে কি সব কথা বুঝতে পারত? ইচ্ছে ক'রেই কি সে পাগল সেজে থাকত? কিন্তু তার আচার-আচরণ দেখে কোনোদিনই তো তা মনে হয়নি। একটা বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া তাকে আর কিছুই ভাবা যায় না। সত্যপ্রসাদ ধনুর আজকের এই আচরণের কোনো সঙ্গতিই খুজে পেলেন না। শুধু এই মহৎ-প্রাণ পাগলটির উদ্দেশে মাথা নিচু ক'রে নিঃশব্দে চোখের জলে শ্রদ্ধা জানালেন।

গভীর রাত্রে চাষীরা ধনুর শবদেহটা নিয়ে গেলো খাল-পাড়ের শ্মশানে। চিতা সাজিয়ে দেহটাকে তুলে দিলো তার উপর। শরীরটা তো আগেই অর্ধেক পোড়া ছিল। বাকিটাও পুড়ে ছাই হ'লো। ধনুর শ্মশান-বন্ধুরা সেই ছাই মুঠো মুঠো ক'রে তুলে নিলো। বড়ো ক'রে টিপ পরল কপালে। বিলভাসানের অমর শহিদ ধনু পাগলের চিতার ছাই কপালে মেখে তারা নতুনতর সংগ্রামের জন্য শপথ নিলো।

॥ চব্বিশ ॥

বিলভাসানে তেভাগা-আন্দোলন যখন চরম আকার ধারণ করে, তখন জোত-দার এবং পুলিশ সংঘবদ্ধভাবে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু এ-ছাড়াও আরো একটি বাধা এই তেভাগা-আন্দোলনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। এটি খুব সরাসরি ভাবে উপস্থিত না হ'লেও এর প্রভাব কিছু কম ছিল না।

এই বাধাটা এসেছিল শহরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছ থেকে। নড়াইল, বাসুন্দে, যশোহর প্রভৃতি শহর অঞ্চলের বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্তরা অনেকে বিলভাসানে চাষের জমি কিনেছিলেন। নিজেদের হাতে লাঙল ধরার কোনো প্রশ্নই এ'দের ওঠে না। এ'রা বিলভাসানের চাষীদের দিয়ে জমি বর্গাচাষ করাতেন। এ'দের জোতদার বললে ভুল হবে। এ'দের মধ্যে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কেরানী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শহর-জীবী ব্যক্তিরাই প্রধান। তাঁদের মুখ্য জীবিকার সঙ্গে গ্রামের এই জমির ফসল ছিল একটি উপরি আয়। এই উপরি আয়ের লোভেই তাঁরা কিছু টাকা ক্ষেত-জমিতে লগ্নি করেছিলেন। বছরে একবার শুধু ফসল কাটার মরসুমে তাঁরা বিলভাসানে আসতেন এবং বর্গাদারদের কাছ থেকে ফসলের আধা-ভাগ সংগ্রহ করতেন।

এ'রা প্রথম দিকে চাষীদের আন্দোলনকে তেমন গুরুত্ব দেননি। বরং কিছুটা সহানুভূতিশীলই ছিলেন। কিন্তু যখন চাষীরা সত্যি-সত্যিই তেভাগা কার্যকরী করতে শুরু করল, আধা ভাগের পরিবর্তে এক তৃতীয়াংশ ফসল নেবার প্রশ্ন উঠল,

তখন এঁদের মধ্যে গড়ে উঠল বিরূপ মনোভাব। চাষীদের দাবি ন্যায়-সঙ্গত জেনেও নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা ক'রে তেভাগা-আন্দোলনের বিরোধিতা করতে লাগলেন। 'মধ্যবিত্ত বিপন্ন'—এই ধরনের একটা ধুয়ো ছড়িয়ে পড়ল এঁদের মধ্যে। এঁরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

এই শহরবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা জনমত গঠন ক'রে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে প্রভাবিত ক'রে এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি ক'রে হতভাগা চাষীদের ন্যায্য দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করাতে সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু তা করলেন না তাঁরা। বরং উলটে নিজেদের স্বার্থরক্ষার কথা ভেবে চাষীদের তেভাগা-আন্দোলন কীভাবে নিরস্ত করা যায়, সে-বিষয়ে সচেষ্ট হলেন।

'কৃষক-সভা'র কিছু কিছু মধ্যবিত্ত নেতার মধ্যেও এ-সময় পিছুটান লক্ষ করা গেলো। ফলে বিলভাসান ও তাঁর আশেপাশের প্রকৃত জোতদার এবং পুলিশের পক্ষে তেভাগা-আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিঘাত হানতে বিলম্ব ঘটল না।

গত বছর বিলভাসানের চাষীরা বর্গাজমির ধান কেটে জমির মালিকদের তাঁদের অংশ নিয়ে নেবার জন্য খবর পাঠিয়েছিল। স্থানীয় বা বাইরের জোতদার যারা, তারা চাষীদের এই তেভাগার দাবি মানেনি। ফলে তাদের অংশের ফসলও নেয়নি। চাষীরা ধর্মগোলা স্থাপন করেছিল এবং জোতদারদের ভাগের ধান সেখানে সংরক্ষিত ক'রে রেখেছিল। জোতদারদের বারবার খবর পাঠানোর পরও কিন্তু তারা কেউই ধান নিতে আসেনি। চাষীরা ছ'মাস অপেক্ষা করেছিল। তারপর ধর্মগোলার ধান খয়রাতি সাহায্য হিসেবে বিলি ক'রে দিয়েছিল দরিদ্র কৃষক এবং ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে।

তবে গত বছর জোতদাররা ধানের ভাগ নিতে না এলেও জমির মালিক অন্যান্য শহরবাসী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা অনেকেই তাঁদের অংশের ধান নিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ নিতে মনে মনে তাঁদের আপত্তি ছিল। কিন্তু এবারে খবর দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কেউই তাঁদের ফসলের ভাগ নিতে এলেন না। তেভাগার দাবি নস্যাৎ করার জন্য জোতদারদের মতো তাঁরাও তাঁদের ফসলের অংশ বয়কট করলেন।

ব্যাপক পুলিশী সন্ত্রাসে বিলভাসানের চাষীরা এবার কিছুটা বিপর্যস্ত, দিশে-হারা হয়ে পড়েছিল। ফলে এবার আর তারা ধর্মগোলা স্থাপনের পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারল না। জোতদার এবং পুলিশের আক্রমণ এড়িয়ে তারা বিভিন্ন বর্গাচাষের জমি থেকে যে ধান কেটে তুলল, আঁটি হিসেবে ক্ষেতে ক্ষেতেই তা তিনভাগ ক'রে ফেলল। তারপর জোতদার বা জমির মালিকের এক ভাগ ক্ষেতে ফেলে রেখে বাকি দুই ভাগ নিয়ে তুলতে লাগল বর্গাচাষীর খোলেনে। আর কোনো উপায় ছিল না তাদের এছাড়া।

কৈলাসের বাড়ী লুঠ এবং ধনু মারা যাবার ঘটনার পর পুলিশ ক'দিন একটু চুপচাপ ছিল। সেই সুযোগে বিলভাসানের চাষীরা আবার জোর কদমে ধান কাটার কাজ শুরু ক'রে দিলো। কৈলাসের বাড়ী লুঠ এবং ধনুর মৃত্যু তাদের মনে এক

সহিংস উত্তেজনার সঞ্চার ঘটিয়েছিল। ধান কাটার মধ্যে তার তীব্র প্রতিফলন ঘটল। দিনরাত পাগলের মতো ধান কাটতে লাগল তারা। অনিবার্য ফল হিসেবে পুলিশী হামলা শুরু হ'লো আবার। এবং ক্রমেই তা ব্যাপক আকার ধারণ করল।

সংগঠনের নেতাদের গ্রেফতার না করতে পারলে যে আন্দোলন খতম করা যাবে না, এটা বুঝেই পুলিশ এবার নেতাদের গ্রেফতার করার দিকেই বেশী মনোযোগী হলো। সত্যপ্রসাদ তো বটেই, বিলভাসানের অন্যান্য বহিরাগত নেতাদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ বিলভাসানের চাষীদের বাড়ী চ'ষে বেড়াতে লাগল।

পুলিশের আগমনের সম্ভাবনা-মাত্রই এখানে সেখানে লুকিয়ে পড়ে জোয়ান চাষীরা। বাড়ীতে বুড়ো-ধুড়ো যে সব চাষী থাকে, পুলিশ তাদের গালি-গালাজ করে। কখনো মার-ধোর দেয়। নেতাদের ধরিয়ে না দিলে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে ব'লে শাসায়। সুতরাং 'কৃষক-সভা'র সংগঠনের কাজে যে সব নেতা বিলভাসানে ঘুরে বেড়াতেন, তাদেরও এখন অধিকতর নিয়ন্ত্রিতভাবে চলাফেরা করতে হচ্ছে। আগে যখন ইচ্ছে, বিলভাসানে এসে হাজির হতেন তাঁরা। এখন আর তা সম্ভব হয় না। বিলভাসানের স্থানীয় কৃষক-কর্মীদের মারফত তাঁদের নির্দেশাদি পৌঁছে দিতে হয় সাধারণ কৃষকদের কাছে। কখনো বিলভাসানে নেতাদের কোনো গোপন বৈঠক করতে হ'লে অত্যন্ত সাবধানতা এবং সতর্ক প্রহরার মধ্যে তা সম্পন্ন করতে হয়।

এই রকমই একটি গোপন বৈঠক বসেছিল সেদিন মহিলা-সমিতির বিশিষ্ট কর্মী ফুলমতির ঘরে। বাঁকপুর গ্রামে তো বটেই, আশেপাশের অন্যান্য গ্রামেও সতর্ক পাহারা থাকল। বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা এলেন মিটিং-এ। বিলভাসানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হ'লো। পুলিশকে সরাসরি বাধা না দিয়ে আত্মগোপন ক'রে যতটা পারা যায় ধান কেটে বর্গাচাষীর খোলেনে তোলার নীতিই গৃহীত হ'লো নতুন ক'রে।

গভীর রাত পর্যন্ত মিটিং চলল। মিটিং শেষে সশস্ত্র কৃষক-কর্মীরা সতর্ক প্রহরায় সত্যপ্রসাদ সহ অন্যান্য নেতাদের বিলভাসানের বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিলো। কিন্তু নিখিল রায় যেতে পারলেন না। অসুস্থ হয়ে পড়লেন হঠাৎ। ক'দিন বিস্তর ঘোরাঘুরি করেছেন। লোহার মতো মজবুত শরীর তাঁর। কিন্তু কীভাবে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে বেদম জ্বর এসে গেলো। অগত্যা তাঁকে ফুলমতির ঘরে লুকিয়ে রাখা হ'লো কাঁথা-কাপড় চাপা দিয়ে।

বিলভাসানের চাষীরা যেমন সুসংগঠিত কৃষক-বাহিনী গড়ে তুলেছিল, নিজেদের নিরাপত্তার জন্য জোতদাররাও তেমনি কিছুদিন থেকে যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছিল পুলিশের আশ্রয়-পুষ্ট হয়ে জোতদাররা তেভাগা-আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করল। থানায় তাদের যাতায়াত বৃদ্ধি পেলো আরো। পুলিশকে তোয়াজ করার সর্ববিধ ব্যবস্থাই গ্রহণ করল। গ্রামে পুলিশ এলে জোতদাররা তাদের ঢালাও খানাপিনার ব্যবস্থা রাখে। খানাতল্লাশীর কাজে পুলিশ যখন বাড়ী বাড়ী ঘোরে, সব সময়েই সঙ্গে থাকে পুলিন রায়। কোন্ চাষী কী করে, কোন্‌টা কার বাড়ী—এসব খবর পুলিশকে সরবরাহ করে। কৃষকদের

মতো জোতদাররাও তাদের পেটোয়া লোক দিয়ে গুপ্তচর-বাহিনী গড়ে তুলেছে। চাষীদের কার্যকলাপ, গোপন মিটিং-এর সংবাদ, আজকাল প্রায়ই আগেভাগে পৌঁছে যায় জোতদারদের কানে।

ফুলমতির ঘরে সেদিন রাত্রে নেতাদের গোপন মিটিং-এর সংবাদও জানতে পারে জোতদাররা। কিন্তু অত রাত্রে আর পুলিশকে খবর দেওয়া সম্ভব হয়নি। জোতদাররা ভেবেছিল, নেতারা মিটিং শেষ ক'রে আবার রাতেই সবাই পালিয়ে গেছে এখান থেকে। কিন্তু নিখিল রায়ের বাঁকপুরে অবস্থানের সংবাদটা ভোর রাতেই ওরা জেনে ফেলে। ভোররাতে অন্ধকার থাকতে থাকতে লোকজন কাক-পক্ষী জাগবার আগেই নিখিল গাড়ু হাতে প্রাতঃকৃত্য সারার জন্য মাঠে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় জোতদারদের একজন লোকের চোখে পড়ে যান। নিঃশব্দে সে খবরটা পৌঁছে দেয় অনন্তের কানে। অনন্ত কোনো রকম হৈ চৈ না ক'রে পুলিন রায়কে খবর দিয়ে আনায়। তারপর দু'জনে থানায় গিয়ে সংবাদটা জানায় বড়ো দারোগাকে।

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই বিরাট পুলিশ-বাহিনী নিয়ে বড়ো দারোগা স্বয়ং এসে হাজির হলেন বাঁকপুরে। হঠাৎ এভাবে পুলিশের আগমনের জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। তাড়াহুড়ো ক'রে যে যেখানে পারল আত্মগোপন করল। বড়ো দারোগা বাঁকপুরে এসে প্রথমেই গ্রামের চারপাশে দু'জন ক'রে সশস্ত্র কনস্টেবল মোতায়েন করলেন পাহারা দেবার জন্য। গ্রাম থেকে যাতে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে। নিখিল রায়কে গ্রেপ্তার করার জন্য আজ তিনি দৃঢ়-সংকল্প।

গ্রামের চারপাশে যথাযথ পাহারার ব্যবস্থা ক'রে এবার বড়ো দারোগা চিরুনী-অপারেশন চালালেন। বাড়ী বাড়ী ঘুরে ব্যাপক তল্লাশী শুরু হ'লো। পুলিন রায় যথারীতি সঙ্গে থেকে দারোগাকে অন্ধি-সন্ধির খবর দিতে থাকল। পূবে-পশ্চিমে লম্বাটে গ্রাম বাঁকপুর। পশ্চিমপাড়া থেকে পুলিশ একটু একটু ক'রে এগোতে থাকল পূব পাড়ার দিকে।

জ্বরের ঘোরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে আচ্ছন্নের মতো পড়ে ছিলেন নিখিল রায়। স্বাভাবিক অবস্থায় এতটা অসতর্ক তিনি কখনই থাকতেন না। বহুবার তিনি পুলিশ-বেষ্টনীর মধ্যে পড়েও পুলিশকে ধোকা দিয়ে পালিয়ে গেছেন। উত্তর বঙ্গের চাষীদের মধ্যে মিশে গিয়ে কয়েকবার পুলিশকে আক্রমণ করার নেতৃত্বও দিয়েছেন। কিন্তু এখন প্রবল জ্বরের তাড়সে স্থান-কাল-অবস্থা কিছুই খেয়াল ছিল না তাঁর।

ফুলমতির বাড়ীটা বাঁকপুর গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এখানে এসে হাজির হবে! ঠা ঠা করা ফাঁকা ভিটে। পরপর কয়েকখানা ঘর মাত্র। এখানে নিখিলকে কিছুতেই লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। পুলিশ আসা মাত্রই তাঁকে ধরা পড়ে যেতে হবে। ভীষণ চিন্তায় পড়ল ফুলমতি। এখন উপায়? পাহারাদার ছেলেরাও এখন কেউ কাছে নেই। পুলিশের কথা শুনে সবাই গা-ঢাকা দিয়েছে। নিখিল সুস্থ থাকলে ওরা এতক্ষণে ওঁকে কোনোদিকে সরিয়ে ফেলতে পারত। কিন্তু এখন নিখিল এখানে থাকার অর্থই হ'লো, নিশ্চিত পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া।

ফুলমতি ঘরে গিয়ে নিখিলের গায়ে হাত দিয়ে দেখল, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবু ও'কে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে বলল—'নিখিলবাবু, আপনারে এবার উঠতি হবে।'

নিখিল আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ফুলমতির দিকে তাকালেন। ফুলমতি সংক্ষেপে পুলিশের বৃত্তান্ত জানাল। উঠে দাঁড়ালেন নিখিল। পা টলমল করছে। জিজ্ঞাসা করলেন—'আমি এখন কোথায় যাব ফুলমতিদি?'

ফুলমতি বলল—'এখানে থাক্‌লি আপনি ধরা প'ড়ে যাবেন। পূব-পাড়ায় যতীনদের বাড়ী চলে যান। ওদের বাড়ী অনেক গাছপালা জঙ্গল-পাতি আছে। ওখানে হয়ত লুকোয়ে থাক্‌তি পারবেন।'

অগত্যা এলোমেলো পা ফেলে, জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তায় নেমে এলেন নিখিল। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় পৌঁছে গেলেন যতীনদের বাড়ী। বাঁকপুর গ্রামের পূব-প্রান্তে একেবারে শেষ বাড়ীটা যতীনদের। ওদের বাড়ীর পর থেকেই টানা বিল-অঞ্চল। ক্ষেত-জমি। মাইল দু'য়েক পেরিয়ে ডানদিকে আবার বিলাতিতে গ্রামের শুরু। যতীনদের বাঁশঝাড়টার পাশ কাটিয়ে আমতলা দিয়ে উঁচু ভিটের উপর উঠে গেলেন নিখিল।

বাড়ীর পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিল যতীনের বাবা নয়নচাঁদ। নিখিলকে দেখে ভীষণ উদ্‌ব্যস্ত হয়ে পড়ল নয়নচাঁদ। যতীন এবং ওর ভাই—কেউই বাড়ী নেই। গ্রামে পুলিশী-তল্লাশ হচ্ছে শুনে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে আছে। বাড়ীতে যতীনের বউ ছেলে আর নয়নচাঁদ ছাড়া আর কেউ নেই। এ-রকম ঘটনা তো আজকাল মাঝে মাঝেই ঘটছে। পুলিশ আসে। খানিক হম্বিতম্বি ক'রে আবার চলে যায়। এসব আজকাল অভ্যাস হয়ে গেছে সকলের। পুলিশ আসছে শুনে নয়নচাঁদও তাই তেমন কিছু গা করেনি। কিন্তু হঠাৎ এই অবস্থায় নিখিলকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো নয়নচাঁদ। নিখিলকে পেলে পুলিশ যে তাঁকে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে!

যতীনের সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা আছে নিখিলের। সেই সূত্রে যতীনের বাবা নয়নচাঁদও তাঁর অপরিচিত নয়। নয়নচাঁদকে দেখে নিখিল এগিয়ে এলেন। একে প্রবল জ্বর, তার উপরে এতটা হেঁটে এসেছেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। এগিয়ে এসে নয়নচাঁদের দু'টো হাত জড়িয়ে ধরলেন। বিস্ময়ে বিমূঢ় নয়নচাঁদ বলল—'বাবু, আপনি?'

—'আমাকে বাঁচাও নয়নচাঁদ! আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। আমাকে যা হোক একটা গোপন জায়গায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা ক'রে দাও।'

ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো নয়নচাঁদ। বাড়ীতে যতীন নেই যে ভেবে-বুঝে একটা কিছু করবে। বউমাকে বললে হয়ত ভয় পেয়ে যাবে। নিখিলের মতো একজন নেতাকে বাড়ীতে লুকিয়ে রেখে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে যে রেহাই থাকবে না, এ তো নিশ্চিত জানা কথা। কিন্তু এখন এই জ্বরো-গা বাবু-মানুষটাকে বাড়ী থেকে বের ক'রেই বা দেবে কীভাবে নয়নচাঁদ! সে যে ভীষণ অধর্ম হবে। ওদিকে পুলিশ যে প্রায় এসে পড়ল!

নয়নচাঁদের বাড়ীটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সারা ভিটেটা নানা রকম গাছ-

পালায় ভর্তি। ভিটের একেবারে পূবপাশে বিশাল একটা বেলগাছ। তার তলায় নানা রকম আগাছা ঝোপ-ঝাড়ের জঙ্গল। তার পাশ ঘেঁষে ছোটো একখানা একচালা পোড়ো ঘর। চারপাশ বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঘরখানার একদিক বিস্তর মাটির হাঁড়ি-কলসী দিয়ে ভর্তি। এগুলো সরমার সঞ্চয়। বর্ষাকালে কুমোরেরা যখন নৌকা বোঝাই ক'রে হাঁড়ি-কলসী বিক্রি করতে আসে, তখন সরমা তাদের কাছ থেকে সারা বছরের প্রয়োজনীয় হাঁড়ি কলসী সরা ইত্যাদি কিনে এখানে সঞ্চয় ক'রে রাখে। ঘরখানার আর একটা পাশে রাজ্যের শুকনো ঘুঁটে গোবর গাদা দিয়ে রাখা। সরমার রান্নাঘরের জ্বালানির উপকরণ। বেলগাছের তলায় জানালা-হীন এই ঘরটায় সব সময়েই জমা হয়ে থাকে একটা ভ্যাপসা অন্ধকার।

একটুখানি ভাবল নয়নচাঁদ। তারপর নিখিলের হাত ধ'রে বলল—'আমার সাথে আসেন বাবু!'

নিখিলকে নিয়ে এসে হাজির হ'লো ঐ পোড়ো ঘরটায়। হাঁড়ি-কুড়িগুলো একটু সরিয়ে কোনোমতে একটা মাদুর বিছিয়ে দিলো। নিখিল হাত পা গুটিয়ে সেই স্বল্প-পরিসর জায়গায় কোনোভাবে একটু শুয়ে পড়লেন। সরমার চোখ এড়িয়ে খান দুই কাঁথা এনে নিখিলকে চাপা দিয়ে রাখল নয়নচাঁদ। আরো একটা ছেঁড়া মাদুর এনে চাপা দিলো। কেউ যাতে বুঝতে না পারে। তারপর সেখান থেকে ভিটের অন্য দিকে চলে গেলো নয়নচাঁদ।

কী একটা কাজে সব্যকে কোলে নিয়ে এদিকে এসেছিল সরমা। হঠাৎ পোড়ো ঘরটার ভিতর থেকে অস্ফুট একটা কাতরানির শব্দ ভেসে এলো। কিসের শব্দ বুঝতে না পেরে সরমা বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ীতে কেউ নেই। একটু ভয়-ভয়ও যে না করছে, তা নয়। গাছপালার অন্ধকারে এদিকটায় সব সময়েই কেমন যেন একটা ছমছমে ভাব। ওদিকে আবার পুলিশ আসছে। কাতরানির শব্দটা আবার কানে এলো সরমার।

অগত্যা ভয়-ডর ভুলে সব্যকে কোল থেকে নামিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে ঘরটার দিকে উঁকি মারল। প্রথমে অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ল না। ঘরের ভিতরের অন্ধকারটা একটু চোখ সহ্য হতেই সরমা দেখল, হাঁড়ি-কলসীর ফাঁকে কী একটা জিনিস কাঁথা আর মাদুর চাপা দেওয়া রয়েছে। ভালো ক'রে লক্ষ করতেই একটা মানুষের মাথা চোখে পড়ল। সর্বনাশ!—এ যে নিখিল রায়!

বাঁশের বেড়ার সঙ্কীর্ণ দরজাটা ঠেলে দ্রুত পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলো সরমা। নিখিলের মাথার কাছে বসল। এক নজরেই বোঝা যায়, প্রবল জ্বর এসেছে নিখিলের। মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে অস্ফুট কাতরানির শব্দ বের হচ্ছে।

নিখিলের কপালের উপর হাত রেখে সরমা ডাকল—'নিখিলদা!'—আরো বার দুয়েক ডাকতেই সাড়া দিলেন নিখিল। সরমাকে দেখে একটুখানি সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলেন।

বিস্মিত সরমা জিজ্ঞাসা করল—'আপনি এখানে কিভাবে আসলেন নিখিলদা?'

ধুঁকতে ধুঁকতে নিখিল বললেন—'কাল মিটিং-এর পর আমি ফিরে যেতে পারিনি। জ্বর এলো। ফুলমতিদির ঘরে ছিলাম। শুনলাম পুলিশ এসেছে। সেখান থেকে তোমাদের বাড়ী এসেছি। নয়নচাঁদ আমাকে এখানে লুকিয়ে রেখেছে। এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।'

হাত পা যেন অবশ হয়ে এলো সরমার। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এসে পড়বে। নিখিল রায়কে এখানে খুঁজে পেলে পুলিশ আর কিছু বাকি রাখবে না।

সরমা বলল—'কিন্তু এভাবে তো আপনি বাঁচ্‌তি পারবেন না। এখানে থাক্‌লি পুলিশ আপনারে খুঁজে বার করবেই।'

আবার শুয়ে পড়লেন নিখিল। চোখ বুজে বললেন—'তাহলে তুমি কি করতে বলো সরমা ?'

দ্রুতপায়ে সরমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সব্যকে কোলে নিয়ে আতি-পাতি ক'রে খুঁজতে লাগল শ্বশুরকে। কোথায় যে কোন্‌ গাছতলায় চুপ ক'রে বসে আছে কে জানে! কি করবে এখন সরমা!

হঠাৎ দেখল, সামনের বড়ো রাস্তা দিয়ে সৌরভী যাচ্ছে। ওর ভয়-ডর একটু কম। পুলিশ আসছে শুনেও রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল সৌরভীকে। সৌরভী এসে একপলক সরমাকে দেখেই বলল—'কি হইছে বৌদি, তোমার মুখ-চোখ অমন দ্যাখাচ্ছে ক্যানো ?'

—'সব্বোনাশ হইছে সৌরভী। নিখিলদার জ্বর আইচে। বাবা ওনারে আমাদের পিছনের ঘরে লুকোয়ে রাখিছে।'

সৌরভীও খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল—'বলো কি বৌদি ? পুলিশ বাড়ী বাড়ী ঘুরতিচে। আর এট্টু পরেই তো তোমাদের বাড়ী আসবে।'

সরমা বলল—'পুলিশ আসার আগেই এই দিক দিয়ে নিখিলদারে বা'র ক'রে দিলি কেমন হয় ?'

—'তুমি কি পাগল হইছো বৌদি ? ঐ দিক তাকায়ে দ্যাখো।'

সৌরভীর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে তাকিয়ে দেখে সরমার হাত-পা যেন আরো ঠাণ্ডা হয়ে এলো! সামনের বড়ো রাস্তাটা ধ'রে বাঁ দিকে একটু এগিয়ে ফাঁকা ক্ষেতের মধ্যে একটা পোড়ো জমি। শ্যাওড়া, কচা ইত্যাদি নানা আগাছায় ভর্তি। একপাশে বিশাল একটা কুলগাছ। তার তলায় একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপর দু'জন বন্দুকধারী পুলিশ ব'সে। ওরা এ-পাশটা পাহারা দিচ্ছে। এদিক থেকে কেউ পালাতে গেলেই চোখে পড়বে ওদের।

সরমা হতাশ গলায় বলল—'তুই যা হয় কর সৌরভী! আমি আর কিছু ভাবতি পারতিছি না।'

সৌরভীও খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। তবু বলল—'ভয় পাইয়ে না বৌদি। দেখা যাক কি করা যায়। নিখিলদারে যেমন ক'রে হোক, বাঁচাতিই হবে।'

সামনের রাস্তা দিয়ে পাশের বাড়ীর বছর নয়-দশের একটা ফ্রক-জামা পরা মেয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডাকল সৌরভী। মেয়েটা কাছে এসে দাঁড়াতেই সৌরভী

বলল—'তোমরা এখানে দাঁড়াও বৌদি। আমি ডাক দিলিই আসবা। আর ঘরের থেকে তোমার একটা শাড়ী নিচ্ছি।'

দ্রুতপায়ে চলে গেলো সৌরভী। সরমার একটা শাড়ী পোঁটলা পাকিয়ে বগল-দাবা ক'রে সন্তর্পণে গিয়ে ঢুকল পিছনের ঘরটায়। জায়গাটা আবিষ্কার ক'রেই নিখিলের মাথার কাছে গিয়ে বসল। আস্তে আস্তে বার কয়েক ডাকতেই সাড়া দিলেন নিখিল। চোখ মেলে তাকালেন। চোখ দু'টো জবাফুলের মতো লাল টক্‌টক করছে। তবে জ্বরটা বোধহয় ছেড়ে আসছে। ঘাম হচ্ছে।

সৌরভী কোনো রকম ভণিতা না ক'রেই বলল—'তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ান নিখিলদা। পুলিশ আস্‌তিছে। আপনারে এখনই এখান থেকে চলে যাতি হবে।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে নিখিল তাকিয়ে থাকল সৌরভীর মুখের দিকে। সৌরভী বলল—'তাড়াতাড়ি ওঠেন। দেরি করলি বিপদ হবে। এই শাড়ীডা মেয়েদের মতো ক'রে প'রে ফেলেন।'

অগত্যা নিখিল উঠে দাঁড়ালেন। জ্বর একটু কমের দিকে গেলেও পা টলছে। হাত বাড়িয়ে সৌরভীর হাত থেকে শাড়ীটা নিলেন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—'কিভাবে শাড়ী পরতে হয়, আমি তো জানিনা সৌরভী?'

সৌরভী একপলক তাকিয়ে থাকল নিখিলের মুখের দিকে। তারপর একটানে খুলে ফেলল নিখিলের পরনের ধুতিটা। নিপুণ হাতে শাড়ীটা নিখিলকে পরিয়ে দিয়ে একটা ঘোমটা দিয়ে দিলো মাথায়।

জ্বরের ঘোরের মধ্যেও সৌরভীর এই কর্ম-তৎপরতায় মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না নিখিল। এমনিতে নিখিল রায় সংযমী, চরিত্রবান পুরুষ। স্ত্রীলোক সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র কোনো আকর্ষণ নেই। তাঁর সব ভাবনা-চিন্তা রাজনীতিকে কেন্দ্র ক'রেই। কিন্তু এই মুহূর্তে কী যে হ'লো নিখিলের! হয়ত জ্বরের প্রবল তাড়নায় তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে যে অবরুদ্ধ অবসাদের সৃষ্টি হয়েছিল, একটা সাময়িক উত্তেজনাকে কেন্দ্র ক'রে তা প্রশমিত হতে চাইল। টকটকে লাল দু'টি চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে নিখিল একপলক তাকিয়ে থাকলেন সৌরভীর দিকে। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে সৌরভীকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে। জ্বর-তপ্ত ওষ্ঠ দু'টো বার-কয়েক ঘষটালেন সৌরভীর ঠোঁটে আর গালে। আস্তে আস্তে মাথাটা নামিয়ে রাখলেন সৌরভীর বুকের উপর।

সম্মোহিতের মতো দু'জনের কেটে গেলো কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর নিখিল মাথা তুলে বললেন—'জানিনা, আজকে কি হবে! পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে পারব কি না! তবে তোমাকে আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না সৌরভী!'

সৌরভী সন্তর্পণে নিখিলের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিলো নিজেকে। ধীর শান্ত গলায় বলল—'ওসব কথা এখন থাক্ নিখিলদা। আপনার সামনে এখন ভীষণ বিপদ। তাড়াতাড়ি বাইরে আসেন।'

সৌরভীকে অনুসরণ ক'রে বাইরে এসে দাঁড়ালেন নিখিল। সরমা আর সেই ছোটো মেয়েটাও ওদের দেখে তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এলো। শাড়ী-পরা ঘোমটা-দেওয়া নিখিলকে দেখে সরমা বিস্মিত হ'লো। হঠাৎ দেখে চেনা দায়।

সৌরভী ঘর থেকে দু'টো মেটে কলসী নিয়ে এলো। মেয়েটাকে একটা কলসী ধরিয়ে দিয়ে বলল—'নে, এটা কাঁখে নে। ওনার সঙ্গে যা।'

তারপর নিখিলের দিকে ফিরে বলল—'আপনিও এটা কাঁখে নেন। মাঠ ভা'ঙ্গে সোজা চলে যাবেন বিলাতিতের গঙ্গাপদর বাড়ী। গঙ্গা-কাকা আপনার থাকার একটা জায়গা ক'রে দিতি পারবে। মনে রাখবেন, আপনি হলেন বিলাতিতে গ্রামের একটা বউ। মেয়েরে সাথে নিয়ে বাঁকপুরের স্কুলের কল থেকে জল নিয়ে যাচ্ছেন। আশে-পাশের গ্রামের মেয়ে-বউরা বাঁকপুর গ্রামের কল থেকে জল নিতি আসে। আর কোনো গ্রামে কল নেই। মুখোমুখি না পড়লি আপনারে কেউ চিন্‌তি পারবে না। লোকজন এড়ায়ে মাঠ ভা'ঙ্গে যাবেন।'

একটু থেমে রাস্তার পাশের পোড়ো-ভিটেটার দিকে তাকিয়ে বলল—'আর শোনেন, ঐ পোড়ো ভিটেয় দুইজন পুলিশ ব'সে পাহারা দেচ্ছে। আমি ওদের নজর অন্য দিক আটকায়ে রাখবো। আপনি সেই ফাঁকে বা'রোয়ে পড়বেন। কোনো দিকি তাকাবেন না। সোজা চলে যাবেন মাথা নিচে ক'রে।

কলসী কাঁখে নিয়ে মহিলা-বেশী নিখিল বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ভয়ে ভাবনায় উত্তেজনায় সরমাও তখন হতচকিত। সৌরভী কাল-বিলম্ব না ক'রে নেমে গেলো ভিটে থেকে। রাস্তা ধ'রে দ্রুতপায়ে হেঁটে গেলো পোড়ো ভিটেটার দিকে।

॥ পঁচিশ ॥

পোড়ো ভিটের একপাশে বিশাল একটা কুলগাছ। তার নিচে মস্ত একখানা কাঠের গুঁড়ি। তার উপর বন্দুকধারী পুলিশ দু'জন ব'সে কথাবার্তা বলছিল। সতর্ক চোখে মাঝে মাঝেই নজর ফেরাচ্ছিল চারিদিকে। কতক্ষণ আর এ-ভাবে পাহারা দিতে হবে কে জানে! শীতের দুপুরের মিঠে রোদ। মাথার উপর কুলগাছের নরম ছায়া। বড়ো বড়ো কাঁচা-পাকা টোপা কুলে ডাল ভর্তি। কুলের ভারে ডালগুলো নিচের দিকে নেমে এসেছে। শীতের মন্থর মধ্যাহ্ন। ব'সে ব'সে পুলিশ দু'জনের কেমন যেন ঝিম পেয়ে আসছে।

হঠাৎ কুলগাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে পুলিশ দু'জনের সামনে ঢাই ক'রে মস্ত একটা ঢিল এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঝর ঝর ক'রে একগাদা কুল ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ওরা তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে উঠল। বন্দুক দু'টো আঁকড়ে ধ'রে 'কে—কে'—ব'লে চীৎকার ক'রে উঠল।

ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে এলো সৌরভী। আঁচলটা কোমরে পেঁচানো। উদ্ধত শরীরটা যেন আরো ধারালো হয়ে উঠেছে। সারা শরীরে একটা মাদক মোচড় দিয়ে পুলিশের সামনে এসে দাঁড়াল। গলায় সোহাগ ঢেলে বলল—'আমি গো পুলুস দাদারা—আমি! কুল পাড়্‌তিছি! কুল খাবা নাকি দুটো?'

পুলিশ দু'জন সৌরভীর দিকে তাকিয়ে থাকে অপলকে। ওদের চোখে কুটিল সন্দেহ। কোনো ফাঁদ-টাঁদ নয় তো এটা আবার! ফুলি সিঙ্গির অঞ্চল এটা। এখানকার মেয়েরাও বড়ো সাংঘাতিক। যে কোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটিয়ে বসতে পারে। পুলিশ দু'জন সতর্ক চোখে চারিদিক দেখে নিলো একবার। মেয়েটার পিছনে আর কোনো দলবল আছে কিনা পরখ করল। না, আর কেউ নেই। নিশ্চিন্ত!

পুলিশের সামনে রঙ্গ করতে করতে সৌরভী আড়চোখে একবার ডানদিকে তাকায়। কিছুটা দূরেই যতীনদের ভিটে বাড়ী। তারপরেই ধান-কাটা শূন্য ক্ষেত শীতের রোদে ধু ধু করছে। বিলেন ক্ষেত পার হয়ে অনেক দূরে আবছা দেখা যাচ্ছে বিলতিতে গ্রাম। সৌরভী লক্ষ করল, যতীনদের ভিটে বাড়ীর ওপাশ থেকে ঘোমটা মাথায় একটা বউ আর একটা ছোটো মেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দু'জনেরই কাঁখে কলসী। ক্ষেত ভেঙ্গে সোজা এগিয়ে চলেছে বিলতিতে গ্রামের দিকে।

এটা কোনো বিশেষভাবে চোখে পড়ার দৃশ্য নয়। বিলভাসানে এটা সাধারণ ব্যাপার। বিলভাসানের দশ-এগারোটা গ্রামের মধ্যে কোনো গ্রামেই টিউব-ওয়েল নেই। যে যার বাড়ীর সংলগ্ন পুকুর-ডোবার জল খায়। এখানকার একমাত্র টিউব-ওয়েল হ'লো বাঁকপুর গ্রামের স্কুলের টিউব-ওয়েল। স্কুলের ছাত্রেরা জল খায়। বিলভাসানের বিভিন্ন গ্রাম থেকেও মাঝে মাঝে মেয়ে-বউরা এসে এক এক কলসী খাবার জল নিয়ে যায়। এখানকার রাস্তা-ঘাটে প্রায়ই মেয়ে-বউদের কলসী কাঁখে দেখা যায়। কেউ জল আনতে যাচ্ছে। কেউ ফিরছে জল নিয়ে। সুতরাং যতীনদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যে বউ এবং মেয়েটা কলসী কাঁখে বেরিয়ে গেলো, তাদের নিয়ে কারো কোনো কৌতূহল হবার কথা নয়।

তবু সাবধান হ'লো সৌরভী। পুলিশ দু'জনের মুখ ওদিকেই ফেরানো। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ে গেলে ঝামেলা বাধাতে পারে। ওদের এদিকে ফেরানো দরকার।

শরীরে আর একটা মোচড় দিয়ে এদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সৌরভী বলল—'কি গো পুলুস দাদারা, কুল খাবা নাকি, বল্লে না?'

সৌরভীর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ দু'জনও ঘুরে দাঁড়াল এদিকে। ওদের একজন এবার শক্ত গলায় বলল—'কি চাও তুমি এখানে? কেন এখানে ঝামেলা করছ? ঘরে যাও।'

সৌরভী যেন ভীষণ অবাক হয়েছে। গালে হাত দিয়ে বলল—'ওঃ মা! সে কি কথা গো! তোমরা কি রাগ করলে নাকি গো পুলুস দাদারা! বল্‌লাম তো—কুল পাড়তি আইছি।'

ব'লেই আর একটা ঢিল কুড়িয়ে সৌরভী ছু'ড়ে দিলো কুল গাছের ডালে। আবার একগাদা কুল ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

নিচু হয়ে ঘুরে ঘুরে কুলগুলো কুড়োতে লাগল সৌরভী। অন্যমনস্ক হাতের চাপে কেমন ক'রে যেন সরে গেলো বুকের একপাশের কাপড়। গায়ে জামা নেই। সুগঠিত দু'টি বুকের একটি প্রায় অনাবৃত হয়ে গেলো। নিচু হয়ে সৌরভী

গভীর মনোযোগের সঙ্গে কুল কুড়োতে থাকে। আর আড়চোখে এক একবার দেখে নেয়, দূরের ক্ষেত পেরিয়ে ঘোমটা-পরা বউটা কতদূর পার হ'লো।

এদিকে পুলিশদের দৃষ্টি তখন আর কোনোদিকে ফিরছে না। তাদের লোভার্ত চোখ দু'টো আঠার মতো আটকে থাকল সৌরভীর অনাবৃত বুকটার উপর।

ধীরে ধীরে ঘোমটা-পরা বউ আর মেয়েটার অবয়ব মিলিয়ে গেলো ক্ষেত-প্রান্তরের গভীরে। সৌরভী এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। বুকের কাপড় সামলে আঁচলটা শক্ত ক'রে কোমরে জড়াল। আঁচলের কোণায় যে কুলগুলো কুড়িয়েছিল, সেগুলো নিয়ে ঝরঝর ক'রে ঢেলে দিলো পুলিশ দু'জনের সামনে। রহস্যময় একটু হাসি মিশিয়ে বলল—'খাও গো পুলুস দাদারা, কুল খাও! চুকো লাগ্‌লি এট্টু নুন মিশোয়ে খাইও।'

ব'লেই চকিতে পাশ ফিরে সৌরভী দ্রুত পায়ে উঠে এলো বড়ো রাস্তায়। থুক্ করে একদলা থুথু ফেলল মাটিতে। তারপর ছুট্ লাগাল সামনের দিকে। সোজা গ্রামের ভিতরে।

বিস্মিত পুলিশ দু'জন হতভম্ব হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওদিকে বাঁকপুরের পশ্চিমপাড়া থেকে বড়োদারোগা তাঁর পুলিশ-বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন পুব-পাড়ায়। বাড়ী বাড়ী চিরুনি অপারেশন চলছে। এক এক বাড়ীতে ঢুকছেন আর তল্লাশীর চূড়ান্ত করছেন। পুলিশেরা ঘর বাড়ীর সম্ভাব্য সব জায়গায় পরীক্ষা করছে আগাপাসতলা। কিন্তু কোনো বাড়ীতেই নিখিল রায়ের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। বড়োদারোগার মেজাজ সপ্তমে চড়ছে ক্রমেই। মুখ দিয়ে মাঝে মাঝেই অশ্রাব্য গালি-গালাজ বের হচ্ছে।

পুলিন রায় সব সময়েই থাকল বড়ো দারোগার পাশে পাশে। এক এক বাড়ীতে ঢুকে সে-বাড়ীর সুলুক-সন্ধান দিতে থাকল। কিন্তু পুলিনের মনেও এবার ভয় ঢুকেছে। নিখিল রায় তাদের গ্রামে লুকিয়ে আছে, বড়ো দারোগাবাবু গেলেই তাকে গ্রেফতার করতে পারবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই পুলিন বড়ো দারোগাকে সাত সকালে থানা থেকে টেনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন যদি নিখিলের কোনো হদিশ না পাওয়া যায়, তাহলে দারোগার সামনে মুখ দেখানো ভার হবে। উল্টে অপমানিত হওয়াও বিচিত্র নয়। সুতরাং বাঁকপুর গ্রামের পুব সীমানা যতই এগিয়ে আসতে থাকে, বুকের মধ্যে ততই ধুক-পুকানি শুরু হয় পুলিনের।

অবশেষে দারোগা তাঁর বাহিনী নিয়ে এসে হাজির হলেন যতীনদের বাড়ীর উঠোনে। পুলিন দারোগার কানে কানে বলল—'বড়োবাবু, এই হলো যতীন মাষ্টেরের বাড়ী। এ হচ্ছে ঐ দলের এক বড়ো চাঁই।'

দারোগা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'কোথায় সে যতীয়া না চুতিয়া। ধ'রে আনো তাকে।' —কিন্তু যতীনকে কোথায় পাওয়া যাবে? অগত্যা যতীনের বাবা বুড়ো নয়নচাঁদকে ধরে সামনে এনে দাঁড় করানো হ'লো। দারোগা আর এক হুঙ্কার দিলেন—'এখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্ হারামখোর!'

ওদিকে কনস্টেবলেরা সারা বাড়ী তছনছ ক'রে খুঁজতে শুরু করল। সামনের

ঘরগুলোর তল্লাশী সেরে হাজির হ'লো গিয়ে পিছনের বেলতলায় পোড়ো ঘরটায়। ঘরে ঢুকেই লাঠির ঘায়ে হাঁড়ি-কলসীগুলো ভেঙ্গে দিতে লাগল। হঠাৎ একজন কনস্টেবলের চোখে পড়ল জিনিসটা। লাঠির মাথায় বাধিয়ে উঁচু করতেই দেখা গেলো, পরিষ্কার ধপধপে একখানা ধুতি কাপড়। এখানে এ-রকম ধুতি কাপড় আসবে কোথা থেকে? ভালো ক'রে নজর করতেই কনস্টেবলের চোখে পড়ল আধ পোড়া একটা সিগারেটের টুকরো। রহস্যজনক ব্যাপার। বড়ো দারোগাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে আসা হ'লো। বুঝতে কারো বাকি রইল না যে, এখানেই লুকিয়ে ছিলেন নিখিল রায়।

পুলিন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। হাত পা নেড়ে উল্লসিত হয়ে বলল—'কইছিলাম না বড়োবাবু, ও শালা গেরামেই কোথাও লুকোয়ে আছে। এই হারামজাদা নয়নচাঁদ সব জানে। ওই-ই লুকোয়ে রাখিছিল। আপনারে আসৃতি দেখে কোন্‌দিকে সরায়ে দেছে।'

পোড়ো ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলেন দারোগা। কটমট ক'রে তাকালেন নয়নচাঁদের দিকে। হাতের মুঠো থেকে এইভাবে শিকার পালিয়ে যাবে? অসহ্য! দুরন্ত ক্রোধে দারোগা গরগর ক'রে উঠলেন—'এটাকে বাঁধ্ দড়ি দিয়ে।'

গোয়ালঘর থেকে একগাছা গোবুর দড়ি এনে একটা গাছের সঙ্গে শক্ত ক'রে বাঁধা হ'লো নয়নচাঁদকে। দারোগা হাতের লাঠিটা আস্ফালন ক'রে বললেন—'সে শুয়োরের বাচ্ছাটাকে কোথায় রেখেছিস্, জবাব দে।'

নয়নচাঁদ চুপ ক'রে থাকল।—'ওষুধ না পড়লে দেখছি কথা বার হবে না—' —দারোগার হাতের লাঠিটা ঠাই ঠাই ক'রে সজোরে গিয়ে পড়তে লাগল নয়নচাঁদের হাঁটুর উপর। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল নয়নচাঁদ।

দারোগা খিঁচিয়ে উঠলেন—'এখনো জবাব দে হারামজাদা, নইলে দাঁত মুখ সব ভেঙ্গে দেবো।'

যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে নয়নচাঁদ বলল—'আমি জানিনা বড়োবাবু, উনি ক'নে গেছেন।'

ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত বড়োদারোগার হাতের লাঠিটা এবার নয়নচাঁদের সর্বাঙ্গে সজোরে আছড়ে পড়তে লাগল। নয়নচাঁদ খানিকটা আর্তনাদ করল প্রথম দিকে। তারপর নেতিয়ে প'ড়ে থাকল।

সব্যকে কোলে নিয়ে পাগলের মতো ছুটে এলো সরমা। বড়ো দারোগার সামনে দাঁড়িয়ে বলল—'স্যার, বুড়ো মানুষটারে এভাবে মারতিছেন ক্যানো?'

বড়ো দারোগা লাঠি থামিয়ে কুৎসিত দৃষ্টিতে তাকালেন সরমার দিকে। পুলিনকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এটা আবার কে?'

পুলিনের বোধহয় এবার একটু চক্ষু-লজ্জায় বাধল। সরমাকে আস্তে আস্তে বলল—'তুমি ঘরে যাও বউমা! তুমি বউ মানুষ, তুমি এসবের মধ্যি থাকৃতি আ'সে না। ফল ভালো হবে না।'

বাধ্য হয়ে সরমা সরে গেলো। দারোগা আরো কয়েক ঘা লাগালেন নয়নচাঁদকে। নয়নচাঁদের তখন হত-চেতন অবস্থা। তার মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের

করা সম্ভব হ'লো না। খানিক বাদে ক্লান্ত বড়োদারোগা তার পুলিশ-বাহিনী নিয়ে ভিটে থেকে নেমে গেলেন। সেদিনের মতো ফিরে গেলেন থানায়।

কিন্তু এর পর থেকেই পুলিশী আক্রমণ তীব্র, ভয়াবহ আকার ধারণ করল। দু'এক দিন বাদে বাদেই পুলিশ বিলভাসানের এক এক গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। পুলিশ এবার মারমুখী হয়ে উঠল ভীষণভাবে। কথায় কথায় মারধোর শুরু হ'লো। মেয়েদের ইজ্জত নিয়েও শুরু হ'লো টানাটানি।

এখন থেকে বড়ো দারোগা যখনই আসেন, জীপে ক'রে আসেন। বিল অঞ্চল হলেও এখন শীতের শুকনো মাঠ-ঘাট। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে দ্রুত যেতে জীপেই সুবিধে। বিলভাসানের তেভাগা-আন্দোলনকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য দারোগা দৃঢ়-সংকল্প নিলেন। আর এ-কাজে তাঁর প্রধান শাগরেদ হয়ে উঠল পুলিন রায়। সারাক্ষণ পুলিন দারোগার পাশে পাশে ছায়ার মতো ঘুরতে লাগল। পুলিনের তৎপরতায় একে একে বাঁকপুরের রামপদ, পঞ্চানন, ভরত গ্রেফতার হ'লো। বিলভাসানের অন্যান্য গ্রাম থেকেও কৃষক-সমিতির বেশ কিছু সুদক্ষ কর্মী ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। সবাইকে নিয়ে আটকে রাখা হ'লো হাজতে। প্রচণ্ড অত্যাচার চলল। নেতাদের সন্ধান না জানানো পর্যন্ত তাদের মুক্তির আশা নেই।

বিলভাসানে তল্লাশী চালাতে এসে পুলিশ একটা নতুন কাজ আরম্ভ করল। কোনো বাড়ীতে জয়ঢাক দেখলেই তা ফুটো ক'রে দিতে লাগল। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই জয়ঢাক ছিল পুলিশের কাছে এক বিষম আতঙ্কের বস্তু। বিলভাসানে তাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠত শত শত জয়ঢাক। আর দলে দলে সশস্ত্র চাষীরা এসে ঘিরে ফেলত তাদের। সে স্মৃতি তো তাদের মন থেকে মোছেনি! তাই সুযোগ পেয়েই পুলিশ এবার এই আতঙ্কের বস্তুটাকে দেখামাত্রই নির্মমভাবে ফুটো ক'রে দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তল্লাশী চালিয়ে গোপন অস্ত্রেরও সন্ধান চলল।

পুলিশের সঙ্গে থেকে পুলিন এ সব ব্যাপারে তাদের সাহায্য ক'রে চলল। কৃষক-কর্মীদের লুকিয়ে থাকার জায়গা, তাদের গোপন গতিবিধি, সলাপরামর্শ—সব কিছুর সন্ধান পুলিন সরবরাহ করতে লাগল পুলিশের কাছে। যে সব বর্গা চাষীর উপর তার ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল, তাদের বাড়ীতে পুলিশ দিয়ে বেশী ক'রে অত্যাচার করাতে লাগল।

ধীরে ধীরে জোতদার পুলিন রায় বিলভাসানের চাষীদের কাছে একটা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াল। পুলিনের হাত থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, এ চিন্তা চাষীদের মনে অহরহ বিঁধতে থাকল কাঁটার মতো।

ঠিক এই সময়ে 'কৃষক-সভা'র কেন্দ্রীয় কমিটির একাংশ থেকে আওয়াজ উঠল—'দালাল হালাল করো।'—বাংলার বিভিন্ন চাষী-অঞ্চলে যেখানেই তেভাগা-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেখানেই উদ্ভব ঘটেছিল পুলিন রায়ের মতো দালাল-শ্রেণীর। এরা কৃষক সংগঠনের গোপন সংবাদাদি পৌঁছে দিতো পুলিশের কাছে। পুলিশের সঙ্গে যোগ-সাজশ ক'রে চাষীদের উপর অত্যাচার চালাত। এদের সাহায্যেই পুলিশের পক্ষে কৃষক-আন্দোলনের সুদৃঢ় ব্যূহ ভেঙ্গে দেওয়া সহজসাধ্য হচ্ছিল। সুতরাং এদের নিশ্চিহ্ন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ফলে 'কৃষক-সভা'র

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের জঙ্গী অংশ ডাক দিলেন—'দালাল হালাল করো।'

দালাল হালাল তথা দালাল খতমের এই আওয়াজ ধ্বনিত হ'লো বিলভাসানের চাষীদের মধ্যেও।

অত্যন্ত সাবধানতার মধ্যে গভীর রাতে এক চাষীর ঘরে গোপন অধিবেশন বসল। বিলভাসানের বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিশিষ্ট কৃষক-কর্মীরা উপস্থিত হ'লো। সকলেরই চোখে মুখে আজ একটা চাপা উত্তেজনা। মহিলা-সমিতির পক্ষ থেকে ফুলি, বিনতা, ফুলমতি, বিসখা এবং সৌরভী কাপড় মুড়ি দিয়ে এসে বসল একপাশে। বাইরে মাঘ মাসের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। নিতান্ত নিশাচর প্রাণী না হ'লে এ-সময়ে কারো জেগে থাকার কথা নয়।

সত্যপ্রসাদ এবং নিখিল এসে বসতেই সভার কাজ শুরু হ'লো। সেদিনের সেই ঘটনার পর দুঃসাহসী নিখিল আজ আবার ফিরে এসেছেন বিলভাসানে। আজকের অধিবেশনে আরো কয়েকজন নেতার উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু তাঁরা কেউই আসার সুযোগ ক'রে উঠতে পারেননি। নিখিল এবং সত্যপ্রসাদ যেখানে বসেছেন, তার থেকে সামান্য দূরে মহিলারা মুখোমুখি ব'সে। হারিকেনের আবছা আলোতেও সত্যপ্রসাদ লক্ষ করলেন, নিখিলের দৃষ্টি এদিক ওদিক ঘুরে এসে বারবার আটকে যাচ্ছে সৌরভীর মুখে।

সত্যপ্রসাদ সভার কাজ শুরু করলেন। ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন,——'একটা বিশেষ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যই আমরা সবাই এখানে হাজির হয়েছি। তোমরা সবাই বিশেষ বিবেচনা ক'রে এ-বিষয়ে তোমাদের মতামত জানাও। কৃষক-সভা'র কেন্দ্রীয় কমিটি দালাল হালাল করার নির্দেশ পাঠিয়েছেন। এ-বিষয়ে স্থানীয় কৃষক সমিতির সদস্য হিসেবে তোমাদেরও একটা মতামত থাকা দরকার। সেটা আমি জানতে চাই।'

সত্যপ্রসাদ বক্তব্য শেষ করতেই দৃপ্তকণ্ঠে নিখিল বলতে শুরু করলেন—'কমরেডগণ, আজকে আমরা যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, তাতে দালাল হালালের নীতি গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি এ-বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দু'চারজন দালালকে খতম ক'রে দিতে পারলেই দালালদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে। বিলভাসানের কৃষক সমিতিরও উচিত হবে, এই নীতি গ্রহণ করা।'

চাষীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিলো। সকলেই বেশ উত্তেজিত। নিখিলের বক্তব্য তাদের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করল। বেশ কিছু চাষী যে নিখিলের বক্তব্যের সমর্থক, সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সত্যপ্রসাদ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—'কৃষক-সভা'র আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে এ-কথা আমি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছি যে, আমি এই নীতি সমর্থন করি না। দালাল হালালের নীতি ভুল নীতি। দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত-হত্যা হয়ত কিছুটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারবে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তা বিলভাসানের তেভাগা আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্তই করবে। এর পরিণাম কৃষক-আন্দোলনের পক্ষে

কিছুতেই মঙ্গলজনক হতে পারে না। সুতরাং এই নীতির প্রতি আমার কোনো সমর্থন নেই।'

নিখিল যেন একটু ব্যঙ্গ ক'রেই বললেন—'কমরেড সত্যপ্রসাদ দেখছি কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও কথা বলার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারি হয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অমান্য করা পার্টির শৃঙ্খলা ভঙ্গেরই নামান্তর। সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কমিটি স্পষ্ট নির্দেশ ঘোষণা করেছে। আমি সেটা পড়ে শোনাচ্ছি।'

অতঃপর নিখিল একটি সার্কুলার প'ড়ে শোনালেন। তাতে তেভাগা-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে অবিলম্বে দালাল খতমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ 'কৃষক-সভার' প্রতিটি সদস্যকে যথাযথভাবে পালন করার জন্য সচেষ্ট হতে বলা হয়েছে।

ভিতরে ভিতরে বিচলিত বোধ করলেন সত্যপ্রসাদ। কিন্তু শান্ত কণ্ঠে বললেন —'এটাই যদি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ হয়, তাহলে আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারির পদ থেকে আমি ইস্তফা দিলাম। জেলা কমিটির কাছে আগামী সপ্তাহেই আমার পদত্যাগ-পত্র জমা দেবো। 'কৃষক-সভা'র একজন সাধারণ কর্মী হিসেবেই আমি কাজ করব। কিন্তু ব্যক্তি-হত্যার এই নীতি আমার পক্ষে কিছুতেই সমর্থন করা সম্ভব নয়।'

নিখিল বললেন—'সেটা আপনার অভিরুচি। কিন্তু এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ আমাদের মেনে চলতেই হবে।'

উপস্থিত কৃষক-কর্মীরা বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। নিখিল এবং সত্যপ্রসাদ—দু'জনেই তাদের অতি প্রিয় শ্রদ্ধেয় নেতা। তাঁদের এই মতান্তরে সকলেই বেশ বিচলিত হ'লো।

নিখিল কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বলে চললেন—'কমরেডগণ, খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, কেন্দ্রীয় কমিটির সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আমাদের মনে দ্বিধা ঘটছে। কিন্তু এখন এ-ধরনের দ্বিধা থাকলে কৃষক-আন্দোলন বানচাল হয়ে যাবে। আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে দালাল হালালের নীতি আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। এই দালালরাই এখন আমাদের সব থেকে বড়ো শত্রু।

একটু থামলেন নিখিল। তারপর আবার শুরু করলেন—'বিলভাসান অঞ্চলে কিছুদিন থেকে দেখছি পুলিন রায় নামক একজন জোতদার প্রধান দালালের ভূমিকা নিয়েছে। খতমের তালিকায় আমি এই পুলিন রায়ের নামই প্রথমে ঘোষণা করছি। এই কাজের দায়িত্ব কে কে নেবে জানাও।'

বাইরে মাঘমাসের থমথমে নিশুতি রাত। চারিদিক নিস্তব্ধ। চাষীবাড়ীর মাটির দেয়ালের ঘরের মধ্যে এতগুলি মানুষ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সকলে যেন রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছে। নিখিল রায়ের চাপা গম্ভীর কণ্ঠস্বর ঘরের মধ্যে গমগম করতে থাকল। কিন্তু নিখিলের ডাকে কেউই সাড়া দিলো না। সকলে মাথা নিচু ক'রে ব'সে রইল।

নিখিল উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—'পুলিন রায়কে খুন করার মতো কেউ নেই এখানে ? এতটুকু সাহস নেই কারো ?'

চাষীদের ছোটো দলটার পিছন থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জলধর। একটু এগিয়ে এসে বলল—'নিখিলদা, এ-কাজের ভার আমি নিতি পারি।'

জলধরের দেখাদেখি উঠে দাঁড়াল বাঘা। বাঘার বয়স জলধরেরই মতো। হয়ত সামান্য কিছু বড়ো হতে পারে। বাঘাও বলে উঠল—'আমিও এ-কাজের ভার নিতি পারি।'

নিখিল সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'সাবাস্। তোমাদের দু'জনকেই আমি এ-কাজের ভার দিলাম। তবে, এ-কাজ খুব কঠিন কাজ। একটু এদিক ওদিক হলেই বিপদ ঘটবে। আট-ঘাট বেঁধে কাজে নামতে হবে। দু'এক-দিনের মধ্যেই সব প্লান ক'রে আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো।'

অতঃপর সভা ভঙ্গ হ'লো। সকলেরই মুখ থমথমে, গম্ভীর। সত্যপ্রসাদ ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁর হাত থেকে ধীরে ধীরে বিলভাসানের নেতৃত্ব চলে যাচ্ছে, এটাই তাঁর ক্ষোভের বড়ো কারণ নয়। বিলভাসানের কৃষক-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ রূপটি কোন্ দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে, তার হদিশ করতে না পেরেই তিনি ভিতরে ভিতরে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন।

সৌরভী ঘরের বাইরে উঠোনে এসে দাঁড়াতেই তার দিকে এগিয়ে এলেন নিখিল। নিখিলকে আসতে দেখে সৌরভী উঠোনের কোণের দিকে আরো অন্ধকার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। নিখিল পাশে এসে দাঁড়াতেই সৌরভী হেসে বলল—'কেমন আছেন ? জ্বর গেছে ?'

নিখিলও একটু হেসে বলল—'হ্যা গেছে। আর না গেলেই বা কি করা যাবে ! চারিদিকে কাজের দায়িত্ব। এখন কি ঘরে ব'সে থাকলে চলবে ?'

হঠাৎ ফুঁসে উঠল সৌরভী—'কিন্তু এডা আপনি কি করলেন নিখিলদা ? সত্যদার অমতে এ-কাজ করা কি ঠিক হবে ? আর এইভাবে দুই একজন মানুষ মারলিই কি আমরা জিতে যাবো ?'

কঠিন দৃষ্টিতে এক পলক তাকিয়ে থাকলেন নিখিল। তারপর বললেন—'সব কাজের ভালো-মন্দের বিচারের ভার তোমরা নাই-বা নিতে গেলে ! এটা আমার উপরেই ছেড়ে দাও।'

কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে নিখিল আবার বললেন—'ওসব কথা থাক্ সৌরভী। তোমাকে একটা বিশেষ কাজের কথা বলার জন্য এসেছি। এ কাজের ভারটা তোমাকে নিতেই হবে। আমার কাছে একটা দেশী পিস্তল আছে। গুলী ভরা নেই। কার্তুজ না থাকায় ব্যবহার করতে পারছি না। কার্তুজ জোগাড় হলেই ওটা আবার নিয়ে যাবো। সে কয়দিন ওটাকে তোমার কাছে সাবধানে রাখো। আমার পক্ষে ওটা নিয়ে ঘোরাঘুরি করা নিরাপদ নয়।'

বিস্মিত সৌরভী বলল—'সে কি ? ওসব জিনিস আমি ক'নে কিভাবে রাখবো ?'

সৌরভীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে নিখিল গাঢ়-কণ্ঠে বললেন—

'সেদিনের সেই ঘটনা থেকেই বুঝেছি, তোমার তুলনা নেই। তোমার উপর আমি নির্ভর করতে পারি সৌরভী!'

নিখিলের এই স্তাবকতাটুকু অন্তর দিয়েই গ্রহণ করল সৌরভী। হাত পেতে বলল—'দেন।'

সৌরভীর একান্ত সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে নিখিল পাঞ্জাবির পকেট থেকে কাপড়ে-মোড়া পিস্তলটা তুলে দিলেন তার হাতে। সৌরভী সাবধানে পিস্তলটা কোমরের কাপড়ে গুঁজে রাখল।

সত্যপ্রসাদ ঘর থেকে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হয়ে যাবে। চাষী-কর্মীদের সঙ্গে অবিলম্বে এখান থেকে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হবে। হঠাৎ সত্যপ্রসাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল উঠোনের কোণে। নিখিল আর সৌরভী দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ অবস্থানটুকু নজর এড়ালো না সত্যপ্রসাদের।

অসীম বিতৃষ্ণায় সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন সত্যপ্রসাদ। বুকের মধ্যে যেন একটা বিষম গুরুভার অনুভব করলেন।

আজকের সভায় চাষীদের সামনে সত্যপ্রসাদ স্পষ্ট কোনো পথ-নির্দেশ রাখতে পারেননি। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের এই গ্লানি তখন থেকেই তাঁর মনের মধ্যে ভার হয়ে চেপে বসে ছিল। চাষীদের কাছে বলিষ্ঠভাবে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখতে পারতেন। চাষীরা তাঁর বাধ্য, একান্ত অনুগত। অবশ্যই তাঁর কথা তারা অমান্য করতে পারত না। ব্যক্তি-হত্যার এই ব্যাপারটাকে যে তারা সবাই সন্তুষ্টমনে মেনে নিতে পারছে না, সেটাও তাদের আচরণেই প্রকাশ পেয়েছে। নিখিলের জোরালো ভঙ্গীর কাছে তারা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাটাকে তুলে ধরতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে সত্যপ্রসাদ চাষীদের মতামত জানতে চাইলে কিম্বা ব্যক্তিগত সন্ত্রাস-সৃষ্টির এই নীতির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদের ইঙ্গিত দিলেই তারা সরব হয়ে উঠত। সঠিক সময়ে সে সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারেননি। অবশ্য এতে দলের শৃঙ্খলা-ভঙ্গের অপরাধে তাঁকে অপরাধী হতে হ'ত। 'কৃষক-সভা'র একজন নিষ্ঠাবান এবং দায়িত্বশীল কর্মী হিসেবে এ-ধরনের আচরণেও তাঁর অন্তর সায় দেয় না। তবে কেন্দ্রীয় কমিটির দালাল-হালালের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা এখনো তাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। পরে হয়ত এ-ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে পারবেন। প্রকৃত সিদ্ধান্তটা কী, তা জানতেও পারবেন।

একটা বিষয় ইদানীং সত্যপ্রসাদের কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বিলভাসানের চাষীদের আন্দোলনের মূল শক্তি এবার তাদের নিজেদের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠবে। এ-আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করবে চাষীদেরই নিজস্ব নেতৃত্ব-ক্ষমতা এবং সংগঠন-শক্তির উপর। তাঁদের মতো বহিরাগত নেতার ভূমিকা ক্রমেই গৌণ হয়ে আসবে। তাতে সত্যপ্রসাদের ক্ষোভ নেই। বরং আনন্দই বেশী। এই ভীরু চিরদিনের মার-খাওয়া অসহায় মানুষগুলোর বুকে যে তিনি অদম্য প্রাণ-বল এবং দুরন্ত সংগ্রামের শক্তি সঞ্চারিত ক'রে দিতে পেরেছেন, এর থেকে বড়ো পুরস্কার তাঁর আর কিছু নেই।

তবে তাঁর ভূমিকা গৌণ হয়ে এলেও তাঁকে লক্ষ রাখতে হবে, যাতে চাষীদের

এই আন্দোলন কোনো ভুলপথে পরিচালিত হয়ে বাধাগ্রস্ত না হয়। কিন্তু কিছু আগে এখানে যে সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়ে গেলো, এতে যে বিলভাসানে আগুন জ্বলবে, সর্বাত্মক গণ-অন্দোলনের পথে বিধ্বংসী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তিনি সবলভাবে সে-সিদ্ধান্তের প্রতিরোধ করতে পারলেন না। এই পরাভবের গ্লানিতে সত্যপ্রসাদের সারা অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল।

এরই মধ্যে নিখিল আর সৌরভীর এই মাখামাখিটুকু তাঁর মনের মধ্যে যেন ভিন্নতর একটি হতাশার জন্ম দিলো। সৌরভী সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো আগ্রহ নেই। শুধু সৌরভী কেন, বিলভাসানের কোনো মেয়ে সম্পর্কেই তাঁর স্বতন্ত্র কোনো কৌতূহল নেই। নরনারী-নির্বিশেষে বিলভাসানের চাষীদের মধ্যে যে সামগ্রিক আন্দোলনের রূপটি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে, তার মূল বিন্দুটিকে কেন্দ্র ক'রেই সত্যপ্রসাদের জীবনের সমস্ত কিছু ওঠানামা। কিন্তু তবু এই মুহূর্তে নিখিলের একান্ত ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়ে-থাকা সৌরভীর আবছা মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে সত্য-প্রসাদের বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম অভিমানের সুর টনটন ক'রে উঠল। সম্পূর্ণ নতুন এই অনুভূতি। কিন্তু বড়ো তীব্র আর আগ্রাসী তার রূপ। সব মিলিয়ে একটা বিপর্যস্ত, নিঃসীম একাকীত্ব যেন তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে চাইল।

লাঠি হাতে দু'জন চাষী এসে দাঁড়াল সত্যপ্রসাদের পাশে। একজন বলল—'আর দেরী করাডা ঠিক হবেনা সত্যদা। এবার চলেন।'

আচমকা যেন ঘোর ভেঙে জেগে উঠলেন সত্যপ্রসাদ। অনুগত চাষীটির কাঁধের উপর আলগোছে একখানা হাত রাখলেন। তারপর সামনের সীমাহীন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অবসন্ন কণ্ঠে বললেন—'হ্যা ভাই চলো।'—

॥ ছাব্বিশ ॥

হাটের এদিকটায় আলো কিছু কম। কপি, পালং, মুলো ইত্যাদি শীতের আনাজপত্র বিক্রি হচ্ছে জায়গাটায়। গিশ্-গিশ্ করছে লোকের ভিড়। শীত-বস্ত্রে গা-মাথা ঢাকা সকলের। শীতটা পড়েছেও বেশ জাঁকিয়ে দু'দিন। সন্ধ্যের অন্ধকার একটু ঘন হতেই আজও যেন অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শীত নামছে। পুলিন রায় আনাজ-পাতির বাজারটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল। পছন্দসই দু'টো ফুলকপি কেনার ইচ্ছে। হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে কে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল—'তাড়া-তাড়ি বাড়ী যাও রায়মশায়। তোমার বাড়ী খুব বিপদ।'

কথাটা কে বলল বোঝা গেলো না। ভিড়ের মধ্যে অন্ধকারে লোকটা মিলিয়ে গেলো। ভীষণ চিন্তা হলো পুলিনের। বাড়ীতে কি বিপদ হতে পারে! কারো কোনো অসুখ-বিসুখ? কিম্বা অন্য কিছু? বাড়ীতে পাট-বেচা প্রায় হাজার খানেক টাকা রয়েছে। বলা তো যায়না। দিনকাল ভালো না। শত্তুরের তো অভাব নেই।

পুলিশ দিয়ে শয়তানগুলোকে এত ঢিট্‌ করা হচ্ছে। তবু যেন বাগে আনা যাচ্ছেনা। দিনরাত যেন সব ম্যাড়ার মতো কুঁদে বেড়াচ্ছে। কোন্‌টায় আবার কোন্‌ ঝামেলা পাকালো কে জানে। মনটা ভীষণ উতলা হয়ে উঠল পুলিনের। তাড়াতাড়ি এখন বাড়ী যাওয়া দরকার।

আজকাল পুলিন কখনো একা একা হাটে আসে না। কোথাওই যায় না। সব সময়েই সঙ্গে কেউ না কেউ থাকে। আজও সঙ্গে বাড়ীর মুনিষ ছেলেটাকে এনেছে। ছেলেটা বেশ অনুগত। আর গায়েও বেশ জোর আছে। কিন্তু ছেলেটাকে এখন কোথায় খুঁজে পাবে? হাট এখন জম-জমাট। কথা ছিল, হাটের কাজকর্ম সেরে ছেলেটা সাহা মশায়ের দোকানে থাকবে। ফেরার সময় পুলিন ওকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবে। কিন্তু সে তো দেরি হয়ে যাবে অনেক! পুলিনের মনটা বাড়ীর জন্য বড়োই চঞ্চল হয়ে উঠল। কি আর হবে! একা একাই হাট থেকে বেরিয়ে পড়ল পুলিন। পথে নিশ্চয়ই এক-আধজন সঙ্গী জুটে যাবে।

হাট থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলো পুলিন। সবাই এখন হাটে ব্যস্ত। বাড়ী ফেরার লোক নেই। আর একটু যেতে দেখা গেলো, সামনে একটা লোক যাচ্ছে। আকাশের কোণে একফালি চাঁদ উঠেছে। চাঁদের ম্যাড়মেড়ে আলোয় লোকটাকে আবছা দেখাচ্ছে।

পুলন একটু দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কেডা যায়?'

লোকটা দাঁড়াল। বলল—'আমি,—আমি মথুর।'

—'মথুর? তা, বাড়ী যাচ্ছো নাকি মথুর?'

—'হাঁ রায়মশায়, বাড়ী যাচ্ছি। শরীলডা তেমন ভালো নেই। বেজায় জাড় পড়িছে। তাড়াতাড়ি বাড়ী যাতি পারলি বাঁচি।'

—'তো চলো মথুর। আমিও বাড়ী যাবো। তোমার সাথে যাই।'

দু'জনে মেঠো রাস্তা ধ'রে হাঁটতে থাকে।

মথুর লোকটাকে তেমন পছন্দ নয় পুলিনের। পুলিনের পাশের গ্রামে বাড়ী মথুরের। বয়সে পুলিনের সমানই হবে। বছর চারেক আগে অজন্মার বছরে ওর তিন বিঘে জমি বন্ধক রেখে ধান কর্জ দিয়েছিল পুলিন। পরের বছর ধান শোধ দিতে এলে এমন হিসেব দেখিয়ে দিয়েছিল পুলিন যে, আজও সে জমি ছাড়াতে পারেনি মথুর। সেই থেকে দেখা হ'লেই লোকটা যেন কেমন ক'রে তাকায়। দেখলে হাড়-পিত্তি জ্বলে যায়। কিন্তু কি আর করে পুলিন! এতটা পথ একা যাওয়ার থেকে একজন সঙ্গী থাকা ভালো। বাধ্য হয়েই মথুরের সঙ্গে যেতে হ'লো।

এখান থেকে পুলিনের বাড়ী মল্লিহাটি গ্রাম প্রায় মাইল পাঁচেকের রাস্তা। এদিকটাও ফাঁকা বিল অঞ্চল ক্ষেত-মাঠের মধ্যে দিয়ে হাটুরে রাস্তা। তবে এইটুকু সুবিধে, এই বিলের রাস্তাটুকু পার হয়ে বিলভাসান অঞ্চলে পড়লে এদিক থেকে প্রথম গ্রামই মল্লিহাটি। কোনোমতে এই বিলেন পথটুকু পার হতে পারলেই আর কোনো ভাবনা নেই।

ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে মিটমিটে চাঁদের আলোয় দু'জনে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। একটু একটু কুয়াশা পড়েছে। ধোঁয়াটে কুয়াশার উপর আবছা চাঁদের আলো

প'ড়ে চারিদিক কেমন রহস্যময় দেখাছে। মাইল দুয়েক যাবার পর মথুর হঠাৎ ডানদিকে বেঁকে একটা ভিন্ন রাস্তা ধরল। পুলিনের মনের মধ্যে তখন নানা ভাবনা-চিন্তা চলছিল। বাড়ীতে কি হয়েছে কে জানে। এসব চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিল। হঠাৎ মথুরকে ডান দিকে ফিরতে দেখে একটু যেন ভয় পেয়ে বলল—'ও মথুর! এ আবার কোন্ রাস্তা ধরলে?'

মথুর ধীর গলায় বলল—'এদিক দিয়েই যাওয়া ভালো রায়মশায়। ও-রাস্তা তো বিলের মধ্যি জলা-জায়গা দিয়ে যাবে। রাতির বেলায় অনেক সময় ওখানে দাঁতাল বুনো শুয়োর নামে। খালি হাতে দুইজনে কি ওদিক দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে?'

কথাটা ঠিক। এই বিল অঞ্চলটার পিছন দিকেই বিস্তৃত জঙ্গল অঞ্চল। সেখান থেকে শীতকালের রাত্রিবেলায় মাঝে মাঝে ধান খাবার লোভে বুনো শুয়োর নেমে আসে বিলে। দলবদ্ধ দাঁতাল বুনো শুয়োর অনেক সময় বেশ হিংস্র হয়ে ওঠে। রাতের বেলায় একা-দোকা পথচারীকে সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। সুতরাং মথুরের কথায় পুলিন কোনো আপত্তি করতে পারল না। বাধ্য হয়েই অনুসরণ করল মথুরকে।

কিছুদূর এগিয়ে মেঠো রাস্তাটার পাশে একটা মস্ত 'নাড়া'র গাদা পড়ল। কোনো চাষী হয়ত জ্বালানির জন্য তুলে নাড়াগুলো জমা ক'রে রেখেছে। সেই নাড়ার গাদার পাশ দিয়ে অগ্রসর হ'লো দু'জনে। হিমেল কুয়াশা আর চাঁদের আলো মাখামাখি হয়ে নাড়ার গাদার ছায়াটাকে অলৌকিক, অপার্থিব ব'লে মনে হচ্ছে।

মথুর একটু এগিয়ে যেতেই নাড়ার গাদার পিছন থেকে লাফ দিয়ে পড়ল বাঘা। হাতে দীর্ঘ একখানা বাঁশের লাঠি। লাঠিটা একটা পাক দিয়েই বাঘা সজোরে বসিয়ে দিলো পুলিনের মাথায়। কিন্তু পুলিন অসম্ভব ধূর্ত। এসব সময়ে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিপদের গন্ধ টের পেয়েই হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছিল পুলিন। বাঘার হাত থেকে লাঠিটা মাথার উপর নেমে আসতেই সাৎ ক'রে হেলে পড়ল একপাশে। লাঠিটা সজোরে গিয়ে আছড়ে পড়ল মাটির উপর। লাঠির আঘাত পুলিনের গায়ে কোথাও লাগল না। কিন্তু টাল সাম্‌লাতে না পেরে পুলিন হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলো মাটিতে। কিন্তু বুড়ো হাড়েও ভেল্‌কি দেখাল পুলিন। তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে উঠেই উল্টোমুখে ছুটতে শুরু করল।

কালান্তক যমের মতো হঠাৎ পাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলধর। চাঁদের আলোয় হাতের ধারালো রামদা-খানা ঝকঝক ক'রে উঠল। দুই লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়েই জলধর দা-খানা নামিয়ে দিলো পুলিনের ঘাড়ের উপর। মাথাটা ছিটকে গিয়ে পড়ল পাঁচ ছয় হাত দূরে। পুলিনের মুণ্ডহীন দেহটা মাটিতে প'ড়ে ধড়ফড় করতে থাকল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল গলা দিয়ে।

জলধর উন্মত্ত চীৎকার ক'রে উঠল—'বাবা, তুমি সগ্‌গো থেকে দেখে যাও, আমি শোধ নিছি, আমি তোমারে মারার শোধ নিছি বাবা!'

কিন্তু তার পরেই পুলিনের মুণ্ডহীন নিথর নিস্পন্দ দেহটার দিকে তাকিয়ে কী যেন এক বিষম আতঙ্কে শিউরে উঠল জলধর। হাতের রামদা-খানা ছুঁড়ে দিলো মাটিতে। তারপর ক্ষেত-প্রান্তর ভেঙ্গে তীরবেগে ছুটতে শুরু করল।

পরদিন দুপুর হতেই মল্লিহাটি গ্রামে পুলিনের বাড়ী ছয়লাপ হয়ে গেলো পুলিশে পুলিশে।

রাত্রিবেলা হাট থেকে মুনিষ ছেলেটা একাই বাড়ী ফিরেছিল। পুলিন না ফেরায় বাড়ীর লোকেরা একটু চিন্তায় পড়েছিল। তবে মাঝে মাঝেই পুলিন এ-রকম এদিক-ওদিক যায়। ফলে রাত্রিটা তেমন আর কেউ বিশেষ মাথা ঘামায়নি। কিন্তু পরদিন সকালেও বেশ কিছুটা বেলা পর্যন্ত পুলিন বাড়ী না ফেরায় চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যায়।

একটু খুঁজতেই বিলের মধ্যে পাওয়া গেলো পুলিনের লাশ। সারারাত বেওয়ারিস প'ড়ে ছিল। শিয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেতো টের পেলে। পুলিনের কাটা মুণ্ড আর ধড়টা বাড়ী আসতেই কান্নার রোল পড়ে গেলো। পুলিনের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে বিশেষ ক'রে পুলিনের মা'র কান্না এক মর্মস্পর্শী শোকের পরিবেশ তৈরী করল। বুড়ী যাকে পায়, তাকেই জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বলে—'ওরে, তোরা আমার পুলিনরে ফিরেয়ে আ'নে দে, না হলি আমারেও মা'রে ফ্যাল্!'

থানায় খবর দেওয়া হ'লো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বড়োদারোগা পুলিশ-বাহিনী নিয়ে এসে হাজির হলেন জীপে চ'ড়ে। পুলিনের মা দারোগার পায়ে সমানে মাথা কুটতে লাগল আর বলতে লাগল—'ও বাবা, আমার পুলিনরে তুমি ফিরেয়ে আ'নে দ্যাও—।'

দারোগা দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। তাঁর চোখ দু'টো আরো কঠিন হয়ে উঠল।

বিলভাসানের চাষী পরিবারগুলির মধ্যে চাপা আনন্দের ঢেউ বয়ে গেলো। পুলিনের মতো মহাশত্রু নিপাত হওয়ায় সকলেরই স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। দীর্ঘদিন ধ'রেই পুলিন চাষীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার ক'রে আসছে। ধার-দেনা আর মিথ্যা মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে চাষীদের সর্বস্বান্ত করায় জুড়ি ছিল না পুলিনের। তার উপর আবার কিছুদিন থেকে শুরু হয়েছিল চাষীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে পুলিশ দিয়ে অত্যাচার করানো। বিলভাসানের প্রতিটি চাষী পরিবার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল পুলিনের জ্বালায়। সেই মহাশত্রুর নিপাতের সংবাদে চাষীদের উল্লসিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের একটা কালো মেঘও ঘনালো তাদের মনে। খুনের কেস। পুলিশ কি এবার সহজে রেহাই দেবে!

পুলিনের লাশের পাশেই পাওয়া গেলো রামদা-খানা। দারোগার সামনে হাজির করা হ'লো সেখানা। দারোগা নেড়ে-চেড়ে দা-খানা পরীক্ষা করলেন।

অনন্ত এগিয়ে এসে বলল—'বড়োবাবু, এ-রকম রামদা বানানির ক্ষমতা বিলভাসানে একজনেরই আছে। সে হলো গগন ঢং। ব্যাটাচ্ছেলে ঢং-গিরি ছা'ড়ে দিয়ে এখন কামার-গিরি করতিছে। আর এই সব অস্তর-পাতি বানায়ে শয়তান-গুলোর হাতে তুলে দেচ্ছে। এর একটা বিহিত করেন বড়োবাবু। পুলিনদা তো চলে গ্যালো। এবার আমাদেরও শেষ ক'রে দেবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বড়োদারোগার জীপ গাড়িটা স্টার্ট নিলো। গাড়ীতে থাকলেন বড়োদারোগা স্বয়ং, অনন্ত আর জন তিনেক বন্দুকধারী কনস্টেবল। পুলিশের বাকি দলটা পুলিনের বাড়ী মোতায়েন থাকল। শীতের রুক্ষ মেটে রাস্তার

ধুলো উড়িয়ে তীব্রবেগে ছুটে চলল জীপটা। তিন-চারখানা গ্রাম পার হয়ে এসে হাজির হ'লো বাঁকপুর গ্রামে। অতর্কিতে এসে থামল কৈলাসের বাড়ীর সামনে। পুলিনের মৃত্যু-সংবাদ চারিদিকেই রটে গেছে। সুতরাং সকলেই তটস্থ। হঠাৎ পুলিশের আবির্ভাবে চারিদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।

বড়োদারোগা আজ আর অন্য কোনোদিকে দৃক্‌পাত করলেন না। জীপ থেকে নামতেই অনন্ত দেখিয়ে দিলো গগন ঢং-এর ঘরখানা। উলুখড়ের জমির পাশ দিয়ে গগনের একটেরে ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালেন দারোগা। একজন কনস্টেবল বন্দুক হাতে বাইরে পাহারায় থাকল। অন্যজন ঢুকে গেলো ঘরের ভিতরে।

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঘরের মধ্যে পাওয়া গেলো গগনকে। চেহারায় যেন আগের সে জলুস নেই। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ক'দিন ধ'রে জ্বর চলছে। জীর্ণ বাঁশের মাচাটার উপর তেলচিটে একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল গগন। পুলিশের আগমন টের পায়নি। ফলে বিন্দুমাত্র সাবধান হবার সুযোগ পেলো না। গগন কিছু বুঝবার আগেই কনস্টেবলটি এগিয়ে এসে ওকে ঘাড় ধ'রে টেনে তুলল এবং হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো।

তারপর শুরু হ'লো তল্লাশী। ঘরের মধ্যে জায়গাই বা আর কতটুকু। কিছুই পাওয়া গেলো না ঘরের মধ্যে। ঘরের পিছনে পোড়া কাঠ-কয়লার স্তূপ। গগনের কামার-শালার হাঁপরের কাজে এগুলো ব্যবহার হয়। কাঠ-কয়লার স্তূপটা সরাতেই তার মধ্যে একটা বস্তা পাওয়া গেলো। বস্তার মধ্যে রয়েছে খান পাঁচেক সড়কির ফলা আর দশখানা রামদা। বস্তাটা নিয়ে জীপে তোলা হ'লো। তারপর গগনকে জীপে তুলে সবাই মিলে রওনা দিলো মল্লিহাটির দিকে।

কিছুদূর যেতেই দারোগা বললেন—'এ্যাই, জীপ থামা।'

জীপ থামতেই দারোগা বাইরে নেমে এলেন। বড়োদারোগার মুখে আজ আর কোনো হম্বি-তম্বি, খিস্তি-খেউড় নেই। হাতকড়া-পরানো গগনকে দেখিয়ে বললেন—'এটাকে আজ আর নিয়ে কি হবে। আসলটাকে আগে ধরতে হবে। তবে এটারও একটা ব্যবস্থা ক'রে যাবো। শখটা বেশ ভালো ক'রেই মিটিয়ে দেবো।'—

মেঠো রাস্তার পাশে লম্বা দড়িতে একটা গোরু বাঁধা ছিল। দারোগার নির্দেশে একজন কনস্টেবল গিয়ে খোঁটা উপড়ে গোরুর শিং থেকে খুলে নিয়ে এলো দড়িটা। তারপর সেই লম্বা দড়িটার একটা পাশ বাঁধা হ'লো জীপের পিছনের একটা হুকে। আর একটা পাশ বাঁধা হ'লো গগনের কোমরে। হাতকড়া খুলে গগনকে নামিয়ে দেওয়া হ'লো জীপ থেকে। গগন সাধ্য-অনুযায়ী বাধা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু বলিষ্ঠ সিপাই দু'জনের সঙ্গে সামর্থ্যে এঁটে উঠতে পারল না।

গগনকে নামিয়ে দিয়েই গাড়ীটা সজোরে স্টার্ট নিলো। দড়িতে টান পড়তেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো গগন। তারপর শুরু হ'লো এক নারকীয় দৃশ্য। দুই হাতে দড়িটা আঁকড়ে ধ'রে গগন পরিত্রাহি চীৎকার করতে শুরু করল। কিন্তু জীপ থামল না। গতিবেগ আরো বাড়ল। সেই দ্রুতগামী জীপের পিছন পিছন গগনের দেহটা মাটিতে ঘষটাতে ঘষটাতে এগিয়ে চলল। গায়ের ছাল চামড়া ছিঁড়ে

ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতে থাকল।

বিলভাসানের চাষীদের মুখে ভাষা, আর মনে চেতনা এনে দিয়েছিলেন সত্য-প্রসাদ। আর তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল গগন। বিলভাসানের চাষীদের দেহে মনে একটা বাড়তি শক্তির সঞ্চার ঘ'টয়েছিল গগনের নিপুণ হাতে গড়া সেই সব অস্ত্র। বিলভাসানের চাষীদের শক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত ক'রে তুলতে চেয়েছিল গগন। তার ঢং-দেখানো প্রৌঢ় দেহের পেশীতে পেশীতে নতুন এক উদ্‌বোধনের ধ্বনি বেজে উঠেছিল কামারশালার হাঁপরের পাশে হাতুড়ি হাতে নিয়ে। কিন্তু এখন বিলভাসানের রুক্ষ কর্কশ উদাসীন রাস্তাটায় তার সেই দেহটা নির্মমভাবে ঘর্ষিত, পিষ্ট হতে হতে ক্রমেই যেন নির্জীব হয়ে এলো।

বিলভাসানের অধিবাসীরা নির্বাক বেদনায় সেই মর্মান্তিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল। যে সংঘ-শক্তি এবং দৃঢ়বদ্ধ ঐক্যের জোরে একদিন তারা আত্মরক্ষা করেছে, পুলিশ এবং জোতদারদের সমস্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করেছে, আজ তার অভাবে অসহায়ভাবে ভীরুর মতো দূরে দাঁড়িয়ে এ-দৃশ্য দেখা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় রইল না।

মাইলখানেক যাবার পর বড়োদারোগার নির্দেশে জীপ থামল। দারোগা জীপ থেকে নেমে গগনের দেহটা ভালো ক'রে দেখে বললেন—'শেষ হয়ে গেছে। আর টানতে হবে না। এবার দড়ি কেটে দে।'

জীপের হুক থেকে দড়ি কেটে দেওয়া হ'লো। গগনের নিস্পন্দ দেহটা প'ড়ে থাকল রাস্তার উপর। ধুলো উড়িয়ে বড়োদারোগার জীপটা অদৃশ্য হয়ে গেলো মল্লিহাটির দিকে।

গগনের দেহটা যেমন প'ড়ে ছিল, তেমনিই প'ড়ে থাকল। পুলিশের ভয়ে কেউই তার কাছে আসতে সাহস পেলো না।

একসময় পশ্চিম দিগন্ত লাল ক'রে বিলভাসানের বুক থেকে সূর্য অস্ত গেলো। আঁধারটা একটু ঘনিয়ে উঠতেই পাগলের মতো ছুটে এলো কষ্ঠীরাম। গগনের নিথর নিস্পন্দ দেহটার উপর আছড়ে পড়ল। হাউ হাউ ক'রে কাঁদল খানিকক্ষণ। কষ্ঠীরাম ধরেই নিয়েছিল, গগনের দেহে প্রাণ নেই। এ-রকম নির্মম অত্যাচারের পর প্রাণ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু হঠাৎ কষ্ঠীরামের একটা হাত গিয়ে পড়ল গগনের মুখের কাছে। কষ্ঠীরাম অবাক হয়ে অনুভব করল, গগন যেন নাক মুখ দিয়ে অতি ক্ষীণভাবে একটুখানি হাওয়া টানার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে কষ্ঠীরাম তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে উঠে ছুটল কাছের গ্রামটায়। এক কলসী জল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো আবার। গগনের চোখে মুখে সেই জল ছিটিয়ে দিতে থাকল।

খানিকক্ষণ বাদে গগন অস্ফুট একটা কাতর শব্দ ক'রে চোখ মেলে তাকাল। কষ্ঠীরামের তখন চোখে জল, মুখে হাসি। গগনের একটা হাত নিজের হাতে তু'লে নিয়ে বলল—'ঢং দাদাগো, আমাদের ফেলে তুমি ক'নে চ'লে যাচ্ছিলে গো ঢং-দাদা!'

গগনের ক্ষত-বিক্ষত দেহে তখন রক্ত ঝরছে। সারা শরীর জুড়ে ব্যথা। যন্ত্রণায় চোখ বুজে আসছে। কিন্তু চোখ দু'টো বড়ো বড়ো ক'রে খুলে গগন বলল—

'কাঁদিস্‌নে কোঠে, কাঁদিস্‌নে। বা'চে যখন আছি, তখন আর মরবো না! তবে বড়ো দুঃখ হচ্ছে রে,—শালারা আমার অস্তরগুলোন্ সব নিয়ে গেছে!'

গগনকে জড়িয়ে ধ'রে কণ্ঠীরাম বলে—'ঢং দাদা, অস্তরের জন্যি তুমি দুঃখু ক'রে না। তুমি কামার-ঘরে ফিরে চলো। আবার তুমি অস্তর বানাবা! ও শালারা কয়খান অস্তর নেবে আমাদের?'

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে গুটি-গুটি ক'রে এগিয়ে আসতে লাগল এক একটা ছায়ামূর্তি। পুলিশের ভয়ে সবাই এদিক ওদিক লুকিয়ে ছিল। গগনের উপরে এই পৈশাচিক অত্যাচারে ভয়ে যেন সবাই নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। গগন বেঁচে আছে দেখে মনে সাহস ফিরে এলো। সবাই ধরাধরি ক'রে গগনকে নিয়ে গেলো ওর কামারশালায়। লক্ষ্মণ কবিরাজকে ডেকে এনে ক্ষত শুকোনোর জাব বানিয়ে সারা গায়ে লাগিয়ে দিলো।

এতবড়ো অমানুষিক অত্যাচারের পরেও গগন বেঁচে যাওয়াতে বিলভাসানের চাষীদের মনে সাহস এবং উল্লাস দু'টোই ফিরে এসেছিল। কিন্তু তা কর্পূরের মতো উবে যেতেও দেরি হ'লো না বেশী। পরপর কয়েকটা ঘটনা তাদের উদ্‌ভ্রান্ত, দিশেহারা ক'রে তুলল। তাদের যেটুকু মনোবল ছিল, তা লুপ্ত হতে বসল।

প্রথম ঘটনা হ'লো জলধরের গ্রেফতার। পুলিনের হত্যাকারীকে তখন পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বাঘা এবং জলধরই যে এ হত্যাকাণ্ডের মূলে, এ তথ্য-প্রমাণ ততদিনে পুলিশের হাতে অভ্রান্তভাবে উপস্থিত। তাদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ চারদিকে তন্নতন্ন ক'রে খোঁজা শুরু করল। দুজনেই পালিয়ে বেড়াতে লাগল। বাঘা কৌশল ক'রে একদিন রাতের অন্ধকারে বন বাদাড় ভেঙ্গে নদী সাঁতরে সীমান্ত পার হয়ে 'ইণ্ডিয়া'য় চলে গেলো। কিন্তু ধরা প'ড়ে গেলো জলধর। ক'দিনের অস্নাত অভুক্ত জলধর জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পুলিশ হঠাৎ তার সন্ধান পায়। আচমকা ঘিরে ফেলে গ্রেফতার করে। তারপর বর্বর অত্যাচারের বন্যা চলল তার উপর।

জলধরের গ্রেফতারের সংবাদ যেন হাওয়ার মুখে ভেসে এলো বিলভাসানে। খবরটা শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলো। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলোকে কোলে কাঁখে নিয়ে জলধরের মা কৈলাসের পায়ের উপর এসে আছড়ে পড়ল। কৈলাস একটাও কথা বলতে পারল না। বোবা প্রাণীর মতো ব'সে থাকল ঘাড় গুঁজে। ঘরের কোণে ব'সে চাঁপা কাঁদতে থাকল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। চোখের জল মুছে কৈলাস-গিন্নী এগিয়ে এসে জলধরের মা'র হাত ধ'রে ঘরে নিয়ে গেলো।

দ্বিতীয় আঘাত এলো আরো আকস্মিক এবং মর্মান্তিকভাবে। সত্যপ্রসাদ পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। সত্যপ্রসাদকে ধরার জন্য পুলিশ বিরাট জাল পেতেছিল। তাঁর গতিবিধির উপর সতর্ক নজর রাখার জন্য বিশেষ চর নিয়োগ করা হয়েছিল। নড়াইলের ওদিকে 'কৃষক সভা'র কী কাজে গিয়েছিলেন। সেখানেই পুলিশের নজরে প'ড়ে যান সত্যপ্রসাদ। চারিদিককার নানা বিপর্যয়ের মধ্যে সত্য-প্রসাদের এই গ্রেফতারের সংবাদে বিলভাসানের চাষীরা যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল।

কিছুদিন থেকেই সত্যপ্রসাদের বাসস্থান একেবারেই অনিশ্চিত হয়েপড়েছিল। তবে বিলভিতের এক চাষীর বাড়ীতে এসে থাকতেন মাঝে মাঝেই। সবাই ছুটল এখন সেই বাড়ীতে। যদি সত্যপ্রসাদের ব্যবহৃত কোনো জিনিসপত্র বা অন্যকিছু পাওয়া যায়। জরাজীর্ণ কুড়ে ঘরটার বারান্দার এক কোণে কোনোমতে একটা মানুষের একটুখানি শোবার জায়গা। বাবুয়ানি করার মতো নিজস্ব জিনিস-পত্র শেষের দিকে সত্যপ্রসাদের কিছুই ছিলনা। অতি সাধারণ একজন চাষীর পোশাক-আশাক জীবন-যাত্রার সঙ্গে তাঁর কোনোই পার্থক্য ছিলনা। সুতরাং জিনিসপত্র কিছুই পাওয়া গেলো না। শুধু তেলচিটে ময়লা বিছানাটুকু ঘ টতে ঘাঁটতে পাওয়া গেলো কয়েক টুকরো কাগজ। নৈশ-বিদ্যালয়ে যাতায়াত ক'রে চাষীরা এখন দু'চারজন ভালই পড়তে পারে। সত্যপ্রসাদের সেই ফেলে-যাওয়া কাগজের টুকরো-গুলো হাতে হাতে ঘুরতে লাগল সকলের। একটা কাগজে এলোমেলো কয়েকছত্র লেখা।

—'অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। চূড়ান্ত অত্যাচার। চাষীদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। খুব বেশীদিন গ্রেফতার এড়াইয়া থাকিতে পারিব বলিয়া মনে হয়না। তাহাতে ভয় পাইনা। দুঃখ রহিল, আন্দোলন জয়যুক্ত হইল না।—যেখানেই থাকি, বিলভাসানকে ভুলিব না। বিলভাসান আমার মাতৃভূমি। এখানকার মানুষেরা আমার ভাই।'—

লেখাগুলো প'ড়ে সকলের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। জল এলো চোখ ছাপিয়ে। সত্যপ্রসাদ যে তাদের কত আপনজন হয়ে গেছেন, সেটা যেন সবাই নতুন ক'রে উপলব্ধি করল। ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাল সবাই।

গ্রেফতারের পর সত্যপ্রসাদকে রাজসাহী জেলে চালান দেওয়া হ'লো। রাজবন্দী হিসেবে জেলে আটক করা হ'লো তাঁকে। খুনী কেসের আসামী জলধর। তাকেও চালান দেওয়া হ'লো রাজসাহী জেলে।

এইসব বিপর্যয়ের মধ্যে এলো আর এক চূড়ান্ত আঘাত। বিলভাসানের কৃষক-আন্দোলনকে শায়েস্তা করার জন্য বাঁকপুরের স্কুল-বাড়ীতে বসল পুলিশ-ক্যাম্প। চাষীদের মনের মধ্যে যেটুকু সাহস আর উদ্যম ছিল, ধীরে ধীরে দুমড়ে মুচড়ে তা নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকল।

॥ সাতাশ ॥

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে সরকারী উদ্যোগে 'বঙ্গীয় বর্গাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল' ('বেঙ্গল বর্গাদারস টেম্পোরারী রেগুলেশন বিল') তৈরী হয়। ঐ বছরেরই এপ্রিলে তৈরী হয় 'বঙ্গীয় জমিদারি ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল'। জমি থেকে বর্গাদার চাষীর উচ্ছেদ বন্ধ করা ছিল 'বঙ্গীয় বর্গাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল'-এর ঘোষিত নীতি। কিন্তু এই বিলে জোতদারদের বর্গাদার উচ্ছেদের নানারকম

সুযোগেরও ব্যবস্থা ছিল। আর 'বঙ্গীয় জমিদারি ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল'টি প্রচুর ক্ষতিপূরণ-সহ সরকার কর্তৃক জমিদারি ক্রয়ের বন্দোবস্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও এই বিল দু'টি তেভাগা-সংগ্রামকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল। কারণ, তেভাগার দাবি বৈধ রূপ পেয়েছিল এই বর্গাদার বিলের মাধ্যমে। বাংলার বিভিন্ন কৃষি কেন্দ্রিক অঞ্চলগুলিতে ১৯৪৭-এ তাই তেভাগার দাবি নতুন উৎসাহে উজ্জীবিত হয়েছিল। বিলভাসানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলায় তেভাগা-সংগ্রামকে টুঁটি টিপে মারার সব ব্যবস্থাই যেন অবলম্বন করা হ'লো। দিকে দিকে স্তিমিত হয়ে এলো তেভাগা আন্দোলন। বিলভাসানে তেভাগা সংগ্রামের যে দুর্ভেদ্য দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল, ১৯৪৮-এর গোড়া থেকেই ভাঙ্গন ধরল তাতে। অকথ্য পুলিশী-অত্যাচার, নেতৃস্থানীয় কিষাণ কর্মীদের নির্বিচার ধর-পাকড়, বিশেষ ক'রে বিলভাসানের কৃষক-আন্দোলনের মধ্যমণি সত্যপ্রসাদের গ্রেফতার—বিলভাসানের তেভাগা সংগ্রামের সামনে বিশাল বাধা রচনা করল। আর এটা চূড়ান্ত রূপ নিলো বাঁকপুর স্কুল-বাড়ীতে পুলিশ-ক্যাম্প বসার পর থেকে।

পুলিন খুন হবার পর জোতদারদের মধ্যে প্রবল ত্রাসের সঞ্চার ঘটল। সরকারী দপ্তরে লেখালেখি এবং নানারকম চাপ সৃষ্টি হতে লাগল। জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর, মৈমনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে তেভাগা-আন্দোলনের তখন প্রায় শেষ অবস্থা। বিলভাসান থেকেও তেভাগা আন্দোলনের মূলোচ্ছেদ করার ব্যবস্থা নেওয়া হ'লো এবার।

জেলাশাসক স্বয়ং বিষয়টার উপর নজর দিলেন। বিলভাসানের সামগ্রিক পরিস্থিতি চোখে চোখে রাখার জন্য বাঁকপুর স্কুলে পুলিশ-ক্যাম্প বসানো হ'লো। অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেলো স্কুল। বাঙালী অবাঙালী মিলিয়ে পঞ্চাশ জন সশস্ত্র পুলিশ প্রায় স্থায়ী নিবাস গড়ে তুলল বাঁকপুরের স্কুল-বাড়ীতে।

সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা এবং রাত্রে পুলিশেরা পালা ক'রে বিলভাসানের গ্রামগুলোতে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিয়ে বেড়াতে লাগল। চাষীদের পক্ষে কোনো সমাবেশ বা গোপন আলোচনার বিন্দুমাত্র উপায় রইল না। ক্যাম্পের পুলিশেরা এমনিতে চাষীদের উপর বিশেষ কোনো অত্যাচার করল না। শুধু পাহারার ব্যবস্থা রাখল জোরদার। তবে তাদের উপস্থিতিই একটা বিশেষ উপদ্রব সৃষ্টি করল। বাড়ী বাড়ী টহল দিয়ে বেড়াবার সময় কোনো বাড়ীতে ভালো কোনো খাবার-দাবার দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তা অধিকার করে নেয় তারা। কোনো রকম ওজর-আপত্তির তোয়াক্কা করে না। কারো গাছে হয়ত এক ছড়া কলা পেকেছে, বা গাছে এক কাঁদি ডাব হয়েছে, কিম্বা আর কোনো একটা তরকারি ফলেছে। একবার চোখে পড়লে আর রক্ষে নেই। চাষীদের বাড়ীর পোষা হাঁসগুলোও লোপাট হয়ে যেতে থাকল মাঝে মাঝে। শীতকালে হাঁসের মাংস বড়োই সুস্বাদু। মুখ বুজে এসব অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া উপায় রইল না কোনো।

মাঝে-মধ্যে দু'একটা ব্যতিক্রমও চোখে পড়ল। সেদিন সকালের দিকে পুলিশের একটা ছোটো দল বাঁকপুর গ্রামের মধ্যে দিয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। ফুলমতির

বাড়ীর সামনের দিকে ছোটো একটা ডোবা। সেখানে এসে দাঁড়াল দলটা। ডোবার কূলে পাঁচ ছ'টা হাঁস গেঁড়ি-গুগ্‌লি খেয়ে এসে কুণ্ডলী পাকিয়ে বিশ্রাম করছিল। এগুলো ফুলমতির পোষা হাঁস ওর মধ্যে দু'টোর চেহারা আবার সবার থেকে আলাদা। যেমন হৃষ্টপুষ্ট, তেমনি বাহারী পালক। ঐ হাঁসদু'টো বিষাণের বড়োই প্রিয়। হাঁসগুলোকে দেখে ফিচেল লোভের হাসি হাসল পুলিশগুলো। একজন আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে খপ্‌ ক'রে দু'টো হাঁসের ডানা চেপে ধরল। ঐ হাঁস-দু'টোই বিষাণের সব থেকে প্রিয়। অন্য হাঁসগুলো ভয় পেয়ে ডানা ঝটপট করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। হাঁস দু'টোকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে চলল পুলিশেরা। দুপুরের আহারটা ভালোই জমবে।

খবর পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটল বিষাণ। তার প্রিয় হাঁসদু'টোকে পুলিশেরা নিয়ে গেছে শুনে দিক-বিদিক জ্ঞান রইল না তার। অগত্যা ফুলমতিও এগিয়ে গেলো বিষাণের পিছন পিছন। পুলিশদের কাছে গিয়ে হাঁস দু'টো ফিরে পাবার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি কান্নাকাটি করল বিষাণ। কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হ'লো না। একজন ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। তারপরে ওরা হাঁস দু'টো নিয়ে চলে গেলো। কী আর করবে বিষাণ। ফিরে এলো কাঁদতে কাঁদতে। পুলিশের এইসব উপদ্রবের কথা চিন্তা ক'রে নিষ্ফল আক্রোশে মনে মনে গজরাতে থাকল ফুলমতি।

ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এলো একজন পুলিশ। হাতে তার ঐ হাঁস দু'টো। খাকি জামা প্যাণ্ট, টুপি আর বন্দুকের আড়ালে বয়স বোঝা মুশকিল। তবে ভালো ক'রে তাকালে বোঝা যায়, বয়স ওর বেশী নয়। বাইশ পঁচিশের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে বয়সটা। ফুলমতিদের বাড়ীর সামনে এসে বিষাণকে দেখে কাছে ডাকল। বিষাণ এগিয়ে এলে বলল—'এই যে বেরাদার, তোমার হাঁস ফেরত নাও।

বিষাণ খুব অবাক হ'লো। কিন্তু তবু ছুটে এসে হাঁস দু'টোকে কোলে নিয়ে জড়িয়ে ধরল।

ইতিমধ্যে খবরটা রটে গেছে আশেপাশে। এ-বাড়ী ও-বাড়ী থেকে কৌতূহলী চোখগুলো উঁকি মারতে লাগল। পুলিশ লুণ্ঠিত মাল ফেরত দিতে এসেছে, এ-ঘটনায় তাজ্জব ব'নে গেলো সবাই। বিশেষ ক'রে এমন চমৎকার দু'টো হৃষ্টপুষ্ট হাঁসের লোভ তারা কী ক'রে সামলালো, এটা অবাক হয়ে ভাবার মতো ব্যাপার বই কী।

পুলিশটি বিষাণের কাঁধে হাত রেখে বলল—'তুমি আর কেঁদোনা বেরাদার! এই তো তোমার হাঁস দিয়ে গেলাম।'

তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে একটু লাজুক সরল হাসি হেসে ফিরে চলে গেলো। রুক্ষ রূঢ়-প্রকৃতির পুলিশের মধ্যে ঘরের ছেলের মতো এই সহজ স্নিগ্ধ আচরণে সকলে বিস্ময় অনুভব করল।

সেই থেকে ঐ পুলিশ ছেলেটি মাঝে মাঝেই বিষাণদের বাড়ীতে আসে। ওর নাম ইস্‌মাইল। বিষাণকে ডাকে 'বেরাদার' ব'লে। বিষাণের সঙ্গে নানারকম গল্প করে। বিষাণের মা ফুলমতিকে ডাকে 'খালা মা' ব'লে। 'খালা মা' অর্থাৎ

মাসী। ফুলমতি প্রথমদিকে ছেলেটির এই আচরণকে সহজভাবে নিতে পারে নি। হাজার হোক, পুলিশ তো! কিন্তু ফুলমতিও যেন আস্তে আস্তে কখন্ ছেলেটির প্রতি একটা মায়ায় জড়িয়ে পড়ল। আপন মাসীর মতোই একটা মাতৃ-স্নেহের টান অনুভব করে ইস্‌মাইলের উপর। আর বিষাণ তো ইস্‌মাইলদা বলতে অজ্ঞান। ইস্‌মাইলকে নিয়ে একটা কবিতা পর্যন্ত লিখে ফেলল।

একদিন কথায় কথায় ইস্‌মাইল ফুলমতিকে বলল—'খালা মা,—তোমাদের দেশে চাকরী করতে এসেছি। আমাদের কাজ হ'লো, তোমাদের জব্দ করা। পুলিশের চাকরি, সরকারের নোকর আমরা। কিন্তু বিশ্বাস করো খালা মা, এ চাকরী আমার ভালো লাগে না। তোমাদের দেশে এসে, তোমাদের দেখে, আমার বাড়ীর কথা মনে পড়ে। আমার দেশ মুর্শিদাবাদ জেলায়। তোমাদের মতো এই রকম এক গ্রামে আমার বাড়ী। সেখানে আমার বুড়ো মা-বাপ, ভাইবোন রয়েছে। নিজেদের জমি-জায়গা নেই। বাবা এক জোতদারের জমি বর্গাচাষ করে। কিন্তু ধার-কর্জ, দেনাদায় মিটিয়ে ফসলের ভাগ যা হাতে আসে, তাতে সংসার চলে না। জোতদারের জুলুমের শেষ নেই। তোমাদের এখানকার থেকেও খারাপ অবস্থা। ছোটোবেলায় কতদিন যে পেটভরে খেতে পাইনি!—গ্রামের স্কুলে কয়েক ক্লাস লেখাপড়া করেছি। চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে এই পুলিশের চাকরিটা পেয়ে গেলাম। অনেক জায়গায় বদলি হয়েছি। এখন তোমাদের দেশে এসেছি তোমাদের জব্দ করতে। চাষীর ছেলে হয়েও এসেছি চাষীদের মেরে ঠাণ্ডা করতে! কী সাধের চাকরিই না করি!'

বলতে বলতে ইস্‌মাইলের কণ্ঠস্বর কেমন যেন উদাস, অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কিন্তু নিমেষেই আবার আত্মবিস্মৃত অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠে। একটু হেসে ফেলে বলে,—'এই দেখো খালা-মা, কী কথায় কী এসে গেলো! চাকরি না করলে খাবো কি? কি বলো—খালা মা?'

ব'লেই রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায়।

কিন্তু সবাই তো আর ইসমাইল নয়। এক আধজনের মনে যদি ইস্‌মাইলের মতো কোনো দুর্বল জায়গা থেকেও থাকে, বাইরে তার কোনো প্রকাশ নেই। বিলভাসানের গ্রামগুলোতে রুক্ষ মেজাজে মত্ত-মাতঙ্গের মতো তারা টহল দিয়ে বেড়ায়। কোনোদিকে একটু বেচাল দেখলেই ধমকে ওঠে। তটস্থ ক'রে রাখে সকলকে।

তবু যাহোক এক রকম চলছিল। কিন্তু হঠাৎ ঘটল একটা অঘটন। বিলভাসানের নারী-পুরুষেরা সেই মর্মন্তুদ ঘটনা প্রত্যক্ষ ক'রে অসহায় ক্ষোভে বেদনায় যেন নির্বাক হয়ে গেলো।

নিখিলের যে দেশী পিস্তলটা ছিল সৌরভীর কাছে, সেটা নিখিল আর ফেরত নিতে পারেন নি। পুলিনকে যেদিন খুন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেদিন সভাশেষে নিখিল পিস্তলটা রেখে যান সৌরভীর কাছে। কথা ছিল, সুযোগ বুঝে একদিন এসে পিস্তলটা নিয়ে যাবেন নিখিল। কিন্তু তার পর থেকেই বিলভাসানে একটার পর একটা ঘটনা এমনভাবে ঘটে চলেছে যে, নিখিল আর

বাঁকপুরে আসার সুযোগই পাননি। আর এখন তো বাঁকপুরে পুলিশের ক্যাম্পই বসে গেছে। অসাবধানে চলাফেরা করতে গেলেই ধরা পড়তে হবে পুলিশের হাতে। সত্যপ্রসাদ তো আগেই গ্রেফতার হয়ে গেছেন। এখন পুলিশের সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরছে নিখিলের পিছনে। সুতরাং এখন নিখিলের পক্ষে বাঁকপুরে আসা একেবারেই অসম্ভব।

সৌরভী সেটা বুঝতে পেরে নিজেই সতর্ক হয়েছে। পুলিশ যে বিলভাসানের চাষীদের ঘরে ঘরে মজুত অস্ত্রেরও সন্ধান রাখছে, এতো জানা কথা। কারো কাছে কোনো অস্ত্র পাওয়া গেলে, সহজে রেহাই দেবে না পুলিশ। গগনের সেই ভয়ানক শাস্তির কথা মনে পড়লে এখনো গা শিউরে ওঠে। চাষীদের যার কাছে যে অস্ত্র ছিল, সব এখানে সেখানে মাটির তলায় পুতে ফেলেছিল।

সৌরভী পিস্তলটা নিয়ে বিষম ভাবনায় পড়েছিল। যে সে অস্ত্র নয়, একেবারে পিস্তল। এখানে কারো কাছেই এ জিনিস নেই। কোনোভাবে পুলিশ যদি টের পায়, তাহলে বিপদের আর শেষ থাকবে না। তাই খুবই চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল সৌরভী। তারপর নিজেই বুদ্ধি বের করেছিল। ভালো ক'রে ন্যাক-ড়ায় জড়িয়ে পিস্তলটাকে একটা নতুন হাঁড়ির মধ্যে পুরেছিল। তারপর মুখ বন্ধ ক'রে হাঁড়িটাকে পুঁতে রেখেছিল ঘরের পিছনে মাটির নিচে। বিশ্বাস ক'রে কাউকে কথাটা বলতেও পারেনি সৌরভী। যা দিনকাল চলছে। কোথা থেকে কী হয়ে যায়, কে জানে। একজনকে হয়তো কথাটা ভরসা ক'রে জানানো যেতো। একটা সুপরামর্শ পাওয়াও যেতো তাঁর কাছে। কিন্তু কোথায়ই বা এখন আর পাওয়া যাবে তাঁকে! কোথায় কোন্ রাজসাহী জেলে এখন কাটছে তাঁর দিনগুলো!

সত্যপ্রসাদের কথা মনে হ'লেই এখনো যেন সৌরভীর বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল ক'রে ওঠে। আর কী কোনোদিন দেখা হবে তাঁর সাথে! কোনোদিনই সত্যপ্রসাদ প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাননি তার দিকে। তবু সত্যপ্রসাদের কথা মনে হতেই কী যেন এক সোহাগে, আনন্দে সৌরভীর সারা দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। একটা দিন, শুধু একটা দিন মাত্র সৌরভী তাঁকে কাছে পেয়েছিল একান্ত আপনজনের মতো। সত্যপ্রসাদের সেই প্রথম জেল থেকে মুক্তি পাবার দিনটি! সারা রাত ধ'রে আনন্দ ভোজ চলেছিল। মনের আশ মিটিয়ে সৌরভী সেদিন সত্যপ্রসাদের সেবা-যত্ন করেছিল। হাসিমুখে কত কথা বলেছিলেন সেদিন সত্যপ্রসাদ। সৌরভীর বঞ্চিত হৃদয়ের সমস্ত শূন্যতাটুকু যেন সেদিন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

আজ সে সব ঘটনা নিছক স্মৃতিমাত্র। কিন্তু সেই স্মৃতিটুকুকেই উল্‌টে-পাল্‌টে সৌরভীর কত নিরালা মুহূর্ত উন্মনা হয়ে থাকে আজও। প্রথমদিকে কত দিন বেহায়ার মতো কত কথা বলেছে ওঁকে সৌরভী। সে সব কথা মনে পড়লে এখন যেন লজ্জায় মরমে মরে যায়। সৌরভীর সমস্ত হৃদয় যেন এখন একটি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ফুলের মতো। সত্যপ্রসাদের পায়ে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে কৃতার্থ হতে চায়। চারিদিকের নানা বিপদ-আপদের মধ্যে প'ড়ে সত্যপ্রসাদের কথা যেন আরও

বেশী ক'রে মনে পড়ে আজকাল। সত্যপ্রসাদের সেই সাহসী দরদভরা কথাগুলো যেন চোখ বুজলেই মনের পর্দায় ভাসতে থাকে।

পিস্তলের হাঁড়িটা যেখানে লুকিয়ে রেখেছে, সেখানে মাঝেমাঝেই চুপ ক'রে এসে দাঁড়িয়ে থাকে সৌরভী। সব কিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। আবার বাস্তব চিন্তায় সম্বিৎ ফেরে। নিখিলবাবুকে কী ক'রে যে পিস্তলটা ফেরত দেবে! পিস্তলটা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত যেন স্বস্তি নেই সৌরভীর।

একদিন বিকেলের দিকে বকচরা গ্রাম থেকে একজন চাষী এলো সৌরভীদের বাড়ী। মাথায় একটা ধামা। তাতে কিছু খেসারি কলাই যেন খেসারি কলাইয়ের বীজ দিতে বা নিতে এসেছে। পুলিশের হাতে পড়লে একটা কিছু তো বলতে হবে। চাষীটি কিছুক্ষণ সৌরভীর বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলল। হুঁকো খেলো।

তারপর সৌরভীকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল—'আজ নিখিলবাবু আসবেন। তোমার কাছে নাকি তাঁর কী একটা জিনিস রইছে। তাই নিতি আসবেন। সন্ধ্যেরাত পার হলি জিনিসটা নিয়ে তোমাদের পুকুরপাড়ে বড়ো জাম-গাছটার তলায় থাকবা। আর নিখিলবাবু কইয়ে দেছেন, কথাডা যেন গোপন থাকে।'

লোকটা যেমন এসেছিল, তেমনি আবার চলে গেলো। ভীষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল সৌরভী। এ অবস্থায় কি নিখিলবাবুর আসাটা ঠিক হবে? সারাদিনই পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাতেও টহল দিচ্ছে। এর মধ্যে নিখিলবাবুর আসা মানে—নিশ্চিত বিপদ ডেকে আনা। কিন্তু এখন আর কিছু করারও উপায় নেই। নিখিলবাবু একবার যখন আসবেন বলেছেন, তখন আসবেনই। ভীষণ জেদী আর একরোখা মানুষ। কিন্তু সৌরভী এখন কী করে! কাউকে যে কথাটা বলবে, তারও উপায় নেই। বারবার নিষেধ ক'রে দিয়েছেন নিখিলবাবু।

সন্ধ্যে হতেই সৌরভী সকলের চোখ এড়িয়ে হাঁড়িটা তুলল। ন্যাকড়া-জড়ানো পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রাখল। তারপর সন্ধ্যে গড়িয়ে রাতটা একটু গভীর হতেই নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল পুকুরপাড়ে বড়ো জামগাছটার তলায়। চারিদিকে নিঃশব্দ নিরেট অন্ধকার। মধ্য-ফাল্গুনের উদাস দক্ষিণে হাওয়া গাছগুলোর ডালে পাতায় হাল্কা হাতে বিলি দিয়ে চলেছে। আলোর কণা ছড়িয়ে ইতস্ততঃ উড়ে বেড়াচ্ছে জোনাকিগুলো। কোমরে গোঁজা পিস্তলটার উপর হাত রেখে নিঃশব্দে অপেক্ষা ক'রে থাকল সৌরভী। সময় যেন আর কাটতে চায় না। গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে অন্ধকারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বোধহয় একটুখানি ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল সৌরভীর মুখের উপর।

চমকে উঠে সৌরভী মুখের উপর হাতের আড়াল দিলো। নিজেকে লুকোতে চাইল গাছের আড়ালে। কিন্তু গাছের আড়ালের মনুষ্য-মূর্তিটা তখন ওদের নজরে পড়ে গেছে। দশ বারোজন পুলিশের একটা দল বেরিয়েছিল পাশের গ্রামগুলোতে টহল দিতে। ফিরতে ফিরতে বেশ রাত্রি হয়ে গেছে। রাস্তা সংক্ষিপ্ত করার জন্য সৌরভীদের পুকুর-পাড়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছিল কোনাকুনি। মাঝে মাঝেই টর্চের আলো ফেলে নজর রাখছিল চারিদিকে। হঠাৎ সেই টর্চের আলো গিয়ে

পড়ে সৌরভীর উপর। অন্ধকারে এত রাত্রে একটা লোকের এখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সন্দেহজনক বৈকী! দু'জন পুলিশ দৌড়ে ছুটে এসে ধ'রে ফেলল সৌরভীকে। ওরা অবাক হয়ে দেখল, লোকটা পুরুষ নয়। মেয়ে মানুষ। দেখতে দেখতে গোটা দলটা এসে সৌরভীকে ঘিরে ফেলল।

একজন পুলিশ সৌরভীর মুখের উপর টর্চের আলো ফেলে বলল—'বল্, এখানে কি করছিলি ?'—

সৌরভী নিরুত্তর। পাশ থেকে আর একজন সৌরভীর হাত মুচড়ে ধ'রে জোরে ঝাঁকুনি দিলো। সেই ঝাঁকুনিতে হঠাৎ সৌরভীর কোমর থেকে ছিটকে পড়ল পিস্তলটা। তাড়াতাড়ি একজন গিয়ে কুড়িয়ে নিলো। ন্যাকড়ার পর্দাটা খুলতেই সবাই অবাক হয়ে গেলো। এ-জিনিস এ মেয়েমানুষটার হাতে কোথা থেকে এলো ? যেখান থেকেই আসুক, মেয়েমানুষটা যে বিপজ্জনক, তা ওরা বুঝল।

ওদের দলপতি পিস্তলটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। মুখে শুধু উচ্চারণ করল—'আচ্ছা—!' তারপর সৌরভীর মুখের উপর টর্চের আলো ফেলে জিজ্ঞাসা করল—'এ পিস্তল তোকে কে দিয়েছে বল্ ?'

সৌরভী যথারীতি নিরুত্তর। তখন সৌরভীর আঁচল দিয়েই ওর মুখটা ভালো ক'রে বেঁধে ফেলা হ'লো। মেয়েটা চীৎকার করলে লোক জানাজানি হবে। সেটা বন্ধ করার জন্যই এই সতর্কতা। তারপর ওকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হ'লো পুলিশ-ক্যাম্পে।

একদল হিংস্র নেকড়ের মধ্যে একটিমাত্র অসহায় মেয়ে। শুরু হ'লো জেরা। যেমন ক'রে হোক স্বীকারোক্তি আদায় করতেই হবে।

—'বল্ কোথায় পেলি এ পিস্তল ?'

সৌরভী নির্বাক।

একটা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো সৌরভীর ঘাড়ের উপর ঘুরে ঘুরে ছ্যাঁকা দিতে থাকল। শিউরে উঠল সৌরভীর সারা শরীর। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—'এতেও হবে না দেখছি, আরো ওষুধ লাগবে।'—

একটা ভারী বুটপরা পা ধীরে ধীরে চেপে বসতে থাকে সৌরভীর পায়ের উপর।

—'এখনো বল্, কোথায় পেলি এ পিস্তল ?'

সৌরভীর পায়ের উপর গুরুভার বুটের চাপ তীব্র হয়ে ওঠে। —অসহ্য যন্ত্রণা। সৌরভীর চোখের সব আলো যেন নিভে আসতে চায়।

—'উঃ মা, আর যে পারিনা ! এট্টু জল !'

মগে ক'রে জল আসে। মুখের কাছে মগ ধরলে ঢক্ ঢক্ ক'রে জল খায় সৌরভী।

—বল্ কোথায় পেলি পিস্তল ? কে দিয়েছে তোকে ?'

সৌরভী নিরুত্তর। —এবার ওর দুই পায়ের উপর শুরু হ'লো ভারী বুটের তীব্রতর হিংস্র পেষণ।

সৌরভীর শেষতম সহ্যশক্তিটুকুও বুঝি এবার হারিয়ে যায়। টলতে টলতে অস্ফুটে বলে—'বল্‌তিচি—বল্‌তাচ—'

সৌরভীর পায়ের পাতা থেকে বুট দু'টো সরে যায়। সারা শরীর টলতে থাকে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে হাজার ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। কিন্তু সেই আচ্ছন্ন চেতনাতেও হঠাৎ মনের মধ্যে ভেসে ওঠে সত্যপ্রসাদের শান্ত গম্ভীর নির্ভীক মুখখানা। সৌরভীর ঠোঁট দু'টো শক্ত হয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে বসে। কঠিন এক দায়িত্ববোধ যেন ওকে ঋজু ক'রে তোলে।

—'কি হ'লো, কথার জবাব দে।'

সৌরভীর গলা থেকে হঠাৎ তীব্র একটা চীৎকার বাতাসকে ফালা ফালা ক'রে দেয়—

—'না, না—আমি বলবো না।'

ঠাস্‌ ক'রে একটা চড় এসে পড়ল ওর গালে। পা দু'টো ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ওর এলায়িত দেহটাকে জাপটে ধরে একটা রোমশ বাহু।

—'বলতে তোকে হবেই হারামজাদী। যাবি কোথায় না ব'লে ?'

সৌরভীর ক্লিষ্ট পীড়িত দেহটাকে ওরা টেনে নিয়ে গেলো ক্যাম্পের ওপাশে অন্ধকার জায়গায়। এবং সেখানে শুরু হ'লো এক ভিন্নতর অত্যাচারের পালা।

এরও ঘণ্টাখানেক বাদে এলেন নিখিল। অন্ধকারে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন জামগাছটার তলায়। এদিক ওদিক খুঁজলেন। সৌরভীর দেখা না পেয়ে বারদুয়েক অনুচ্চকণ্ঠে ওর নাম ধ'রে ডাকলেনও। কিন্তু সৌরভীর কোনো সাড়া পেলেন না। কী করবেন, কিছু স্থির করার আগেই নিখিল শুনলেন, ও পাশের বড়ো রাস্তাটা থেকে পুলিশের হুইসেলের তীব্র শব্দ শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে জোরালো টর্চের আলো। টহলদার কোনো পুলিশ-দল বেরিয়েছে রাতের ডিউটিতে। নিখিল আর এখানে থাকা সমীচীন বোধ করলেন না। উল্টো-মুখো ফিরে তাড়াতাড়ি পা বাড়ালেন ক্ষেত বিলের গভীর অন্ধকারের দিকে।

পরদিন বাঁকপুর গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের এক নির্জন ছাড়া-ভিটেয় পাওয়া গেলো সৌরভীর অচেতন দেহটা। সারা গায়ে কোথাও এক টুকরো কাপড় নেই। হাজারটা শকুন যেন ছিঁড়ে খেয়েছে ওকে। দুই পায়ের ফাঁকে ঊরু বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে নামছে রক্তের ধারা। বুক দু'টো ক্ষত-বিক্ষত।

ধরাধরি ক'রে সৌরভীর অচেতন দেহটা বাড়ী নিয়ে যাওয়া হ'লো। জ্ঞান ফিরল পুরো একদিন পার ক'রে। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই আবার জ্ঞান হারাল। দাঁতে দাঁত আটকে গেলো। সৌরভীর মৃগী-রোগটা বেশ কিছুদিন ধ'রে চাপা ছিল। সেটা নতুন ক'রে দেখা দিলো আবার। সাতদিন ধ'রে চলল যমে-মানুষে টানাটানি। তারপর সৌরভী সুস্থ হ'লো। কিন্তু সুস্থ হয়ে যখন উঠে বসল, তখন দেখা গেলো, ওর চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। যেন এ-জগতের মানুষই নয়। কখনো আপন মনে হাসছে, বিড়বিড় ক'রে কথা বলছে। আবার কখনো যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে থর থর ক'রে কাঁপে। ঘরের কোণে লুকিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে।

বাপ-ভাইয়ের সংসারে আদরের মেয়ে ছিল সৌরভী। বিয়ের পরে মার খেলো ভাগ্যের হাতে। স্বামীর ঘরের স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'লো। বঞ্চিত জীবন নিয়ে স্থায়ী বাসা নিলো বাপের বাড়ীতে। উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রহীন ব'লে চাষীদের ঘরে ঘরে ছিল ওর বদনাম। আবার সেবা-পরায়ণ, কর্মঠ স্বভাবের জন্য ওর আদরও ছিল সবার কাছে। তারপর সারা বিলভাসান জুড়ে একদিন এলো এক নতুন আলোর ঢেউ। তাতে আর সকলের মতো মেতে উঠেছিল সৌরভীও। সত্যপ্রসাদকে কেন্দ্র ক'রে মনের বেদীতে পেতেছিল এক অজানা দেবতার সিংহাসন। কৃষক-সংগ্রামের কর্ম-মুখর উন্মাদনা এবং এক স্মৃতি-ঘেরা জীবনের হাতছানি নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল তাকে। কিন্তু এক নিষ্ঠুর করাল ফুৎকারে তার জীবনের সব স্বপ্ন, অনুভূতি হারিয়ে গেলো বিস্মৃতির অতলে। সৌরভী বদ্ধ পাগলে রূপান্তরিত হ'লো।

সমস্ত বিলভাসানের বুক জুড়ে একটা পাথর-চাপা বেদনা যেন গুমরে কেঁদে উঠল।

॥ আঠাশ ॥

চৈত্রের মাঝামাঝি এসে বাঁকপুরের স্কুল-বাড়ী থেকে পুলিশ-ক্যাম্প তুলে নেওয়া হ'লো। পুলিশ-ক্যাম্প রাখার আর কোনো প্রয়োজনও ছিল না। বিলভাসানের কৃষক-আন্দোলনের সেই জঙ্গী চেহারার বিন্দুমাত্রও এখন আর অবশিষ্ট নেই। আন্দোলন বিপর্যস্ত। কৃষক-কর্মীরা ছত্রভঙ্গ। নেতারা পলাতক। কেউ কেউ জেলে। সুতরাং এ-অবস্থায় আর পুলিশ-ক্যাম্প রাখা অর্থহীন।

ক্যাম্প উঠে যাবার দিন জেলা-শাসক স্বয়ং এলেন বিলভাসানে। সভা করলেন বাঁকপুরের স্কুল-মাঠে। সাতদিন আগে থেকে এ-বিষয়ে বিলভাসানের প্রতি গ্রামে নোটিশ-জারি করা হয়েছিল। জেলা-শাসক মহোদয়ের সভায় সকলকে উপস্থিত থাকার জরুরী নির্দেশ প্রচার করা হয়েছিল। সঙ্গে অবশ্য একথাও জানানো হয়েছিল যে, যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে, তাদের ছাড়া অন্য সকলের উপর থেকে সমস্ত রকম গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া হ'লো। নির্বিচারে ধর-পাকড় বা বিনা বিচারে আটক প্রভৃতি ব্যবস্থাও রদ করা হ'লো।

উপায়ান্তরহীন চাষীরা বাধ্য হয়েই জেলা-শাসকের সভায় উপস্থিত হ'লো। বিশাল জমায়েতে ভরে গেলো স্কুল-বাড়ীর মাঠ। প্রচুর পুলিশ-পাহারায় সভা বসল। জেলা-শাসক অবাঙালী মুসলমান। খানদানী লোক। বাংলা জানেন না। সঙ্গে দোভাষী ছিলেন। জেলা-শাসকের ইংরেজী বক্তৃতা সহজ বাংলায় অনুবাদ ক'রে জানানো হ'লো চাষীদের কাছে। বক্তৃতার মূল বক্তব্য হ'লো—চাষীদের দাবি-দাওয়া সদাশয় সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন, সদাশয় সরকারের বিরুদ্ধে কোনোরূপ হিংসাত্মক পন্থা গ্রহণ অমার্জনীয় অপরাধ, ভবিষ্যতে এ-জাতীয়

ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে—ইত্যাদি।

চাষীরা ফ্যালফেলে বোবা দৃষ্টি মেলে জেলা-শাসক মহোদয়ের সারগর্ভ নীতি-বাচক বক্তৃতা শুনল। এছাড়া আর কী-ই বা করার আছে! তবে আর কিছু না হোক, বিলভাসান থেকে পুলিশ-ক্যাম্প তুলে নেওয়া হবে, এ সংবাদে এত হতাশার মধ্যেও সকলে যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যতীনের সঙ্গে পরিচয় করলেন জেলা-শাসক। স্কুলের কাজকর্ম যথাবিধি পরিচালনার নির্দেশ দিলেন। স্কুলের উন্নয়নের বিষয়ে আশ্বাসও দিলেন। জেলা-শাসকের সভার পরদিনই পুলিশদল চলে গেলো স্কুল-বাড়ী খালি ক'রে। একটা নিদারুণ বিভীষিকা যেন নেমে গেলো বুকের উপর থেকে।

পুলিশেরা চলে যেতেই যতীন আবার গোছগাছ ক'রে স্কুলের কাজ শুরু করল। ছাত্রদের কলকণ্ঠে মুখরিত হয়ে উঠল স্কুল-বাড়ী। পুলিশেরা চলে গেলেও তাদের একটা স্মৃতি অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। পুলিশদলের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিল অবাঙালী। তারা ছাতু খেতে অভ্যস্ত। কিন্তু বিলভাসানে ছাতু পাবে কোথায়? ভাত খেলে তাগদ কমে যাবার ভয়ে তারা এক কৌশল করেছিল। স্কুল বাড়ীর টিনের চালের উপর সারি সারি বস্তা বিছিয়ে দিতো। তারপর হাঁড়ি-ভঁতি ভাত রান্না ক'রে সেই ভাত ঢেলে দিতো বস্তার উপর। রোদের তাপে ভাতগুলো শুকিয়ে কুড়মুড়ে হয়ে উঠত। তারপর সেই শুকনো ভাত গুঁড়ো ক'রে ছাতু বানিয়ে নিতো ওরা। বিলভাসানের চাষীদের মা-লক্ষ্মী অন্ন ছাতুর মধ্যে ছত্রাখান হ'ত।

পুলিশেরা চলে যাবার পর ওদের সেই ভাত-শুকোনো বস্তাগুলো রয়ে গেছিল। স্কুল-ঘরের খুঁটির বাতায় ঝোলানো বস্তাগুলো পুলিশদলের পরিত্যক্ত পতাকার মতো দোল খাচ্ছিল। স্কুলের টিফিন পিরিয়ডে বস্তাগুলো খুলে নিলো ছেলেরা। দড়ি দিয়ে বেঁধে গোল পাকিয়ে ফুটবল বানালো। তারপর মনের আনন্দে ফুটবল খেলল সবাই মিলে।

বিলভাসানের বুকের উপর দিয়ে এখন চৈত্রের খর-রোদ বয়ে যায়। স্বপ্ন নেই। দুঃস্বপ্নও নেই। শুধু এক ক্লান্ত হতাশ্বাস চারিদিকে গুমরে গুমরে পাক খেয়ে ঘুরে মরে। শস্যহীন ক্ষেত-বিলের বুক চিরে আচমকা কোনো ঘূর্ণিঝড় ওঠে। শুকনো ঘাস পাতা উড়াতে উড়াতে সেই আউলে-বাউলে বাতাস মিলিয়ে যায় দূরের দিগন্তে। প্রেত-ছায়ার মতো চাষীদের অবয়ব জুড়ে দোল খায় কী যেন এক সব-হারানোর বেদনা। সমগ্র সত্তায় যেন কাঁপন ধরিয়ে দেয় শ্মশানের শূন্যতা। দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততায়, কর্মের অবসরে, পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দ ভাষায় সবাই যেন একটাই প্রশ্ন করে,—'কেন এমন হ'লো, কেন এমন হ'লো!'

সেদিনের সেই প্রচণ্ড ধকলের পরেও সুস্থ হয়ে উঠেছে গগন। বাঁচবার কথা ছিল না। তবু বেঁচেছে। কিন্তু গগনের সেই প্রাণ-শক্তির উৎস যেন শুকিয়ে গেছে। শারীরিকভাবেও দুর্বল হয়ে গেছে অনেক। ডান পা-টাই চোট খেয়েছিল

বেশী। ধীরে ধীরে ডান পা-টা শুকিয়ে সরু হয়ে কমজোরী হয়ে আসছে। তবু কামারশালায় বসে গগন। একটু-আধটু কাজ-কর্ম করার চেষ্টাও করে। কষ্টীরাম যথারীতি তার শাগরেদ-গিরি করে। দুর্বল হাতে সাঁড়াশি দিয়ে গরম লোহার টুকরো নেহাইয়ের উপর চেপে ধরে গগন। তারপর দু'জনের হাতের হাতুড়ি ঠকাঠক ক'রে পড়ে সেই লোহার উপর।

হাতুড়ি ঠুকতে ঠুকতে গগন কখন্ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হাতুড়ি ফেলে ব'সে থাকে চুপ ক'রে। কষ্টীরাম ব'লে ওঠে—'কি হলো দাদা, হাতুড়ি চালাও। লোহা যে ঠাণ্ডা মা'রে গেলো!'

গগন তাড়াতাড়ি হাতুড়িটা কুড়িয়ে নেয়। আবার অভ্যাস-মাফিক হাতুড়ি চালাতে যায় নেহাইয়ের উপর। কষ্টীরাম এক পলক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর নিজের হাতের হাতুড়িটা ফেলে দিয়ে বলে—'আজকের মতন কাজ ছাড়ান্ দাও দাদা। তোমার শরীলডা যেন বড়ো বেজুত ঠেক্‌তিছে।'

গগন আর কোনো কথা বলে না। নিঃশব্দে উঠে পড়ে। তেলচিটে ময়লা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে গুটি-সুটি মেরে।

প্রায় রোজই আজকাল এ-রকম ঘটনা ঘটছে। কোনোদিন বা কিছুই কাজ হাতে থাকে না। তবু দু'জনে মিলে শূন্য নেহাইয়ের উপরে ঠকাঠক্ ক'রে হাতুড়ি পেটায়। তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দু'জনে দু'দিকে ফিরে চুপ ক'রে ঝিম্ মেরে বসে থাকে। গগন আর কষ্টীরামের দিনগুলো এখন বুঁদ হয়ে থাকে এই নতুন খেলায়।

এখন চোত-বোশেখের সময়। ফসলহীন, শূন্য ক্ষেত। রাখাল ছেলেরা সেই শূন্য ক্ষেতে এড়া গরুর পাল চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। অবাধ ক্ষেত প্রান্তরের উদাস হাওয়ায় কখন্ যেন দোলা লাগে তাদের মনে। গলায় সুর আসে। ভুলে-যাওয়া গানের কলি গুনগুনিয়ে ওঠে মনে। তারা গান ধরে—'শোন্‌রে ও ভাই চাষা, যে মাটিতে ফসল ফলাস্, যে মাটিকে কথা বলাস্, সে মাটি তোর নয়রে আপন, শুধু চোখের জলে বাঁধলি মিছে বাসা।'—নিতাই কবিয়ালের সেই আগুন-ঝরানো গানের কলি। একজনের গলা থেকে ছড়িয়ে পড়ে আরেকজনের গলায়। চাপা কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে কখন উদ্দাম হয়ে উঠতে চায়।

পাশে হয়ত কোথাও থাকে এক সাবধানী চাষী-বুড়ো। বাঁ-হাতের তালু দিয়ে চোখের পিচুটি মোছে। তারপর ডান হাতের পাচন-বাড়িটাকে বাগিয়ে ধরে শক্ত ক'রে। রাখাল ছেলেগুলোকে ধমক লাগায়—'ওরে তোরা চুপ কর্। ঐ সব্বোনেশে গান আর গাস্‌নে।'—

সারা বিলভাসানের বায়ুমণ্ডলে যেন সেই সাবধান-বাণী আবর্তিত হয়। চুপ, চুপ। সবাই চুপ। বোবা হয়ে যাও সবাই। প্রতিবাদের ভাষা ভুলে যাও। প্রতিবাদের গান ভুলে যাও। ঐ ভাষা, ঐ গান যে বড়ো সর্বনেশে। ভয়ের এক করাল গ্রাস যেন গিলে খায় বিলভাসানকে। একটু বেচাল হ'লেই চারিদিকে সাবধানী গলায় নিষেধের আর্ত হাহাকার ওঠে। বিলভাসানের সব অভিব্যক্তি বিমূঢ়, নিথর হয়ে থমকে যায়।

কৈলাসের ফুটো চালের ভিতর দিয়ে এখন্ চাঁদের আলো খেলা করে ঘরের মধ্যে। বাড়ী লুঠ করার দিন পুলিশেরা লাঠির খোঁচা মেরে মেরে চাল ফুটো ক'রে দিয়েছিল। তারপর আর সে ঘর মেরামত করার সুযোগ হয়নি। সারা ঘর-বাড়ী জুড়ে যেন এক লক্ষীছাড়া দীনতা।

সন্ধ্যে হ'লেই চাঁপা দক্ষিণের খোলা বারান্দায় চুপচাপ ব'সে থাকে। আশে-পাশের অন্ধকার ঘন থেকে ঘনতর হয়ে ওঠে। হাজার রকম পোকা-মাকড়ের বিচিত্র ধ্বনি ওঠে চারিদিকে। তারপর একসময়ে তারাও চুপ ক'রে যায়। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে রাত্রির বাতাসও যেন ভারী হয়ে ওঠে। নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে চায় চাঁপার। অপলকে মহাশূন্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা তারা। দু'টো তারা। আকাশ ভরা কত তারা। অন্ধকারের বুক চিরে তারা-গুলো জ্বলছে। জ্বলছেই। ঐ তারাগুলোর মধ্যে কোথাও কী লুকিয়ে আছে জলধরের মুখখানা! চাঁপার উদাস শূন্য দৃষ্টি তারাগুলোর মধ্যে আতিপাতি ঘুরে বেড়ায়। নেই। কোথাও নেই জলধর। সেই ডাকাবুকো জোয়ানটা কোথায় যে হারিয়ে গেলো!

পুরোনো কথাগুলো একে একে মনে পড়ে চাঁপার। জলধরের কত স্মৃতি ভিড় ক'রে রয়েছে তার চারপাশে। অমন যে হাসি-খুশি ছলবলে মানুষটা, কিন্তু ওর বাবার কথা মনে পড়লেই কী যে হয়ে যেতো! নিমেষেই ওর চোখ দু'টো জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলে উঠত ক্ষ্যাপা বাঘের মতো। খাদের মধ্যে থেকে পুলিন রায়ের গোরুর গাড়ীর চাকা টেনে তুলতে গিয়ে ওর বাবা মারা যায়। বাবার অপমৃত্যুর স্মৃতি জলধরকে সদা-সর্বদা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। মনে পড়ে চাঁপার, একদিন জলধর ওকে বলেছিল, 'দেখিস্ চাঁপা, আমার বাবারে মারার শোধ আমি নেবোই।'—কথা রেখেছে জলধর। রামদায়ের একটি কোপে তার পিতৃ-ঘাতকের মাথাটা নামিয়ে দিয়ে গেছে। বাবার মৃত্যুর শোধ সে নিয়েছে।

কিন্তু চাঁপা? চাঁপার পরে সে কোন্ কর্তব্য পালন ক'রে গেলো? এইভাবেই যদি ফাঁক দিয়ে চলে যাবে, তাহলে এত ভালবাসার স্বপ্ন কেন দেখিয়েছিল জলধর? সব কথাই কানে আসে চাঁপার। খুনের কেসের আসামী জলধর। ফাঁসি হওয়ারই কথা ছিল। বিচারকের দয়ায় পার পেয়েছে। জেল হয়েছে যাবজ্জীবন। রাজসাহী জেলে এখন কয়েদ খাটছে। আর কি কোনোদিন দেখা পাবে জলধরের? কে জানে!

চাঁপার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সময়ের সুতোয় বাঁধা দিন আর রাতগুলোতে চাঁপার সে দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে যায়। চাঁপার বুকভরা শূন্য যৌবন ব্যর্থ প্রতীক্ষার দুয়ারে মাথা কুটে মরে অবিরাম।

সেদিক থেকে সৌরভী আছে ভালো। এক চরম বিস্মৃতির মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তার সব চেতনা। স্মৃতির ভার বয়ে বেড়ানোর গ্লানি তার নেই। বিলভাসানের অগণিত নরনারীর শূন্যতাবোধের যন্ত্রণা তাকে স্পর্শ করে না আর। গগনের মতো নিষ্ফল মুহূর্তগুলোর সঙ্গে তাকে সংগ্রাম করতে হয় না। চাঁপার মতো রিক্ত দীর্ঘশ্বাসে

ক্ষয়ে যেতে হয় না তাকে পলে পলে। সব বোধ-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েই যেন বেঁচে গেছে সে।

বারান্দার এক কোণে চুপচাপ ব'সে থাকে সৌরভী। স্নান আহারের কোনো ঠিক নেই। মাথার চুলে জট বেঁধেছে। রাজ্যের উকুন বাসা নিয়েছে সেখানে। চেতনায় সাড় নেই কোনো। শরীরের কষ্ট দুঃখের উপলব্ধিও যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে সৌরভী এখন এক প্রেত-রাজ্যের অধিবাসী। সুখ দুঃখ চিন্তা-ভাবনার ঊর্ধ্বে এক অজাগতিক জীব।

বনখালি গ্রাম ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে একটা শ্মশান-ভূমি। বিলভাসানের চাষীরা এখানে মাঝে মাঝে শবদাহ করে। পোড়া পাটকাঠি, কাঠের টুকরো, ভাঙা কলসী ইতস্ততঃ ছড়ানো। শ্মশানের এক পাশ ঘেঁষে কয়েকটা দীর্ঘ তালগাছের সারি। তার নিচে ছোটো একখানা ঘর। অনেকদিন আগে এক জটাধারী সন্ন্যাসী এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সন্ন্যাসীর চেহারা দেখে আশেপাশের গাঁয়ের চাষীরা তার ভক্ত হয়ে পড়েছিল। সন্ন্যাসীর বাসের জন্য খড়-বাঁশ দিয়ে সুন্দর ক'রে তৈরী ক'রে দিয়েছিল ঐ ঘরখানা। বাসও করেছিল সে সন্ন্যাসী কিছুদিন এখানে। কিন্তু তার পরেই সেই ঘর-পালানো সন্ন্যাসী ঘরের মায়া ছেড়ে আবার কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ঘরখানা যেমন ছিল, তেমনই রয়ে গেলো। এই ক-বছরে জীর্ণ হয়ে গেছে ঘরখানা। চালে ভালো ক'রে খড় নেই। বাঁশের খুঁটি-গুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে।

এই ঘরেই একদিন হঠাৎ ব'সে থাকতে দেখা গেলো এক পাগলীকে। বাঁশের মতো লম্বা। শীর্ণ কালো কঙ্কালসার চেহারা। কোটর গত চোখ দু'টো শুধু জ্বলছে ধক্ ধক্ ক'রে।

পাগলী কোনো কথা বলে না। শুধু দূরের দিগন্তে নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকে। দিন গড়িয়ে রাত হয়। রাত গড়িয়ে সকাল। মাথার উপর বৈশাখের খর-রোদ তাপ ছড়ায়। শ্মশানের কেঁদো কুকুরগুলো পায়ের কাছ দিয়ে ঘুরে যায়। তালগাছের মাথায় কালো কালো দাঁড়কাক খা-খা ক'রে অলক্ষুণে ডাক ডাকে। রাতের বেলায় নিস্তব্ধ শ্মশানভূমিতে শেয়ালের পাল ঘোরে। আলেয়া আলো ছড়ায়। কিন্তু পাগলীর ভ্রূক্ষেপ নেই কোনো কিছুতেই। আকাশের শেষ সীমায় অপলক দৃষ্টি মেলে কোন্ অধরাকে ধরার জন্য যেন সম্মোহিতের মতো বসে থাকে সে!

হঠাৎ একদিন কাশতে থাকে পাগলী। কাশির দমকে শীর্ণ শরীরটা যেন বেঁকে আসতে চায়। কাশতে কাশতে হঠাৎ মুখ দিয়ে এক দলা রক্ত বেরিয়ে আসে। আবার কাশে। আবার রক্ত বের হয়। দুই কশের রক্ত মুছে পাগলী একবার তাকায় বমি-করা রক্তের দিকে। কিন্তু তার উদাসীন নির্বিকার দৃষ্টি আবার ঘুরে চলে যায় দূরের দিগন্তে।

একদিন সন্ধ্যে নাগাদ হঠাৎ এসে হাজির হলেন নিখিল। পাগলীর পাশে এসে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লেন। এক নজর দেখে নিয়েই বললেন—'এ কি চেহারা হয়েছে তোমার ফুলিদি ? কি হয়েছে তোমার ?'

ফুলি কী বলতে যায়। দমকা কাশি আসে। এক ভলকে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। চমকে ওঠেন নিখিল। ফুলিদির বুকের মধ্যে তাহলে রাজরোগের বীজাণু বাসা বেঁধেছে! কুরে কুরে তাকে খাচ্ছে! সেই সুঠাম স্বাস্থ্য আর বলশালী রমণীটিকে দেখলে এখন আর চেনাই যায় না।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকেন নিখিল। তারপর আস্তে আস্তে বলেন—'তুমি ভয় পেয়ো না ফুলিদি! চিকিৎসা করলে তুমি ভালো হয়ে যাবে।'

ফুলি একটু ক্ষীণ হাসে। বলে—'তোমাদের ফুলিদিরে কবে ভয় পাতি দেখিছো ভাই, যে আজকে ভয় পাবে!'—

ফুলি আবার কাশে। মুখ দিয়ে আবার খানিকটা রক্ত ওঠে তার। নিখিল বলেন—'তুমি চলো ফুলিদি। তোমাকে ইণ্ডিয়ায় নিয়ে যাই। কলকাতায় আমার পরিচিত একজন ভালো ডাক্তার আছেন। তাকে দিয়ে তোমার চিকিৎসা করাব।'

ফুলির কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে। থেমে থেমে বলে—'না নিখিলভাই, আমার কোথাও যাওয়া হবে না। ভাইডি জেলে আটক হ'য়ে রইছে। যাওয়ার সময় ভাইডি ক'য়ে গেছে, সে আবার ফিরে আসবে। আমি চলে গেলি ভাইডির সাথে আর দেখা হবে না। তোমরা সবাই চলে যাচ্ছো। ভাইডি ফিরে আ'সে কারো দেখ্তি না পারলি কী ভাববে আমার ভাইডি!'

ফুলির সারা অন্তর জুড়ে ভাসতে থাকে সত্যপ্রসাদের স্মৃতি। তার শীর্ণ ম্লান মুখে কিসের যেন একটা আলো খেলা করে।

চোখ বুজে ফুলি নিবিষ্ট হয়ে ব'লে চলে—'ঘরে আমার মন দাঁড়াতো না। মনের মধ্যি পাগল-পাগল লাগতো। বিল-বাদাড় চ'ষে ঘুরে বেড়াতাম। লোকে আমারে বল্তো—মদ্দা ফুলি। তারপর একদিন ভাইডি আস্লো। ভাইডির কাছে নতুন নতুন সব কথা শোন্লাম। ভাইডির কাছে নতুন কাজের ভার পা'লাম। সেই কাজে ঝাঁপায়ে প'ড়ে বড়ো শান্তি পাইছিলাম মনে। ভাইডি কইছিলো,—ফুলিদি, নতুন দিন আসবে। মানুষির মধ্যি ছোটো বড়ো থাকবে না। গরীব বড়োলোক থাকবে না। সব মানুষ সমান হবে। ভাইডি কইছিলো, তার জন্যি আমাদের লড়াই করতি হবে। সবাই একজোট হয়ে লড়াই করতি হবে।—তা আমরা তো লড়াই করিছিলাম। কিন্তু কী দিয়ে যে কী হয়ে গেলো!'

নিদারুণ হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় ফুলির কণ্ঠস্বর।

কী বলবেন ভেবে পান না নিখিল। একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেন—'ভুল আমাদেরই হয়েছিল ফুলিদি। চাষীদের কোনো দোষ নেই। আমরাই পারিনি সঠিক নেতৃত্ব দিতে। যখন যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল, তা নেওয়া হয়নি। কোথাও কোথাও আবার ভুল পথ নেওয়া হয়েছে। তার ফলেই এই বিপর্যয় ঘটল। তবে তুমি দুঃখ কোরো না ফুলিদি। তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। সত্যপ্রসাদবাবু আবার ফিরে আসবেন। আবার আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে লড়ব। সে

লড়াইয়ে আমরা জিতবই। তবে তার আগে তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। তুমি আমার সঙ্গে চলো ফুলিদি।'

ফুলি আবার খানিকক্ষণ কাশে। কাশির সঙ্গে যথারীতি রক্ত ওঠে। ক্লান্তিতে হাঁপাতে থাকে। বাঁশের খুঁটির গায়ে শীর্ণ দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলে—'বিলভাসান ছা'ড়ে আমার কোথাও যাওয়া হবে না নিখিল ভাই। মরতি হয় তো এই মাটিতেই মরবো। তুমি ফিরে যাও।'—

অগত্যা একা একাই ফিরে যান নিখিল। ফুলির রক্তাক্ত কণ্ঠস্বর যেন ওঁকে অনুসরণ ক'রে চলে। পা-দু'টো কেমন যেন জড়িয়ে আসে নিখিলের। এত বিষাদ আর অবসাদ যেন জীবনে তিনি কখনো অনুভব করেন নি।

বিলভাসানের কৃষক-আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল। এই শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ কী, ইতিহাসই তার বিচার করবে। তবে নিজেদের রক্তের বিনিময়ে, কঠোর সংগ্রাম আর ত্যাগ-স্বীকারের অঙ্গীকারে, বিলভাসানের চাষীরা তেভাগার লড়াইয়ে যে সাফল্য অর্জন করেছিল, ধীরে ধীরে তা হাতছাড়া হয়ে গেলো। জোতদার জমিদারের রাহুগ্রাস আবার আত্মপ্রকাশ করল পূর্ণমাত্রায়।

॥ উনত্রিশ ॥

বৈশাখের প্রথম। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন বেশ খানিকটা ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভিজে মাটিতে সোঁদা সোঁদা ভাব। গাছপালার মধ্যে একটা সতেজ প্রসন্নতা। রোদের প্রখরতা থাকলেও ঘন বর্ষণের দরুণ বাতাসে একটা স্নিগ্ধতার আভাস। খানা ডোবা নিচু জায়গায় বেশ জল জমেছে। কৈলাসের বাড়ীর পাশের বিশাল মজা পুকুরটাতেও জল জমেছে বেশ খানিকটা। সমস্ত পুকুরটা কচুরিপানায় ভর্তি। কচুরির লম্বা ডাঁটাগুলো মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। রোদের তাপে ঝলসে পাতাগুলো শুকনো, বিবর্ণ। তলার দিকে ভূমি-সংলগ্ন শিকড়গুলো কালো চুলের মতো ছড়িয়ে আছে। থকথকে কাদার উপর এতোদিন ছিল একটুখানি থিরথিরে জল। বৃষ্টির জল জ'মে এখন কিছুটা ভাসমান ভাব। বিশেষ ক'রে পুকুরের মাঝামাঝি দিকটায়।

পুকুরের এক পাশ ঘেঁষে কচুরিপানার আড়ালে কাদা-জলের মধ্যে কৈলাসের সেই দীর্ঘ বাইচের নৌকাখানা ডোবানো রয়েছে। জল না থাকলে এসব নৌকার বড়োই দুর্গতি। রোদের তাপে কাঠে ফাট ধরে। গায়ের আলকাতরা গ'লে জোড়ের পাতামগুলো বেরিয়ে পড়তে চায়। নৌকার রক্ষণাবেক্ষণ কঠিন হয়ে পড়ে। খানা-ডোবার নিচু অংশে কোনোমতে কচুরিপানা ঢাকাঢুকি দিয়ে আড়াল ক'রে রাখতে হয়। বৃষ্টি-বাদলা আর বন্যার জল না আসা পর্যন্ত চালাতে হয় এভাবেই।

কৈলাসের বাইচের নৌকাখানাও এভাবেই পড়ে ছিল। দীর্ঘ নৌকাখানার তলার দিকে কিছুটায় জল, কিছুটায় থকথকে কাদা, আবার খানিক জায়গায় ফুটিফাটা শুকনো মাটি। পুকুরের মাঝখানটায় বেশ জল জমেছে। নৌকাখানাকে ওখানে ঠেলে নামিয়ে নিতে পারলে বেশ হ'ত।

পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিল কৈলাস। তারপর একসময় কচুরিপানা ডিঙিয়ে এগিয়ে এলো নৌকাখানার কাছে। নৌকার পিছনের দীর্ঘ গলুইখানা এপাশে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কৈলাস এগিয়ে গিয়ে হাত রাখল গলুইয়ের উপর। গলুই ধ'রে একটুখানি ঠেলবার চেষ্টা করল। কিন্তু নৌকার নড়বার কোনো নাম নেই। অসম্ভব জেনেও কৈলাস ঠেলতে থাকে। ক্রমেই কৈলাসের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা জিদ চেপে যায়। নৌকাটাকে ঠেলে নামাতেই হবে। ঠেলতে থাকে প্রাণপণে। আস্তে আস্তে রোদ বেশ বেড়ে উঠছে। সারা গায়ে ঘামের ধারা নামে কৈলাসের। পরিশ্রমের ক্লান্তিতে শরীরে অবসাদ আসে।

কৈলাস হঠাৎ যেন অনুভব করে, সে জোয়ান বয়স আর নেই। শরীরের তেজ কমে গেছে। বেমক্কা জিদ আর পরিশ্রমের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। কেমন উদাস হয়ে যায় কৈলাসের মনটা। নিজের শারীরিক অক্ষমতার কথা ভেবেই শুধু নয়। মনে পড়ে বাইচের নৌকা গড়বার সময়ের সেই দিনগুলোর কথা! নৌকা যেদিন প্রথম জলে নামানো হ'লো, সেদিন গ্রামের জোয়ান ছেলেগুলো এসে হাত লাগিয়েছিল। হালকা একখণ্ড শোলার মতো তরতর ক'রে নৌকা নেমে গিয়েছিল জলে। সে কী উল্লাস! সে কী উন্মাদনা! আর আজ? কেউ নেই! আশে পাশে কোথাও কারো সাড়া নেই! হতাশা আর ক্লান্তিতে স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে আসতে চায়। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করতে থাকে। গলুইয়ের উপর ভর রেখে দাঁড়িয়ে থাকে ধন্ধ-লাগা মানুষের মতো।

হঠাৎ পিছনে একটি শিশুর আধো আধো কলকণ্ঠ বেজে ওঠে—'ও ঠাউদ্দা, দাঁড়ায়ে থাকলে ক্যানো? জোরে ঠ্যালো। দাঁড়াও আমিও আস্তিচি।'

কৈলাস পিছন ফিরে দেখে—নবীনের ছেলে। তার নাতিটা। বছর পাঁচেকের আদুড় ছেলেটা কচুরি-পানার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে। কৈলাসের পাশে এসে দাঁড়ায়। কাদা'র মধ্যে ডুবে গেছে হাঁটু পর্যন্ত। ওর পক্ষে উঁচু গলুইয়ের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দু'খানা গলুইয়ের নিচে ঠেকিয়ে বলল—'ঠ্যালো ঠাউদ্দা, জোরে ঠ্যালো।'

অগত্যা কৈলাসও আবার হাত লাগায়। এক অভিনব খেলায় মেতে ওঠে অসম-বয়সী দু'টি মানুষ। খানিকক্ষণ ধ'রে নাতি ঠাকুর্দা মিলে ঠেলাঠেলি করল। কিন্তু ভারী নৌকাখানার নড়াচড়ার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা গেলো না। কৈলাস একটু হেসে বলল—'উঠে চল্ দাদা, ও শালা নড়বে না।'

নাতির হাত ধ'রে উপরে উঠে আসে কৈলাস। দু'জনেরই সারা গায়ে ছোপ ছোপ কাদা লেগেছে। হাত পা কাদায় মাখামাখি। ভিটের নিচে কুলগাছের ছায়ায় এসে বসল দু'জন। দু'জনেরই পরিশ্রম হয়েছে বিস্তর। বিশ্রাম নেয় ব'সে ব'সে।

নাতি হঠাৎ বলে—'ঠাউদ্দা, এবার কিন্তু আমারে বা'চ টানার সময় বা'চির নৌকোয় নিতি হবে।'

কৈলাস নাতির দিকে তাকায়। হাত পায়ের কাদা শুকিয়ে সাদা রং ধরেছে। বেশ দেখতে হয়েছে ছেলেটাকে। বয়স লাগলে গায়ে-গতরে শক্ত জোয়ান হবে। কৈলাস সস্নেহে বলে—'ছোটো মানুষেরা কি বা'চের নৌকোয় চড়ে দাদা? আগে বড়ো হ' তারপরে যাবি।'

কথাটা মনঃপুত হ'লো না নাতির। উঠে দাঁড়িয়ে হাত দু'খানা উপরের দিকে উঁচু ক'রে বলল– 'এই দ্যাখো ঠাউদ্দা, আমি কত্-তো বড়ো হয়ে গিচি!'

কৈলাস হেসে আদর ক'রে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। গলায় কৃত্রিম সমীহ এনে বলে—'ঠিকই তো ভাই, এবার তুমি খুবই বড়ো হ'য়ে গেছো। তোমারে এবার বা'চির নৌকোয় হাল ধরতি দিতি হবে দেখ্‌তিচি।'

ছেলেটা চুপ ক'রে কৈলাসের কোলের উপর ব'সে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলে—'ঠাউদ্দা, বাবা কবে বাড়ী আসবে?'

কৈলাসের বুকের মধ্যে তীব্র একটা ব্যথা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। অবুঝ ছেলেটাকে কী দিয়ে যে বোঝাবে! নবীন আজ তিনমাসের উপর বাড়ী নেই। নবীন এবং বিলভাসানের আরো কয়েকজন চাষী বিচারাধীন বন্দী হিসেবে যশোহর জেলে আটক রয়েছে। কবে যে ওরা ছাড়া পাবে কে জানে। তবে শোনা যাচ্ছে, ওদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো মারাত্মক অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। হয়ত ছাড়া পেয়ে যেতে পারে।

নাতির মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে কৈলাস বলে—'আসবে দাদা, শীঘ্‌গীরই তোমার বাবা বাড়ী ফিরে আসবে।'

ছেলেটা আর কিছু বলে না। ঠাকুর্দার হাঁটুর উপর মাথা রেখে স্থির হয়ে ব'সে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদে আবার মাথা তোলে। বলে—'ঠাউদ্দা, বাবা বাড়ী আসে না ক্যানো?'

কৈলাস একটু থমকে যায়। তারপর তাড়াতাড়ি ক'রে বলে—'তোমার বাবারে যে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেছে,—জানোনা?'

—'ক্যানো ঠাউদ্দা, বাবারে পুলিশে ধরলো ক্যানো?'

কৈলাস আবার একটু থম্ খায়। আস্তে আস্তে বলে—'তোমার বাবা দুষ্টু লোকদের সাথে লড়াই করতি গিছিলো– তাই।'

ছেলেটি তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে উঠে বলে—'আমিও বাবার মতো লড়াই করতি যাবো ঠাউদ্দা!'

কৈলাস হেসে বলে—'যাবি বইকী ভাই! তুইও লড়াই করতি যাবি। তবে আগে বড়ো হ'।'

—'আমি তো বড়ো হয়ে গিচি ঠাউদ্দা। আর কতো—বড়ো হতি হবে?'

কৈলাস বলে—'হ্যা ভাই, আরো বড়ো হতি হবে। লড়াই করা কি সোজা কথা?'

কৈলাস নাতিকে বুকের কাছে টেনে নেয়। তারপর যেন আপন মনে বিড়-বিড় ক'রে বলতে থাকে—'তোমাদের সবাইরেই লড়তি হবে রে ভাই! এ লড়াইয়ের কি শেষ আছে? বাঁচতি গেলি লড়তি হবেই। আমরা লড়িছিলাম। ল'ড়ে কিছু করতি পারলাম না। আবার তোরা লড়বি। একদিন না একদিন লড়াইতে জিত হবেই।'

কৈলাসের বুক ঘেঁষে ছেলেটি চুপ ক'রে ব'সে থাকে। মন দিয়ে ঠাকুর্দার কথা শোনে।

সূর্য এখন প্রায় মাঝ-আকাশে উঠে এসেছে। আর্দ্র ভাবটা কেটে গিয়ে বাতাস গরম হয়ে উঠেছে। তীব্র রোদের ঝাঁজে চোখে ঝিনিমিনি লাগে। দক্ষিণ দিকের বিলেন ক্ষেতগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল কৈলাস। শস্যহীন উদোম ক্ষেত-প্রান্তর। বোশেখের ঠা ঠা রোদ্দুরে যেন জ্বলছে। সেই শূন্য ক্ষেত-প্রান্তরের উপর দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় বহুদূর। অবাধ উন্মুক্ত ক্ষেত বিলের মধ্য দিয়ে কৈলাসের দৃষ্টি বিচরণ ক'রে বেড়ায়।

কৈলাসের চোখে পড়ে, বাঁকপুর গ্রামের পাশ থেকে একটা পথ বেরিয়েছে। পথটা এঁকেবেঁকে চ'লে গেছে দূরের বিলতিতে গ্রামের দিকে। দু'পাশের রুক্ষ ক্ষেতগুলোর মধ্যে পথটাকে একটা দীর্ঘ সরীসৃপের মতো মনে হচ্ছে। পায়ে চলার পথ। মানুষের পায়ের ঘষায় ঘষায় মাটি মসৃণ হয়ে দীর্ঘ সরু পথটা তৈরী হয়েছে। এটা কোনো বাঁধা পথ নয়। এ পথ তৈরী করার কথা কেউ কাউকে ব'লে দেয় না। পথিকের চলার খেয়ালে এটা আপনা-আপনি গ'ড়ে ওঠে। এই নির্দিষ্ট পথে চলার বাধ্য-বাধকতা কোনো পথচারীর থাকে না। তবু একজন যায়। দু'জন যায়। এমনি ক'রেই পায়ে পায়ে গ'ড়ে ওঠে পায়ে চলার পথ। বিলভাসানের গ্রামগুলোর আশে-পাশের বিল-ক্ষেত দিয়ে এমনই সব পায়ে-চলার পথ তৈরী হয়। আবার একদিন সে পথ বর্ষা বন্যায় মুছেও যায়। পরের বছর খরা-শুকনোর দিনে নতুন পথ গ'ড়ে ওঠে।

ঐ পথটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'লো কৈলাসের, এটাই বোধহয় চিরকালের নিয়ম। এমনি ক'রেই নতুন নতুন পথ গ'ড়ে ওঠে। কখন তা হারিয়ে যায়। আবার নতুন ক'রে গ'ড়ে ওঠে। বিলভাসানের চাষীরা বুকের রক্ত দিয়ে তেভাগা সংগ্রামের যে পথ গ'ড়ে তুলেছিল, তা হারিয়ে গেছে। কিন্তু একেবারেই কি তা হারিয়ে গেছে? না, তা যায়নি। আবার সময় আসবে। সুদিন হবে। বিলভাসানে চাষীদের সংগ্রাম হয়ত আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এই ধ্বংস-স্তূপের মধ্য দিয়েই একদিন আবার নতুন ক'রে জন্ম নেবে নতুন আন্দোলন। বিলভাসানে না হোক, বিলভাসানের বাইরে, দেশে-বিদেশে যেথা নেই কৃষকেরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করবে, সেখানেই বেঁচে থাকবে বিলভাসানের কৃষকদের মরণ-পণ আন্দোলনের স্মৃতি। ভবিষ্যতে কতো নতুন

পথ তৈরী হবে। কতো নতুন নতুন আন্দোলন দানা বেঁধে উঠবে। তাদের সকলের মধ্যেই বেঁচে থাকবে বিলভাসানের চাষীদের এই রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস।

নাতির হাত ধ'রে কৈলাস আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়।